চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লৌকিক দেবদেবী, হিন্দুমুসলিম সমন্বিত দেবদেবী, দেবদেউল, থান, পাট, পূজা-পার্বণ নানা অনুষ্ঠান, ব্রত ও ব্রতভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লোকনৃত্য

লৌকিক দেবদেবী ঃ

কোচবিহারের মাটি ও প্রকৃতি যেমন প্রাকৃতিক কারণেই উর্বর ও সমৃদ্ধ তেমনি তার লৌকিক দেবদেবীগণও লোকজীবনের গভীরে অধিষ্ঠিত। শাস্ত্রীয় ও পৌরাণিক খোলস ছেড়ে ঘরের মানুষের মতই এখানে আপন হয়ে উঠেছেন এই দেবদেবীগণ । কোচবিহারের লোকায়ত মনও লৌকিক দেবদেবীদের দেখেছে দৈনন্দিন জীবনের চলার পথে, সংসারের সহজ সরলক্ষেত্রে, উৎসবে, আনন্দে, সুখে - দুঃখে, রোগে - ভোগে। আদিম যুগের শিকারজীবী মানুষের মত তন্ত্র মন্ত্রের ফাঁদ যেমন তারা পাতেননি তেমনি আধুনিক শহুরে মানুষের মত শাস্ত্রের ঘেরাটোপে আবদ্ধ করেননি তাদের লোকদেবতাকে। দেবতাকে তারা দেখেছেন গৃহের অভ্যন্তরে, নদীর প্রশস্ত প্রান্তরে, সবুজ ধানের ক্ষেতে, গরুর গোয়াল ঘরে, নিভৃত কোন জনপদে, তেমাথার মুক্তাঙ্গনে খেলে বেড়ানো শিশুটির মাঝে। এতদঞ্চলে অনেক লোকদেবতার উদ্ভবের মূলে আছে আদিম টোটেম, ট্যাবু ও যাদু বিদ্যার প্রভাব। সাধারণ ভাবে বিচার করলে দেখা যায় এরূপ দেবতা অশাস্ত্রীয়, অপৌরাণিক, সম্পূর্ণ রূপে লোকজীবনেরই অঙ্গ। আবার ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে একাধিক দেবতার মৌলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রাচীন নামেরও পরিবর্তন ঘটেছে। কোচবিহাররের লোকদেবতাগণ একাধারে আঞ্চলিক দেবতা, গ্রাম দেবতা, ব্রত দেবতা।

উত্তরবঙ্গে সংস্কৃতি সমন্বয়ের আদি পর্বেই দেখা যায় অকুলীন ব্রাত্য দেবতাগণ মাথা উঁচু করে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার স্রোতরেখা ধরেই অনার্য সংস্কৃতির আবির্ভাব। জেলার সর্বত্রই এই গ্রাম দেবতাদের স্বরূপ লক্ষণীয়। জেলার পাঁচটি মহকুমার (তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও জেলাসদর) গ্রামীণ আদিবাসী সমাজই এর প্রধান পূজক। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এখানে লোকদেবতাগণ পুরুষ এবং এদের প্রকৃতি বিভিন্ন রূপে সমন্বিত। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও এরূপ অনেক লৌকিক দেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় পাঁচালীর গানের আসরে মূল গায়েন লোক দেবতার বন্দনা করেই পালা শুরু করতেন। বাংলার মঙ্গল কাব্যধারার অনেক পাঁচালীতেও এই প্রথার একাধিক নিদর্শন পাওয়া যায় । ডঃ মিহির চৌধুরী কামিল্লা তাঁর 'আঞ্চলিক দেবতা ও লোকসংস্কৃতি' গ্রন্থে (৬) বলেছেন " আঞ্চলিক দেবতাদের জন্মের মূলে আছে এক বিশেষ শ্রেণীর সংস্কার ও বিশ্বাস, কিন্তু সেই গূঢ় রহস্য ছাড়াও প্রতি দেবতাকে ঘিরেই পুরুষানুক্রমে গড়ে উঠেছে আজও নানারকম লোকসংস্কার ও লোক বিশ্বাস।" যদিও এসকল সংস্কার ও বিশ্বাস সকল স্থানেই একরকম নয়।

জেলায় এমন অনেক গ্রাম আছে, যে গ্রাম বিশেষ কোন লোকদেবতার দ্বারা চালিত। যেমন দিনহাটার গোঁসানীমারী অঞ্চলের আলোকঝারি গ্রাম ও সিতাই থানার গাবুয়া গ্রামের গড়কাটা মাসান; এই গ্রাম দুটিতে গ্রামবাসীদের সুখ - দুঃখ, রোগ - ভোগ, বিপদ - আপদ ও কৃষিকর্মের নিয়ন্ত্রক হল মাসান নামক লোকদেবতার অদৃশ্য শক্তি। শাস্ত্রীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে গ্রামীণ এই লৌকিক দেবদেবীগণ ব্রাত্য ও পতিত দেবতা। লোকদেবতার পূজার প্রচলন অন্ত্যজ ও উপজাতিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, বিশেষ করে কৃষিনির্ভর লোকায়ত সমাজে। কালের বিবর্তনে অনেক লৌকিক দেবদেবী শাস্ত্রীয় সম্মানে উন্নীত হচ্ছেন। অনেক গ্রামে কালী ও অন্নপূর্ণার পাশাপাশি মাসান যখা যখিও পূজিত হন। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বাইরে লোকায়ত বিশ্বাস ও আন্তরিকতার গভীরেই সৃষ্টি হয়েছে এ সকল লৌকিক দেবদেবী।

কোচবিহারের মাসান, যখা যখি, বুড়াঠাকুর, কুমিরদেব, ডাংধরা, চড়কা টাকুয়া, মদনকাম, হুদুম দেও, ভান্ডানী, থানসিড়ি, গাবুর দেব, বুড়াঢ্যাল্লা গেরাম ঠাকুর প্রভৃতির উল্লেখ কোন পুরাণ বা শাস্ত্রগ্রন্থে নেই। লোকদেবতার মূর্তির গড়ন বা আদল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় জেলার সর্বত্র সর্বাধিক পূজিত ও সর্বজনবন্দিত জাগ্রত মাসান দেবতার গড়নে হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, নিশিগঞ্জ, দিনহাটা, গোঁসানীমারী প্রভৃতি অঞ্চলে বিভিন্নতা দেখা যায়। শুধু মুর্তির গড়ন বা রঙেই পার্থক্য নয়, বাহনের ক্ষেত্রেও এই পার্থক্য স্পষ্ট। মাঘপালা গ্রামের আক্রার হাট নামক স্থানে মাসানের বাহন কোথাও শূকর, কোথাও বা হাতি, আবার দিনহাটা মহকুমার আলোকঝারি গ্রামের এই দেবতার বাহন শোল মাছ হলেও নগরভাঙনি গ্রামের বিলের ধারে

চৈত্র সংক্রান্তির দিন সখির মেলা উপলক্ষ্যে অন্নপূর্ণা ও শীতলার পাশাপাশি যে মুন্ডহীন মাসান পূজিত হন তার বাহন কিন্তু কচ্ছপ। অনেকক্ষেত্রেই এই মাসান দেবতার হাতে থাকে পেন্টি, লাঠি ও গদা। উপবিষ্ট বা দন্ডায়মান দুই রূপেই মাসানকে দেখা যায়। উপবিষ্ট যে সকল মাসানকে দেখা যায় তাদের গড়ন, আঙ্গিক এবং আদল বিচারে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাসান কোচবিহার জেলায় পৌরাণিক শিবের লৌকিক রূপ। শিব বা মহাদেব এখানে মাসানের নামান্তরে পূজিত হন। তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা গ্রামে গো - সম্পদ রক্ষক হিসেবে ডাংধরা দেবতা পূজিত হন। স্থানীয় ভোংরিয়া নরেন বর্মনের মতে গ্রামবাসীগণ এই ডাংধরা দেবতাকে শিবজ্ঞানে পূজা করেন। মাসানের একাধিক বাহনের বৈচিত্র্য বিচার করলে আমরা একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি এতদঞ্চলে আদিম পশু পূজাই বিবর্তনের মাধ্যমে লোকদেবতার সঙ্গী হয়ে পূজা পায়। "অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বর্তমান কোচবিহার রাজ্যের উত্তর এবং পূর্বাঞ্চলে দলে দলে বন্যহস্তী বিচরণ করিত। উনবিংশ শতব্দীর প্রারম্ভেও গোঁসানিমারির অদূর উত্তরে পাহাড়গঞ্জ প্রভৃতি স্থানে বন্যহস্তী আগমন করিত।" [১] এতদঞ্চলে বাঘ বা হাতির উপরোক্ত উপদ্রবের কথা থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গ্রামবাসীগণ জীবন হানি, কৃষির ফলন নষ্ট ও গবাদি পশু রক্ষা কল্পে বাঘ ও হাতির বাহনরূপী দেবতার সন্তুষ্টি বিধানে এসকল পূজার প্রচলন করেন। গাভীর বাচ্চা প্রসবের চৌদ্দদিনের মাথায় গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় রাজবংশী সমাজের গোরক্ষনাথের পূজাও লৌকিক শিবেরই পূজা।

মাটির মূর্তিতে মাসানকে দেখা গেলেও জেলার স্থানীয় রাজবংশী ও আদিবাসীদের মধ্যে পূজিত মাসানের এক প্রাচীন রূপ দেখা যায়, তা হল শোলার তৈরী মাসান। মেখলিগঞ্জ ও তুফানগঞ্জ মহকুমায় এরূপ মাসান পূজার প্রচলন বেশী। এক্ষেত্রে বাহন অবশ্যই অশ্ব। গ্রামীণ লোকশিল্পীগণ অপূর্ব কৌশলে তৈরী করেন এই শোলার মাসান। পূর্বে মাসানের মত বহু লোকদেবতাই পূজিত হতেন বিমূর্ত ভাবে যার নিদর্শন এখনও দেখা যায় প্রস্তরখন্ড, লালনিশান বা ধ্বজা পূজায়।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ও অন্যান্য আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত কোচবিহার জেলার সকল গ্রামবাসীর উপাস্য দেবতা হল শিব। কোচবিহারের এই লৌকিক শিব বিভিন্ন নামে পূজা পেয়ে আসছেন। যেমন — বুড়া ঠাকুর, মহাকাল, ডাংধরা, গাবুরদেব, মদনকাম ইত্যাদি।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী ও অন্যান্য বিশ্বাস মহাকাল, সোনারায়, ডাংধরা, ভান্ডানী, শালেশ্বরী, গোরক্ষনাথ সবাই ব্যাঘ্র দেবতা। এই দেবদেবীগণের পূজার পশ্চাতে ব্যাঘ্রভীতি থাকলেও অন্য অর্থে একে আদিম টোটেম ও সর্বপ্রাণবাদী জনগোষ্ঠীর বিশ্বাসও বলা যায়।

কালী ঠাকুরাণীও এতদঞ্চলে সর্বজন বন্দিতা ও পূজিতা দেবী। তাই কালী এখানে গেরামঠাকুর ও মাসান ঠাকুরের পাশাপাশি কৃষি দেবতার মর্যাদায় ভূষিতা এবং পূজিতা। তিনি গ্রামবাসীর সুখ দুঃখেরও অংশীদার। এতদঞ্চলের স্থানীয় সমাজে বৃক্ষকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করার প্রথাও সুপ্রাচীন। তুলসী, জিগা, শেওড়া, ময়না, বট, পাকুর ও বাঁশপূজা এর নিদর্শন।

মহারাজা নরনারায়ণ প্রবর্তিত বড় দেবী - দুর্গার কাঠাম তৈরীতে ময়না কাঠের ব্যবহারও প্রায় সারে চারশত বছরের প্রাচীন ঐতিহ্য। যথাস্থানে এগুলি বিস্তারিত আলোচিত হবে।

উত্তরবঙ্গের লোকজীবনের শরিক হল কোচ, মেচ, রাভা, রাজবংশী সম্প্রদায়। আষাঢ়, শ্রাবণ মাসেই পূজিত হন এদের বহু লোকদেবতা। এদেরই অন্যতম মনসা বা বিষহরি। মনসা বা সিজ বৃক্ষকে বিষহরি জ্ঞানে পূজা করেন এই সম্প্রদায়। মাটির বেদী তৈরী করে গোবর দিয়ে লেপে চালের গুড়োর সুদৃশ্য আলপনা দেন এই পূজা উপলক্ষ্যে।

জেলার সকল গ্রামেই পূজিত গ্রাম দেবতার পূজারীগণও ব্রাহ্মণ্য পুরোহিততন্ত্রের আওতায় পড়েন না। স্থানীয় জনগোষ্ঠী বা আদিবাসী সমাজের কেউ কেউ বংশানুক্রমিক ভাবে পৌরোহিত্য করেন। কোচবিহারের সর্বত্রই এই লোক দেবতার পূজা ও বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য নিজস্ব সামাজিক পূজক সম্প্রদায় দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত। একটি

শ্রেণীর নাম পাতধারী অর্থাৎ এরা কানে তুলসীপাতা ধারণ করেন। অন্য শ্রেণীর নাম চক্রধারী। এরা তাম্র নির্মিত চক্রধারণ করার জন্যই এই নামে ভূষিত হন। "রাজবংশী সমাজে চক্রধারীদের পূজা করার অধিকার বংশানুক্রমিক তাঁরা শিষ্য গ্রহণে সক্ষম। চক্রধারীদের বংশানুক্রমিক উপাধি অধিকারী কিন্তু পত্রধারীরা সাধারণত রায়, বর্মন ইত্যাদি পরিবারিক পদবী গ্রহণ করে থাকেন। কোচবিহারের লোকায়ত জীবনে এই অধিকারী ছাড়াও যে পূজক সম্প্রদায় আছেন তারা হলেন দেউসী বা দেববংশী, ওঝা বা রোজা, ভোঙরিয়া ও কীর্তনীয়া সম্প্রদায়। শেষোক্ত সম্প্রদায় শুধু মাত্র মৃত্যু কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে অংশ গ্রহণ করেন। মৃতদেহ সৎকারের যাবতীয় দায়িত্ব যেমন — জীবনচালান, গৃহশুদ্ধি ইত্যাদি কাজ কীর্তনীয়াগণ সম্পন্ন করেন। উপরোক্ত অধিকারী সম্প্রদায় অনেক সময় নিজেই ভর গ্রহণ করেন। একে এতদঞ্চলে ভরওঠা বলে। বর্তমানে অধিকারী সম্প্রদায়ের পাশাপাশি শর্মা উপাধিধারী অসমিয়া ব্রাহ্মণগণের প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সমাজের গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র এই ব্রাহ্মণ সমাজ।

কোচবিহার জেলায় অঞ্চল, গ্রাম বা স্থান ভেদে প্রায় সকল স্থানেই লৌকিক দেবদেবীগণের কয়েকটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। ভৌগোলিক বা অঞ্চলভেদে এঁদের কিছু রূপ বা আঙ্গিক পরিবর্তিত হলেও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যে এরা প্রায় সব ক্ষেত্রেই এক। অর্থাৎ এই সকল দেবদেবীর আদিম পরিচয় যে এখনও লুপ্ত হয়নি তা এদের লক্ষণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে সহজেই অনুমিত হয়। যেমন জেলার সকল লৌকিক দেবদেবীর উল্লেখ কোন প্রাচীন বা শাস্ত্রীয় ধর্মগ্রন্থে নেই। এতদঞ্চলে আঞ্চলিক দেবদেবীগণ আঞ্চলিক ভাবেই পূজিত হন। মূর্তির গড়ন, আঙ্গিক, রঙ, পূজার লোকাচারের বিভিন্নতা, নামে ও মন্ত্রে মিশ্রিত ভাষা এবং প্রায় অর্থহীন লৌকিক শব্দের ব্যবহার এসকল বৈশিষ্ট্য লৌকিক দেবদেবীর পূজার মন্ত্রে প্রায়ই দেখা যায়।

অনেকক্ষেত্রেই এই সকল লৌকিক দেবদেবীর নামের অর্থও দুর্বোধ্য। অনেকক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার প্রভাব ও প্রাধান্য থাকলেও মন্ত্রের ভাষা স্থানীয় উপভাষা। গ্রামের উন্মুক্ত স্থানে সমষ্টিগত ভাবে বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামবাসীগণ লোকদেবতার পূজা করেন।

শিব ঃ

সমগ্র কোচবিহারে শিব বা মহাদেবের পীঠস্থান সর্বাধিক। সেই অর্থে কোচবিহারকে শৈবতীর্থও বলা হয়। কোচরাজবংশের উপাস্যদেবতাও শিব। ভারতবর্ষের সর্বজনমান্য দেবতা এই শিব কোচবিহারে কৃষি দেবতা হিসেবেও সম্মানিত। মঙ্গলকাব্যগুলিতেও পৌরাণিক শিবকে কৃষক চরিত্রে রূপায়িত করা হয়েছে। শিবের প্রতীকগুলি বিশ্লেষণ করলে এই দেবতাকে কৃষি দেবতা হিসেবে মান্য করতে হয়। শিবের বাহন বৃষভ। যার শব্দ ও ধাতুগত অর্থ হল বর্ষণ। বর্ষণ ও বৃষের সঙ্গে কৃষি কর্মের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। বৃষ আবার প্রজননেরও প্রতীক। এই প্রজনন সন্তান উৎপাদন ও শস্য উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শিবের অন্যতম ভূষণ সর্প। এই সর্পও প্রজননের কাজেই কৃষির প্রতীক। শিবের প্রধানতম প্রতীক লিঙ্গ। শিবের যে মূর্তি পূজার প্রচলন আমরা দেখি এটি অনেক পরের ঘটনা। পূর্বে লিঙ্গ পূজাই ধর্মীয় কৃত্য হিসেবে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই লিঙ্গ থেকেই লাঙ্গল শব্দ এসেছে। এই অষ্ট্রিক শব্দ দুটি মূলত লাঙ্গলকেই বোঝায়। তাই একথা সহজেই অনুমিত হয় শিবের পৌরাণিক ভাবমূর্তির চেয়ে কৃষিদেবতা রূপেই সহজভাবে গ্রহণ যোগ্য। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য শিবকে কোচদেরই দেবতা বলে উল্লেখ করেছেন।

হিন্দুবাঙালীর সমাজ, সংস্কৃতি ও লোকাচারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতা হলেন শিব। ব্রাহ্মণ্য সংস্কার নির্ভর পুরাণ বর্ণিত শিব বাঙালীর শিব থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। "হিন্দুধর্মের উদ্ভবের পূর্ববর্তী এই দেবতা প্রাগার্য আদি ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ঋগ্বৈদিক আর্য সংস্কৃতির বিমিশ্রণ ঘটে হিন্দুধর্মের পত্তন হয় যখন, তখন শিবই হলেন তার প্রধান তিন পুরুষ দেবতার অন্যতম এবং প্রধানতম। আর প্রাগার্য মাতৃকা দেবী পরিণতি পেলেন মহাদেবী শক্তিতে।" [২]

জলপাইগুড়ি জেলার জলপেশ্বর, জটেশ্বর এবং কোচবিহার জেলার বানেশ্বর, সিদ্ধনাথ শিব, দামেশ্বর, ষন্ডেশ্বর শিব - শিবকাল্টের প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আজও।

উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী ডঃ চারু চন্দ্র সান্যালের মতে জলপাইগুড়ি জেলার জল্পেশ্বর ও কোচবিহারের বানেশ্বর শিব আসলে 'মহাকাল'। ভারতীয় যাদুঘরে উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত এরূপ একটি মহাকাল মূর্তি আছে। জলপাইগুড়ি জেলার আলিপুরদুয়ার থানার অন্তর্গত চেপানী গ্রামের 'মহাকাল' উল্লেখযোগ্য।

এই মহাকাল শিব কোচবিহারের মানুষের সর্বাধিক মান্য প্রধান উপাস্য দেবতা। প্রসঙ্গত বলা যায় কোচবিহারের রাজ পরিবারও শৈবধর্মে দীক্ষিত। তাই স্বাভাবিক ভাবেই প্রজাগণের উপর রাজধর্মের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। কোচবিহারে প্রচলিত প্রাচীন কিংবদন্তী 'যোগী বেশধারী মহাদেবের ঔরসে বিশ্বসিংহ ও শিষ্যসিংহ নামে হীরার গর্ভে দুই পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন।' কোচবিহারে হিন্দুধর্মের প্রসার ও বিস্তার শুরু হয় বিশ্ব সিংহ শৈবধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর থেকেই। স্থানীয় মানুষ তাদের সকল শুভ কাজের সূচনা করেন শিবপূজার মাধ্যমে। শিব সম্পর্কিত সর্বাধিক জনপ্রিয় লোকশ্রুতি হল, শিবকর্তৃক মদন ভস্ম ও মদনের পুনর্জন্মের কাহিনী। ধর্মপ্রাণ মহারাজা প্রাণনারায়ণের আমলে প্রতিষ্ঠিত পুনর্নির্মিত ও সংস্কার করা হয় জেলার বিভিন্ন প্রান্তরে একাধিক শিবমন্দির।

জেলার প্রাচীন লোকায়ত সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন হল মদনকাম পূজা। "এই পূজার সঙ্গে শিব ভোলানাথের সম্পর্ক হেতু ভক্তরা নিজেদেরকে শিবের ভক্ত ভুত - প্রেত ইত্যাদির সমতুল্য করে ধূলা বালি - কালি মেখে জরাজীর্ণ বস্ত্রাদি, ছেঁড়া বস্তা, ছেঁড়া মাছধরার জাল ইত্যাদি পরে কামদেবের মাগন সংগ্রহ করেন।"[৩]

কোচবিহারের সীমান্তবর্তী রাজ্য আসামের গোয়ালপাড়া জেলা ও কোচবিহারের কিংবদন্তী অনুযায়ী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় বিশ্বাসে শিব পূজা হল প্রকৃতি পূজা। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে পূজিত শিবের উল্লেখযোগ্য রূপ হল 'শিবজখা' ও 'বুড়া চৌপারী'। শিবের অপর নাম 'বুড়া চৌপারী' ও 'মহাদেব'। এই পূজা সাধারণত দেউসী অধিকারী ও গাওবুড়া কর্তৃক সম্পন্ন হয়। শিবের "লোকায়ত এই পূজায় শিবকে সাক্ষী রেখে এতদঞ্চলে খাসির মাংস খাওয়ানোর প্রচলন আছে, একটি পাঁঠার অন্ডকোষ কেটে জ্ঞাতি ও মহাদেবের নামে উৎসর্গ করে বলি দিয়ে খাসির মাংস ঠাকুরকে উৎসর্গ করেন এবং গ্রামবাসীগণ সবাই খান। একে রাজবংশী সমাজে 'বুড়ার চৌপারী' বলা হয়।" [৪]

"কোচবিহারের স্থানীয় জনগোষ্ঠী মনে করেন জমির উর্বরা শক্তি প্রদাতা স্বয়ং মহাদেব। কোচ রাজবংশ শিব রাজবংশ নামে পরিচিত ছিল। কোচমুদ্রায় নৃপতিগণ 'শিবচরণ কমল মধুকর' বলে পরিচয় দিতেন। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যেই উর্বরা দ্যোতক লিঙ্গ পূজা বা শৈব Cult - জন জীবনে প্রতিষ্ঠা পায়।"[৫]

ক্ষেত্রানুসন্ধান ও সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জেলায় পূজিত আরও একাধিক শিবের পরিচয় আমরা পাই। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল জেলাসদরের বানেশ্বর গ্রামের বানেশ্বর শিব, সাগর দীঘির পশ্চিমপারে অবস্থিত হিরণ্যগর্ভশিব, সিদ্ধনাথ শিব, তুফানগঞ্জ মহকুমার দামেশ্বর শিব, ষন্ডেশ্বর শিব, হরিহর মহাদেব প্রভৃতি।

বলরাম ঃ

কোচবিহারের জন জীবনে কৃষিদেবতা লৌকিক শিবের মতই অপর একজন দেবতা পূজিত হন, তিনি বলরাম। স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায় শিবের পরেই এই কৃষি দেবতাকে মান্য করেন।

দিনহাটা মহকুমা শহরের মধ্যস্থলে এরূপ এক মদনমোহন বলরাম ঠাকুরের মন্দির অবস্থিত। মন্দিরের গর্ভগৃহে অবস্থিত ৮ ইঞ্চি উঁচু কৃষ্ণ ও বলরাম মূর্তি। নিত্যপূজা ব্যতীত রথযাত্রা, জন্মাষ্টমী, রাসযাত্রা, দোলযাত্রায় বিশেষ পূজা হয়। তুফানগঞ্জ নাটাবাড়ী ১ নং অঞ্চলের ভুচুংমারী গ্রামে পূজিত বলরাম এবং ঘোগারকুঠি গ্রামে পূজিত দরিয়া বলরাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, এই দেবতাগুলি সম্পর্কে চার নং পরিচ্ছেদের দেব দেউল অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

সোনারায় ঃ

মুসলমান শাসনের প্রারম্ভে অথবা ভূতপূর্ব কামরূপ অঞ্চলে সোনারায় এবং রূপা রায় নামক দুই জন ধর্ম সংস্কারক

আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের প্রকৃতি বিরল নানারকম অলৌকিক ঘটনার অন্তরালে লুকিয়ে আছে এতদঞ্চলের মানুষের গভীর শ্রদ্ধা ভক্তি । "সোনারায়, রূপারায় এবং গোরক্ষনাথের দেশপ্রচলিত গানগুলিতে মুসলিম প্রসঙ্গ থাকায় ঐ গানগুলি এদেশে মুসলিম আগমনের পরবর্তীতে রচিত হয়েছিল বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়, সোনারায়ের সঙ্গে মুসলিম সৈন্যের যুদ্ধ হওয়ার বৃত্তান্ত আমরা সোনারায়ের গানে শুনতে পাই।" [৬]

গৌড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে ব্যাঘ্রদেবতা সোনা রায়ের গড় বা পাট এখনও দেখা যায়। সোনারায় ধর্মরূপী বুদ্ধের উপাসক ছিলেন এবং রূপারায়ের গান এখনও আসামের গোয়ালপাড়া অঞ্চলে শোনা যায়। "সমগ্র উত্তরবঙ্গ, আসামের গোয়ালপাড়া, পূর্ববঙ্গের রঙপুর, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, পাবনা, বিহারের পূর্ণিয়া জেলায় সোনারায়ের পূজার প্রচলন আছে।"[৭]

রাখাল বালক বা গোপালক বালকগণই এই পূজায় বেশী আকৃষ্ট হয়। জেলার রাজবংশী যুবকগণ প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির দিন সোনারায়ের পূজা করেন। পূজারী বা ভক্তগণ নিষ্ঠার সঙ্গে এই দেবতার পূজা করলেও এই ভক্তগণের বড় আনুষ্ঠানিক পর্ব হল পৌষ মাসের ১লা তারিখ থেকে সংক্রান্তির আগের দিন পর্যন্ত সোনারায়ের দক্ষিণা ও মাগন তোলার পালা। গ্রামের ছেলেরা খোল করতাল সহযোগে ছড়া ও গানের মাধ্যমে মাগন তোলে। তাদের হাতে থাকে মাগন সংগ্রহের ঝোলা এবং পাটকাঠি বা খাগের মাথায় তুলির মত লাল, নীল, সবুজ তিন রঙের পাটের গুছি; যে গুলি হল তিন দেবতা — সোনা রায়, রূপা রায় ও কালা রায়ের প্রতীক। কাঠির গলায় গাদা ফুলের মালা ঝুলিয়ে যুবকগণ সোনারায়ের ছড়া বা গান বিশেষ ধরনের সুরে গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ান। এ সময় তদের সঙ্গে থাকা দুধ মিশ্রিত জল ও ফুলের বিনিময়ে ভক্তরা দক্ষিণা হিসেবে সংগ্রহ করেন ধান, চাল, পয়সা। সারা পৌষমাসের সংগৃহীত দক্ষিণা দিয়ে পৌষ সক্রান্তির দিন নদীর ধারে বা ফাঁকা মাঠে সোনারায়, রূপারায় ও কালারায়ের উক্ত প্রতীক মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়। এঁরাই সোনারায়ের প্রতীক হিসেবে পূজা নেন। এটাই জেলার ভ্রাম্যমান সোনারায়ের মূর্তি। উক্তদিনে গ্রামের বালক কিশোরগণ সংগৃহীত অর্থ, চাল ও সবজী দিয়ে 'রাখালভোজ' জোলামুনি' নামে বন ভোজনের ব্যবস্থা করেন। হালের গরু, মোষ, ছাগল, পাঁঠা, হাঁস, মুরগীকে বাঘের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বাঘের দেবতাকেই সন্তুষ্ট করা শ্রেয় মনে করেন জেলার গ্রাম্য বালকগণ। এই পূজার মাগন তোলার সময় ভক্ত বালকগণ গৃহস্থ বাড়ীতে যে ছড়াগুলি নির্দিষ্ট সুরে গেয়ে শোনায় তা হল —

"দাদা বলরামরে হাসিয়া কতা কয়,
দুঃশাসনী বাঘ নিয়া নামিল সোনা রায়।" [৮]

শিকারপুর গ্রামের শশীমোহন বর্মন এমন একটি ছড়া গেয়ে শোনান এক সাক্ষাৎকারে —

"সোনা রায়ের দক্ষিণা লাগে পূর্ণ কুলা ধান
তাহার উপুরা নাগে জোড় গুয়া পান।"

প্রসঙ্গত উল্লেখকরা যায় এই মাগন চাওয়াকে কেউ যাতে ভিক্ষার সঙ্গে তুলনা না করেন সেজন্যও ছড়া বানিয়ে নেন ভক্তরা —

"ধানের কাঙালী না হই, গুয়া তো না চাই
দেশের ব্যবহার কতা কয়্যা দিয়া যাই।"

দক্ষিণা প্রদানের পর সোনা রায়ের মাগন প্রার্থীরা গৃহস্থদের জন্য দুগ্ধ মিশ্রিত জল ও আশীর্বাদ দান করেন। এ সময়ের গানটি হল নিম্নরূপ —

"সত্য ঠাকুর সোনা রায় গারস্তক দে তুই বর
ধনে বংশে বাড়ুক গিরি চন্দ্র দিবাংকর

গহলে বাড়ুক গাইগরু জাঙ্গালে বাড়ুক নাউ
গিরির গিরি ঘরের শত্রু দুসমন বনের বাঘে খাউক।"[৯]

এর মাধ্যমেই সোনা রায়ের পূজার মূল তাৎপর্য বিশ্লেষণ করা যায়। আবার সোনা রায়ের মাগন প্রদানে কেউ অনীহা প্রকাশ করলে সেক্ষেত্রে ভক্তগণ ভয় মিশ্রিত ছড়া গান করে শোনান। যেমন —

"সোনা রায়ের দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
তার ভাতারক নাগাল পামু গরুচরের বেলা
সোনা রায়ের দক্ষিণা দিতে যায় করিবে হেলা
হাত পাও খসিয়া পড়ে চক্ষুর বিরায় ঢেলা।"[১০]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় উক্ত ছড়াটি কোচবিহারের সকল গ্রামের মত পার্শ্ববর্তী আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার সকল গ্রামেই প্রচলিত।

কোচবিহারের লোকদেবতা সোনারায় দক্ষিণবঙ্গের দক্ষিণ রায় ও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর মহাকালের সমগোত্রীয় একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

দিনহাটা মহকুমার বড়শাকদল গ্রামে পৌষ সংক্রান্তি ছাড়াও বছরের অন্যান্য সময়েও সোনারায়ের পূজা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার হরিরহাট, নাটাবাড়ী, অন্দরাণ ফুলবাড়ি ও মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে সোনা রায়ের পাঁচভাই যেমন — সোনারায়, রূপারায়, মানিকরায়, হীরারায়, বুড়ারায়ের প্রতীক কল্পনায় পূজা হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যায় খাগের মাথায় পাঁচরঙের লাল, নীল, সবুজ, হলুদ, সাদা পাটের গোছা বেঁধে বাড়ি বাড়ি গান করে ভক্তগণ মাগন সংগ্রহ করেন।

কোচবিহারের লৌকিক দেবকূলে শিবেরই সমগোত্রীয় এই লৌকিক দেবতার পূজা রাজবংশী হিন্দু সম্প্রদায় করলেও গরু যেহেতু হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়েরই গৃহপালিত প্রাণী - সম্পদ, তাই বাঘের আক্রমণ থেকে গোধনকে রক্ষা কল্পে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ই সোনারায়ের শরণাপন্ন হন।

মহাকাল ঃ

উত্তরবঙ্গের সর্বজন মান্য ব্যাঘ্র দেবতা হল মহাকাল। কোচবিহারে ব্যাঘ্র দেবতা হিসেবে সোনারায় ও মহাকাল ছাড়াও অপর এক ব্যাঘ্র দেবতার আরাধনা করেন স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়। তিনি হলেন ডাংধরা দেবতা। এই দেবতা প্রকৃতই গোরক্ষক দেবতা হিসেবে পূজিত ও সম্মানিত। পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন দক্ষিণারায়, তেমনি উত্তরবঙ্গে র সোনারায়। কোচবিহারে শিবের অন্যতম অনুষঙ্গী সোনারায়ের মত মহাকালও জেলার অন্যতম জনজাতি রাভা সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হন এখানে। ঐতিহ্যবাহী এই লোকদেবতার মূর্তি কল্পনায় দেখা যায় ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, মাথায় জটাভার, কোমরে গঞ্জিকা সেবনের কল্কি, পরনে ব্যাঘ্রচর্ম, সর্প ভূষণ, এক হাতে ত্রিশূল, অন্যহাতে বড়াভয়। সম্পূর্ণই বীরের প্রতিরূপ।

ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমারা জেলার প্রায় সকল গ্রামেই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ সম্পর্কিত লোকায়ত বিশ্বাস ও প্রচলিত সংস্কার প্রত্যক্ষ করি। যেমন জেলার আদিবাসী ও কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায়ের অন্যতম উপাস্য ব্যাঘ্র দেবতা মহাকাল। জেলার দেওয়ানহাট ভেটাগুড়ির মধ্যবর্তী স্থানে পাকা রাস্তার বামপাশে মহকাল দীর্ঘ দিন ধরে পূজিত। দিনহাটা মহকুমার বড় শাকদল গ্রামে বছরের যে কোন সময় পূজিত হন ব্যাঘ্র বাহন সোনারায়। এই সোনারায় এবং মহাকাল ছাড়াও এই জেলায় আরও একাধিক দেবতা বাঘের দেবতা হিসেবে পূজিত হন। শিব সদৃশ সোনারায়ের মৃন্ময় মূর্তিতে পূজা জেলার বিভিন্ন গ্রামে পৌষ সংক্রান্তির দিন অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। সোনারায়ের প্রতীকধর্মী পূজার প্রচলন জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধর্মীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির একটি উজ্জ্বল নিদর্শন। জেলার গ্রামাঞ্চলে ব্যাঘ্র দেবতার পূজার উদ্দেশ্যগুলি হল —

গৃহপালিত পশু অর্থাৎ গরু, ছাগল ইত্যাদি ব্যাঘ্র ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর হাত থেকে রক্ষা করা, গ্রামের সার্বিক মঙ্গল কামনা, কৃষিভিত্তিক সভ্যতার আদিম নিদর্শন হিসেবে শস্যের উৎপাদন ও ফলন বৃদ্ধি, গৃহপালিত পশুর রোগ মুক্তি ইত্যাদি।

সন্ন্যাসী ঠাকুর ঃ

কোচবিহারের লোকজীবন ও লোকায়ত সংস্কৃতিতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ দেবতা শিবের অপর এক লৌকিক রূপ দেখা যায়- তিনি হলেন সন্ন্যাসী ঠাকুর বা সন্ন্যাসী শিব। জেলার লৌকিক বিশ্বাসে এই সন্ন্যাসী ঠাকুর শিবের সমগোত্রীয় বলে পূজিত। উত্তরবঙ্গের অনেক জেলাতেই সন্ন্যাসী ঠাকুর পূজার প্রচলন কম। কোচবিহার জেলার দিনহাটা ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুরের প্রভাব দেখা যায় বেশী। প্রকৃত পক্ষে হিন্দু ধর্মের উদ্ভবের পূর্বেই এই দেবতা কোচবিহারের প্রায় সমস্ত গ্রামের সর্বত্রই একাধিক নামে পূজিত ও বন্দিত ছিলেন। ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী গ্রামের বুড়া ঠাকুর, দিনহাটার শিমূলবাড়ী গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুর, মেখলিগঞ্জ মহকুমার জামালদহ গ্রামের সন্ন্যাসী ঠাকুর বা সন্ন্যাসী মাসান, মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রামের সন্ন্যাসী মাসান বা গেরাম ঠাকুর সবই শিবের রূপান্তরে সন্ন্যাসী ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। আবার কোথাও মূর্তিহীন প্রস্তরখন্ড, বট — পাকুর, বিল্ব বৃক্ষ, সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাশাপাশি শিব জ্ঞানে পূজিত হন। জলপাইগুড়ি জেলাশহর থেকে ১৫/১৬ মাইল দূরবর্তী সন্ন্যাসী কাটা হাট নামক স্থানেও বৌদ্ধ প্যাগোডার আদলে তৈরী এক পাকা মন্দিরে পদ্মাসনে উপবিষ্ট বাঘের ছাল পরিহিত জটাধারী এক সন্ন্যাসী ঠাকুরের মূর্তি আজও বিদ্যমান। প্রতি বুধ ও শনিবার ব্যাঘ্র বাহন এই সন্ন্যাসী ঠাকুর আজও জাগ্রত দেবতা জ্ঞানে পূজা পান। কোচবিহার জেলার উক্ত গ্রাম গুলিতে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই এই সন্ন্যাসী ঠাকুরের বাহন বাঘ এবং সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে থাকে কল্কি। এঁর পূজারীরা হলেন রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের অধিকারী বা দেউসীগণ।

ত্রিনাথ / তেন্নাথ ঃ

আসাম ও অবিভক্ত বাংলার সর্বজনপ্রিয়, সর্বজনমান্য লোকদেবতা ত্রিনাথ স্থানভেদে তেন্নাথ নামেও পূজিত হন। ত্রিনাথের লৌকিক কাহিনী সূত্রে এই লোকদেবতা কোচবিহারের লোকায়ত জীবনের গভীর বিশ্বাসে ব্রহ্মা - বিষ্ণু - মহেশ্বরের প্রতিভূ। "লোকদেবতা ত্রিনাথ প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ - ত্রিরত্ন - বুদ্ধ - সংঘ - ধর্ম এই তিন রত্নের রূপের আড়ালে আদি নাথ শিব, মীননাথ ও গোরক্ষনাথ - এই ত্রিনাথের এক রূপ ত্রিনাথ কল্পনা করেন।" [১১]

জেলায় প্রচলিত লোকশ্রুতি অনুযায়ী গরু সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে ত্রিনাথের মেলা বা কীর্তন যেমন দেওয়া হয় তেমনি এই লোকদেবতার নামে পূজা দেন সবাই। বর্তমানে এই প্রাপ্তির সীমা ছাড়িয়ে গরুর অসুখ, গো - বৎসের মঙ্গল কামনা, গো - দুগ্ধের পরিমান বৃদ্ধি, মেয়ের বিয়ে, নিঃসন্তানের সন্তান কামনা, চাকুরি প্রাপ্তি, পরীক্ষায় পাশ ইত্যাদি স্থান পেয়েছে। জেলার সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এই লোকদেবতার প্রভাব থাকলেও নাথ ও যোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেই পূজা প্রদান, ভক্তি বিশ্বাসের আধিক্য দেখা যায়। কোচবিহার জেলা সদরের অন্তর্গত পুন্ডিবাড়ী ব্লকের কচুবন গ্রামের নাথ - যোগী সম্প্রদায়ের ত্রিনাথ ঠাকুরের পূজায় ভক্তবৃন্দের গাঁজা সেবন অবশ্যই করণীয় ধর্মাচার। এটি ত্রিনাথ পূজার অন্যতম অঙ্গ। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - ত্রিনাথের ভক্তগণ নিম্নলিখিত ছড়াটি আবৃত্তি করে ত্রিনাথ ঠাকুরের উদ্দেশ্যে নিবেদিত গাঁজা সেবন করে থাকেন —

"স্বর্গে ছিল ত্রিলক্যনাথ
মর্তে অধিকার
ভক্তে পাইয়ে তারে
করিল প্রচার।
ত্রিনাথের নাম যেবা এক চিত্তে লয়
সর্বশক্তি হয় তার রণে বনে জয়।" [১২]

মাথাভাঙ্গা মহকুমার জামালদহগামী রাস্তার মধ্যবর্তী অংশে চেঙ্গারখাতা খাগরীবাড়ী গ্রামের সুটুঙ্গা নদীর ব্রিজের

বাঁদিকে দক্ষিণমুখী টিনের চালা ঘরের মন্দিরে ষড়ভুজা, ত্রিমস্তক, দ্বিপদ সমন্বিত বৃষ বাহন শিবই ত্রিনাথ রূপে পূজিত হন। ষড়ভুজ শিবের দুটি হাত ও একটি মাথা পার্বতীর অনুকরণে শরীরের অর্ধাঙ্গের রঙ হলুদ। উক্ত গ্রামের উক্ত স্থানে প্রতিবছর ত্রয়োদশীর বারুণীর স্নানের সময় বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এই পূজা উপলক্ষ্যে উক্ত তিথিতে তর্পণ ও স্নানকে কেন্দ্র করে একটি মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পূজারী পবিত্র চক্রবর্তীর মতে পূজার মূল উপকরণ গরুর বাচ্চা প্রসবের ১৫ দিনের মাথায় দোয়ান দুধের ক্ষীরের নাড়ু, পানসুপারী, নতুন একগাছা পাটের দড়ি, ঘট ও ফলমূল। অবিভক্ত বাংলায় তথা বর্তমান বাংলাদেশে ত্রিনাথের মেলার উদ্দেশ্যে গাওয়া একটি গান এতদঞ্চলেও সমধিক প্রচলিত। যেমন —

"কলিতে তিন নাথের মেলা
খোঁড়ায় নাচে, কানায় দেখে,
বোবায় বলে বোম ভোলা।" [১৩]

বুড়া ঠাকুর ঃ

সমগ্র কোচবিহার জেলায় বিশেষ করে দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ, হলদিবাড়ী (থানা), তুফানগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে স্থানীয় রাজবংশী, রাভা ও অন্যান্য কৃষিজীবী উপজাতি ও আদিবাসী সমাজে যে গণ - দেবতা সর্বত্র বন্দিত ও পূজিত তিনি অবশ্যই বুড়া ঠাকুর । কোচবিহারে শিবেরই এই লৌকিক রূপ বা অনুসঙ্গী বুড়াঠাকুর অঞ্চলভেদে মহাদেব, মহাকাল, শিব সন্ন্যাসী ঠাকুর বিভিন্ন নামে পূজিত হন। নদীর ধার বা রাস্তার ধারে বট - পাকুড় গাছ তলায় এই লোকদেবতার থান বা পাট দেখা যায়। বেশীর ভাগক্ষেত্রেই বিমূর্ত প্রস্তর খন্ড বা মাটির ঢিবি বুড়া ঠাকুরের প্রতীকে পূজিত হয়। বুড়াঠাকুর কোন কোন অঞ্চলে বাঘের দেবতা হিসেবেও অরণ্যের অধিকারে সমৃদ্ধ। আর অরণ্য মানেই তার প্রধান অধিবাসী বাঘ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারের লোকসংস্কৃতিতে বাঘও একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তিগণ বিশেষ করে স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বাঘ না বলে বুড়ার বেটা কথাটির প্রচলন বেশী। শৈবতীর্থ কোচবিহারের স্থানীয় জনমনে জনপ্রিয়তার দিক থেকে আর কোন লৌকিক দেবতা এর কাছাকাছি নেই। অন্যান্য লৌকিক দেবতার মত এই বুড়া ঠাকুরের সন্তুষ্টি বিধানেও গ্রামবাসীগণ যথারীতি বিভিন্ন বস্তু মানত বা উৎসর্গ করেন। জলপাইগুড়ি জেলার সন্ন্যাসীকাটার হাট সংলগ্ন মন্দিরের সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিগ্রহকেও অনেকে বুড়া ঠাকুর বলেন। বাঘছাল পরিহিত ও প্রকান্ড গুল্ফ আচ্ছাদিত এই দেবতা এখানে বাঘের দেবতা বুড়াঠাকুর। বর্ধমান ও ২৪ পগণা জেলায় বুড়ো রাজ ও বাবা ঠাকুর নামে এরূপ এক লোকদেবতা পূজিত হন। বাংলাদেশে ব্রাত্য হিন্দুগণ কোন এক সময় ব্রাহ্মণ্য বা শাস্ত্রীয় দেবতার পূজার অধিকারে বঞ্চিত হলেও তাদের শিবের প্রতি ভক্তি অটুট ছিল এবং পরবর্তীতে তারা লোকায়ত ধারণা ও বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে শাস্ত্রীয় শিবের একটি নতুন নামকরণ করেন, ইনিই লোকসমাজে স্থানভেদে বাবা ঠাকুর, বুড়া ঠাকুর বা বৃদ্ধ, নিরীহ, শান্ত শিব রূপেই পূজিত হয়ে আসছেন বাংলার সর্বত্র। তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ি গ্রামেও বুড়াঠাকুর পূজিত হন। রোগ - ভোগ ও গবাদিপশুর মঙ্গল কামনা ব্যতীত বন্যায় নদীর ভাঙন রোধে বুড়া ঠাকুরের পূজা দেন অনেকে।

জেলার সকল গ্রামে পূজিত এই লোকদেবতার বৈশিষ্ট্য বিচারে বলা যায় কোচবিহারে রাজবংশী সমাজে আন্তরিক বিশ্বাস হল অপদেবতা বুড়া ঠাকুরের পূজা দিলে সর্দিজ্বর প্রশমিত হয়। এই লোকবিশ্বাসে ভরপুর জেলার লোকায়ত জীবন। বুড়া ঠাকুরের সমগোত্রীয় এক লোক দেবতার সন্ধান আমরা পাই হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়া বাড়ি গ্রামে যাঁর নাম "বুড়া ঢ্যাল্লা" ঠাকুর। ইনিও সর্দিকাশির মত রোগ নিরাময়ের দেবতা। বুড়া ঢ্যাল্লার কথা স্বতন্ত্র স্থানে আলোচিত। কোচবিহারের প্রচলিত বুড়া ঠাকুরের পূজায় কোন নির্দিষ্ট পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। বাড়ির যে কেউ বা মানতকারী তার প্রয়োজন মত পূজা দেন। জেলার মাঘপালা গ্রামে গৃহস্থ বাড়িতে গরু প্রসবকালে বুড়া ঠাকুরের বিপরীতে 'বুড়ি' মার পূজা দেওয়া হয়। গ্রামের সর্বসাধারণের বা ব্যক্তি বিশেষের রোগ ভোগ বা অমঙ্গল দেখা দিলে বুড়া - বুড়ির পূজা দেওয়া হয়। শিব ও তার শক্তিই এখানে বুড়া - বুড়ির প্রতীক।

"কোচবিহার এবং রঙপুর অঞ্চলের হিন্দু সমাজে ময়না বুড়ি অথবা বুড়িপূজা হয়ে থাকে। শিশু সন্তানের উপর 'বুড়ির ঝোঁক' (বুড়ির কু - দৃষ্টি) এর কথা সর্বত্র শোনা যায়।" [১৪] জেলার অনেক গ্রামেই বুড়ির থান বা পাট আছে। তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সির হাট ব্লকের ঠেটারপাট গ্রামে প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার বুড়ির পাটে বুড়িমার পাশাপাশি একাধিক লোকদেবতার পূজা হয়। এতদঞ্চলে প্রচলিত ময়না বুড়ির পূজার মন্ত্রে দেখা যায় - 'থান মধ্যে বন্দো মা গৌড় ষোল আনা।'

মাথাভাঙ্গা মহকুমার পূর্বদিকে বুড়ার পাট নামে একটি স্থানে মূর্তিহীন বুড়া ঠাকুর পূজিত হন। গ্রামবাসীগণ প্রতিদিন ধূপ - দীপ দিয়ে ভক্তি নিবেদন করে। "তুফানগঞ্জ মহকুমার রসিকবিল, বড় শালবাড়ী, ভাড়েয়া, হরিরহাট, বাঁশরাজা, ছাট্‌রামপুর, বোচামারী গ্রামের বনবাসী ও কৃষিজীবী রাভাগণ গৃহপালিত পশু ও পারিবারিক মঙ্গল কামনায় বুড়া ঠাকুরের পূজা করেন।"[১৫] অনেক গ্রামে বুড়া ঠাকুরের পাটে মূর্তি মানত অনুযায়ী একটি বাঁশের টুকরো বা ঠগা প্রোথিত করেন বাড়ির তুলসী মঞ্চের পাশে। অনেকে উক্ত ঠগার দুপাশে একটি করে সাদা পাটের চামর ও লাঙ্গল রাখেন। শিব মূলত কৃষি দেবতা, তাই তার অনুষঙ্গী বুড়াঠাকুরের পাটের পাশে লাঙ্গল বা পাটের চামর রাখাকে কৃষিভিত্তিক সভ্যতার নিদর্শন বলা যায়।

গেরাম ঠাকুর ঃ

কোচবিহারে বিশেষ করে গ্রামের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলকারী দেবতা হলেন গেরাম ঠাকুর। স্থান ভেদে গারাম ঠাকুর নামেও পরিচিত। এই লোকদেবতার নামের মধ্যেই গ্রামের সম্পর্কের কথা নিহীত আছে।

একই গ্রামে এক বা একাধিক গেরাম ঠাকুর থাকতে পারে। কোচবিহারে গ্রামাঞ্চলে পূজিত সকল লোকদেবতাই এক অর্থে গেরাম ঠাকুর। এতদঞ্চলে পূজিত কোথাও শিব বা শিবের অনুষঙ্গী যার বাহন বৃষ, বাঘ নয়। অনেকক্ষেত্রে দেখা যায় এই লোক দেবতার বাহন হাতি। আবার এখানে হাতি বাহন সন্ন্যাসী ঠাকুরও দৃষ্ট হয়। পার্থক্য হল গেরাম ঠাকুরের বাহন হাতির সঙ্গে মাহুত থাকেন কিন্তু সন্ন্যাসী ঠাকুরের কোন মাহুত থাকেন না। অনেকক্ষেত্রে গ্রামের কোন নির্জন স্থানে, কোন বৃক্ষতলে, কোন প্রস্তরখন্ডও অনেক গ্রামে গেরাম ঠাকুর নামে পূজিত হন। সে সকল স্থানে নির্দিষ্ট দিন ছাড়াও বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামে বিভিন্ন পাড়ায় একাধিক নামে গেরাম ঠাকুরের পূজা হয়। জেলার প্রায় সকল মহকুমায় সব বসতবাড়ির বাইরে উত্তর পূর্ব কোণে কিংবা কোন বটপাকুড় বা শেওড়া গাছের নীচে খড়ের চালা ঘর বা ছোট ছোট টিনের সারিবদ্ধ দোচালা ঘর দেখা যায়। এগুলি গেরাম ঠাকুরের পাট বা থান। গ্রামের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে গ্রামের সার্বিক মঙ্গলকামনায় এই পূজায় অংশ গ্রহণ করেন। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এরূপ পূজায় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে আমরা আদিম মানব সমাজের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের প্রভাব লক্ষ্য করি। জেলায় পূজিত এই গেরাম ঠাকুর অনেক ক্ষেত্রেই মূর্তিহীন। তাই গ্রামের ঐ সকল উন্মুক্ত স্থানে লোকদেবতার থান বা চালাঘরের কোথাও মাটির ঢিবি বা প্রস্তর খন্ড গ্রাম দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হন। গারাম বা গেরাম ঠাকুর - এই লোক দেবতাকে যে নামেই ডাকি না কেন বা সারা বছর প্রকৃতির কোলে অরক্ষিত অবস্থায় ঝোপঝাড় জঙ্গলে ছেয়ে থাকলেও বাৎসরিক পূজার সময় নতুন রূপ ধারণ করেন এই দেবতা। কোচবিহারে গ্রাম দেবতা গেরাম বা গারাম ঠাকুর, গ্রামবাবা, গ্রাম ঠাকুর, গ্রাম দেবতা, গ্রাম রক্ষী প্রভৃতি নামেও পূজিত হন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার মৃগীপুর গ্রামে গ্রাম ঠাকুরকে পূজা দিয়েই কৃষি কর্মের সূচনা করা হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই পূজার সময় থাকে বৈশাখ মাস। কৃষিকর্ম ছাড়াও গৃহস্থবাড়ীর অনেক শুভকাজ ও বিবাহের মত মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের পূর্বে অনেকে গেরাম ঠাকুরের নামে পূজা দেন। মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণা জেলায় কালুরায় ও দক্ষিণরায় গ্রাম সমাজের লৌকিক দেবতা, তাঁরা এতদঞ্চলের গেরাম ঠাকুরের মতই পূজিত হন। ক্ষেত্র পালন বা কৃষি দেবতা হিসেবে কোচবিহারের গেরাম ঠাকুর ও সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতই ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুর জেলার একাধিক গ্রামে কৃষিকাজ শুরু করার সময় কৃষকগণ দক্ষিণরায় ও কালুরায়কে পূজা দেন। লোকদেবতা কালুরায় কোন কোন জেলায় ধর্মঠাকুর রূপেও পূজিত হন। কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা, মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকে এই গেরাম ঠাকুরের পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী।

কোচবিহার জেলার বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী হলদিবাড়ী ব্লকের হলদিবাড়ী গ্রাম্যশহর থেকে মানিকগঞ্জগামী রাস্তার বাঁ পাশে জিগা বা পাকুড় গাছের গোড়ায় বাঁধানো চাতালের উপর বিভিন্ন আকৃতির কয়েকখন্ড পাথরই গেরাম ঠাকুর হিসেবে পূজিত হন। মূর্তিহীন গাছ ও পাথর হলদিবাড়ীর স্থানীয় সম্প্রদায় বিশেষ করে সর্ব প্রাণবাদে বিশ্বাসী মানুষের ভক্তি গ্রহণ করলেও এই গেরামঠাকুর সর্বজনীন ভাবে হিন্দু - মুসলিম নির্বিশেষে সবার পূজা পান। পূজার সময়কাল জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ থেকে পুরো আষাঢ় মাস। পূজার দিন লাল নিশান গেড়ে দেওয়া হয় গাছ ও পাথরের গোড়ায়। উক্ত নিশান পূজার সময় নির্দেশ করে পথ চারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূজার উপকরণ বা নৈবেদ্য হিসেবে দেওয়া হয় দই, কাঁচা দুধ, চিড়া, কলা, মধু আতপচাল ইত্যাদি। ছেলেপুলে হারালে, গবাদিপশু হারালে গেরামঠাকুরকে মানত করে পূজা দিলেই হারানো বস্তু প্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা দেয় এই লোকবিশ্বাস হলদিবাড়ী ব্লকের গ্রামগুলির সর্বত্র প্রচলিত।

এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার মৃগীপুর গ্রামে আমরা দেখতে পাই মেখলিগঞ্জ ধাপরাহাটগামী রাস্তার বাম পার্শ্বে দক্ষিণমুখী চারচালা পাকা মন্দিরে গেরাম ঠাকুর পূজিত হন। গেরাম ঠাকুর এখানে কালোরঙের হস্তি পৃষ্ঠে আসীন এক জটাধারী শিব। ঠাকুরের ডান হাতে বরাভয় ও বামহাতে পেন্টি, সঙ্গী মাহুত। দুধ, কলা ও ফল মূলের নৈবেদ্য সাজিয়ে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামবাসীগণ প্রতি বছর বৈশাখ মাসে কৃষিকর্মের সূচনায় বাৎসরিক পূজা দিলেও সারা বছর মানতকারীগণ পূজা দেন। অনেকে বলি না দিয়ে পাঁঠা ও পায়রা উৎসর্গ করেন। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ। উক্ত মহকুমার ডাকুর হাট গ্রামে একই রাস্তার বামপার্শ্বে খড়ের ঘরে পাশাপাশি পূজিত হন হস্তী পৃষ্ঠে আসীন, বামহাতে কল্কি, মাহুত সহ শিব। এই গ্রামে গেরাম ঠাকুর শিব ও মাসান জ্ঞানে পূজিত হন। গেরাম ঠাকুরের স্থান নির্বাচন হয় সাধারণত গৃহস্থবাড়ী থেকে দূরে বাঁশবাগানের ছায়া ঘেরা কোন স্থানে, কখনও রাস্তার ধারে জঙ্গলাকীর্ণ কোন নির্জন স্থানে, আবার কোন উন্মুক্ত প্রান্তরের উত্তরপূর্ব কোণে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ছোট ছোট দো - চালা ঘরের এই দেবতার থান বা পাট বাৎসরিক পূজার সময় পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। গেরাম ঠাকুরের পূজার সময় সাধারণত সকাল। মাটির মূর্তির বদলে কোন কোন গ্রামে আবার কলা গাছের খোল দিয়ে গেরাম ঠাকুরের মূর্তি তৈরী হয়। উন্মুক্তস্থানে বিমূর্ত গেরাম ঠাকুরের থান মাটির বেদী হয় সাধারণত দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে যথা ক্রমে ৯ ফুট ও ৬ ফুট। তবে গেরাম ঠাকুরের পূজারী প্রায় সব ক্ষেত্রেই গ্রামের অধিকারী ব্রাহ্মণ।

কোচবিহারের অনেক গ্রামে দেখা যায় পারিবারিক মঙ্গল কামনায় অনেক সময় বাড়ির মেয়েরা দল বেঁধে গান করে গেরাম ঠাকুরের থানে পূজা দিতে যান। এমন একটি প্রচলিত গান হল —

"গারাম ঠাকুরের ঘরোত কিসের বাজনা বাজে
বাপে ভাই রাজী গারাম ঠাকুরের পূজে।" [১৬]

জ্বরাসুর ঃ

দক্ষিণবঙ্গের কোন জেলায় জ্বরাসুর লোকদেবতা পঞ্চানন্দ ঠাকুরের অনুচর হিসেবে পরিচিত। উক্ত অঞ্চলে এই লোকদেবতা বন্ধ্যা নারীর সন্তান কামনায় পূজিত হন। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই শস্যদেবতা হিসেবেও অনেক কৃষক পূজা করেন এই দেবতাকে। "দক্ষিণবঙ্গের ২৪ পরগণা জেলার অনেক অঞ্চলেই এই দেবতাকে শীতলার পাশেই অবস্থান করতে দেখা যায়।" [১৭] কোচবিহার জেলাতেও এই লোকদেবতার অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়।

উড়িষ্যার "জ্বর নারায়ণ", দক্ষিণভারতের 'মারী দিয়াম্মা'ও রোগ - ব্যাধি নিরাময়কারী দেবতা। সেখানে অবশ্য তিনি নারী দেবতা হলেও কোচবিহারের জ্বরাসুর কিন্তু পুরুষ দেবতা।

প্রাচীন বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ ও সংস্কৃত কাব্য গ্রন্থেও এই অনার্য জ্বরাসুর দেবতার উল্লেখ পাওয়া যায়। আজও কোচবিহারের পল্লী অঞ্চলে অসুর বা দৈত্যদানব প্রভৃতি আর্যেতর জ্বর নিরাময়ের দেবতা, জ্বরাসুরের নাম থেকেই বোঝা যায় তিনি অসুরকুলের দেবতা। তবে মনে হয় এই দেবতার উৎপত্তিস্থল বর্তমান বাংলাদেশ। জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার থেটারপাট গ্রাম ব্যতীত অন্য অনেক গ্রামে শিব বা বুড়া ঠাকুরের অনুসঙ্গী এই লোকদেবতার পূজার প্রচলন খুব বেশী নেই।

তুফানগঞ্জ মহকুমার বক্সিরহাট ব্লকের থেটারপাট গ্রামে জ্বরাসুর বা জ্বর নিরাময় কারী এই দেবতা পূজিত হন পঞ্চাশ বছর ধরে। বর্তমান বাংলা দেশের ঝালো, মালো, কৈবর্ত্য সম্প্রদায়ের প্রধান ব্যক্তি সয়ম্বর কবিরাজ দেশান্তরের সঙ্গে সঙ্গে এই দেবতাকেও স্থানান্তর করেন আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বে। আজও উক্ত অঞ্চলে সমান বিশ্বাসে এই লোকদেবতা পূজিত হন প্রতি বছর বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের শনিবার। এই লোকদেবতার পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি না দিয়ে উৎসর্গ করা হয়। জেলার এটি অন্যতম স্থানান্তরিত (মাইগ্রেটেড) লোক দেবতা। বর্তমানে যে স্থানে পূজিত হন সেই স্থানের নাম বুড়ির পাট। "এই পাটে জ্বরাসুরের সঙ্গে আর তিনজন লোকদেবতা একই দিনে পূজিত হন। যেমন — বুড়িমা, নিস্কিন্দা মাসান ও কালী। তান্ত্রিক মতে বর্তমানে পূজা করেন প্রবর্তক সয়ম্বর কবিরাজের পুত্র দীনেশ দাস। ফুল, ফল, নৈবেদ্য ও ভোগ পূজার মূল উপকরণ।" [১৮]

বৌদ্ধ সমাজেও এরূপ আরোগ্য দেবতা হিসেবে পূজিত বহু দেবতার নাম শোনা যায়। গোপেন্দ্র কৃষ্ণ বসু তাঁর 'বাংলার লৌকিক দেবতা' নামক গ্রন্থে বলেছেন, জ্বরাসুরের সঙ্গে 'মহাজনিদের' এক সময় সম্পর্ক ছিল। এই দেবতার রূপ ও বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা নিজ সমাজের ঐ দেবতাকুলের আকৃতি গঠন করেন এবং আরোগ্য দেবতার বৈশিষ্ট্য দান করেন।

গোরক্ষনাথ ঃ

কোচবিহারে রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজে পূজিত অন্যতম লোকদেবতা গোরক্ষনাথ। এর জন্ম, সময়, স্থান এবং জাতি নিয়ে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। "গ্রিয়ারসন সাহেবের মতে গোরক্ষনাথ ছিলেন নেপালী বৌদ্ধ যোগী। উত্তরবঙ্গের প্রচলিত একাধিক লোকগীতিতে গোরক্ষনাথের জন্মস্থান জল্পেশ এবং মেচপাড়ার (গোয়াল পাড়া জেলায়) নিকটবর্তী বলে কথিত আছে। আবার প্রাচীন নেপালী মুদ্রায়ও শ্রী শ্রী গোরক্ষনাথের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়"[১৯] কোচবিহারে এই দেবতার পূজার আঙ্গিকে দেখা যায় মূল পূজার এক সপ্তাহ পূর্ব থেকে গ্রামের বয়স্ক ও যুবকেরা দল বেঁধে গোরক্ষনাথের গান গেয়ে বাড়ি বাড়ি চাল, টাকা, সব্জী ইত্যাদি মাগন সংগ্রহ করেন গান গাওয়ার সময় দলের প্রত্যেকেই একটি বাঁশের লাঠি হাতে নিয়ে থাকেন। কোন গৃহস্থবাড়িতে প্রবেশের পর বাড়ির উঠোনের মাটিতে ধান ভানার মত করে লাঠি ঠেকিয়ে সবাই এক সঙ্গে গান গাইতে শুরু করেন। প্রথমে দলের প্রধান বা মূল গায়ক গানের একটি চরণ গাইতে থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে দোহারের ন্যায় অপর সকলে পরের চরণটি গায়। এই ভাবে সম্পূর্ণ গানটি গাওয়া হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামের শশিমোহন বর্মা এই রূপ একটি গান গেয়ে শোনান। তা হল —

মূল গায়ক	দোহার
"এই গাই কি কাপিলি বেটি	হয়রে হয়।
দুধ হয় কি আটারো ঘটি	হয়রে হয়।
সেই দুধ কি হইল	হয়রে হয়।
সেই দুধ বিলাই খাইল	হয়রে হয়।
সেই নদী কি হইল	হয়রে হয়।
সেই নদীৎ নেপেরা জ্বালাইল	হয়রে হয়।"

বাংলা দেশে গরুর অধিক দুধ পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় এরূপ গানের উল্লেখ পাওয়া যায় —

"এই গাইয়ের দুই বাছুর —— হেচ্ছ।
চিতক পাইল্যা দাদুর বাছুর — হেচ্ছ।
গাইয়ের নাম চ্যাল্লামুড়ি — হেচ্ছ।
দুধ অয় আটারো কুড়ি — হেচ্ছ।" [২০]

কোচবিহারে গোরক্ষনাথকে আবার ত্রিনাথ কল্পনা করা হয় - ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর - এই তিনে মিলে ত্রিনাথ। উত্তরবঙ্গের নাথ - যোগী সম্প্রদায় ত্রিনাথকে শিব বলে মান্য করেন। আবার অনেকে মনেকরেন গোরক্ষনাথ শিবের পুত্র। কোচবিহারের লোকায়ত বিশ্বাস অনুযায়ী হারানো গরু ফিরে পাওয়ার আশায় এবং গরু সংক্রান্ত যে কোন বিষয়কে কেন্দ্র করে গোরক্ষনাথের পূজা অনুষ্ঠিত হলে তাকে তিন নাথের মেলাও বলেন। সে সময় কীর্তনের মাধ্যমে এই দেবতার পূজা দেন। এই ক্ষেত্রে শুধু হারানো গরু প্রাপ্তিই নয়, মেয়ের বিয়ে, সন্তান কামনা, পরীক্ষায় পাশ, চাকুরী প্রভৃতি আশা আকাঙ্ক্ষাও ব্যক্ত হয়। গরুর বাচ্চা প্রসবের একুশদিন পর এই পূজা দিতে হয়। এ সময় গরুর অশৌচ থাকে। এই সময় গরুর দুধ ক্ষীর করে এক ধরণের নাড়ু বানানো হয়। অনেকে একটু ভাং মিশিয়ে দেন। একে বলা হয় গুক্ষের নাড়ু। সঙ্গে থাকে পান, সুপারি ও বাছুরের জন্য একগাছা নতুন দড়ি। আর থাকে ঘট, আসন ও অন্যান্য পূজার উপকরণ। এই পূজায় কোন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করেন না। যে কোন ব্যক্তি এই পূজা পরিচালনা করতে পারেন। "গোরক্ষনাথ প্রীতে হরি হরি বোল" এই ধ্বনি দিয়ে পূজার শুরু এবং পাঁচালী পাঠের শেষে একই ধ্বনি দিয়ে পূজার সমাপ্তি ঘোষিত হয়।

গোরক্ষনাথের পূজা প্রকরণে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অপর একটি রীতি প্রচলিত আছে। এই রীতি প্রকরণে দেখা যায় গরুর অসুখ - বিসুখ হলে কিংবা গরু হারালে গৃহস্থগণ গোয়াল ঘরের ভিতরে কলা, খই, কিছু ফলমূল দিয়ে গোরক্ষনাথের পূজা করেন। পাড়ার বৃদ্ধ ও যুবকগণ সমবেত হয়ে গোরক্ষনাথের পূজা করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি ছড়া তারা কীর্তনের মত করে গান করেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাঘাট গ্রামে প্রচলিত এরূপ একটি ছড়া হল —

"কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে ঘটি
গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর বেটি
কান্দেরে গোয়াল নন্দী হাতে নিয়ে দাও
গাভীর বদলে ক্যানে না মরে মোর মাও।"[২১]

ডঃ চারুচন্দ্র সান্যালের মতে গোরক্ষনাথের পূজা শিব পূজারই নামান্তর। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন গো রক্ষক হিসেবে গোরক্ষনাথের প্রসঙ্গ এসেছে। তিনি নাথ সম্প্রদায়ের আদি গুরু গোরক্ষনাথ নন। কোচবিহারের লোকবিশ্বাস গরুর দেবতা গোরক্ষনাথ পূজা পেলেই সন্তুষ্ট হন এবং গৃহস্থের গো সম্পদ বৃদ্ধি পায়।

বুড়াঢ্যাল্লা ঠাকুর ঃ

লোকদেবতার বৈচিত্র্যে কোচবিহারের লোকজীবন যে প্রাণবন্ত তার প্রমাণ আমরা পাই জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য ব্যাধিহরণকারী দেবতা হলেন বুড়া ঢ্যাল্লা ঠাকুর। কৃষি প্রধান কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের উপাস্য অন্যতম একটি লৌকিক দেবতা এই ঠাকুর। আদিম মানুষের বিমূর্ত লোকদেবতার পূজার যে রূপের কথা আমরা জানি হলদিবাড়ী ব্লকের এই গ্রামের ঢ্যাল্লা ঠাকুর তার নিদর্শন। উন্মুক্ত মাঠ কিংবা কৃষিক্ষেত্রের উত্তর পশ্চিম কোণে আট নয় ফুট লম্বা প্রোথিত একটি বংশ দন্ডের মাথায় পাটের গুছি ছনের ঝাড়ু ও একটি ভাঙা ডেলি ঝুলিয়ে তিনটি সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে এই ঢ্যাল্লা ঠাকুরের মূর্তি তৈরী করা হয়। গ্রামের আবাল - বৃদ্ধ - বণিতার আজন্ম বিশ্বাস গরুর বাচ্চা হলে প্রথম দোহানো দুধ দ্বারা ঘটে পাতা দই , চিঁড়া, আঁটিয়া কলা ও আতপ চালের নৈবেদ্য দিয়ে পূজা দান কর্তব্য। এই পূজায় নেই যেমন কোন শাস্ত্রীয় মন্ত্র, তেমনি নেই নির্দিষ্ট পুরোহিত। মানতকারী নিজেই উক্ত নৈবেদ্য দিয়ে প্রণাম করে পূজা সারেন। ১৫/৬/৯৯ ইং তারিখে এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় লোকদেবতার এই থানের পাশাপাশি পূজিত হন গেরাম ঠাকুর, কালী হরিবলা, তিস্তাবুড়ি ঠাকুর। সর্দিকাশি নিরাময়কারী এই লোকদেবতার পূজার কোন দিনক্ষণ নেই। কাশিয়াবাড়ি গ্রামের কৃষক বাহাত্তর বছরের প্রবীণ খগেন রায়ের মতে জাগ্রত এই ঢ্যাল্লা ঠাকুর গ্রামের জাগ্রত প্রহরী। গ্রামবাসীর বিপদে-আপদে, রোগে - ব্যধিতে মানত করলেই তিনি সাড়া দেন।

মাসান ঃ

কোচবিহারের ভয়ঙ্কর লোকদেবতা মাসান সম্পর্কিত এতদঞ্চলের লোকবিশ্বাস হল ধর্মঠাকুরের কন্যা কালী। এই কালীর ১৮ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান হল মাসান। আবার কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের অপর লোকবিশ্বাস হল মাসান হচ্ছে ছয়কুড়ি ষাট রকমের এবং মাসানের জন্ম হয় ভাদ্র মাসের শনিবার।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ও কদমতলা অঞ্চলে মাসানের জন্ম সম্পর্কে লোকবিশ্বাস হল -তে ঘাটায় কালীর আনন্দে নৃত্যরত অবস্থায় প্রতি ঘর্ম বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয় এক একটি মাসানের, যেমন — "নাচিতে নাচিতে কালী আইয়র / চুইয়া পড়ে ঘাম / তাতে সৃষ্টি হইল / এ জলা মাসান।"[২২]

ভয়ঙ্কর রূপী লৌকিক দেবতা মাসানকে কোচবিহারের গ্রামীণ আদিবাসী ও রাজবংশী সমাজের মানুষ কালী ও ধর্মের সন্তান রূপে ভক্তি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস করেন। উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়িতে মাসান ঠাকুরের জন্ম বৃত্তান্ত সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী ও লেকবিশ্বাস হল "একসময় মা কালী একাকী নদীতে স্নান করতে যান। হঠাৎ সেখানে ধর্ম দেবতার আবির্ভাব ঘটে। এর পর উভয়ের মিলনের ফলে জন্ম হয় মাসানের। সে সময় তার নাম হয় 'পিছলা মাসান'। তাকে বলা হয় বিরাট যোদ্ধা।"[২৩] এই জেলার সমস্ত গ্রামেই ওঝা, রোজা, কবিরাজ, বৈদ্য, ভোঙরিয়াগণই মাসানের উপস্থিতি, অবস্থান, মাহাত্ম্য বর্ণনা করেন।

এই ওঝাদেরই হঠাৎ দর্শনে কোন ব্যক্তি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে জ্বরে আক্রান্ত হলে মাসানকে শান্ত করতে পূজা দেন। লোকদেবতা মাসানকে এতদঞ্চলে কালীর সন্তান এবং অশ্বারোহী মহাশক্তির আধার হিসেবেও দেখা হয়। জনবসতিপূর্ণ এলাকা বাদে জেলার সমস্ত গ্রামেই এই দেবতার অধিষ্ঠান বেশীর ভাগ জায়গায় থাকে বট বা শ্যাওড়া গাছের নীচে কিংবা কোন রাস্তার তে - মাথার ধারে। কোন নির্জন নদীর ধারে কোথাও বা কালীর পাটের পাশে । ডঃ চারু সান্যাল তাঁর "Rajbansis of North Bengal" গ্রন্থে ষোল (১৬) রকম মাসানের কথা বলেছেন। যেমন — "বাড়িকা মাসান, পিছলা, ঘাটের মাসান, ছুচিয়া মাসান, চলান, বহিতা, কাল, কুহুনিয়া, নাঙঘা, বিশুয়া, ওবুয়া, শুকনা, ভুলা, ড্যামসা, উঙরিয়া, নারহা," [২৪] যদিও উপরোক্ত ষোল রকম মাসানের বেশীর ভাগই জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে দেখা যায়। মাসানের রকম ফের, নামের বৈচিত্র্য, মূর্তির বৈচিত্র্য ইত্যাদি কোচবিহার জেলায় জলপাইগুড়ি জেলার চেয়ে কিছুটা স্বতন্ত্র। আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষায় জেলার পাঁচটি মহকুমা ও একটি ব্লকের একাধিক গ্রামে চব্বিশ (২৪) রকম মাসানের রূপ দেখতে পাই - (১) গদাধর মাসান (২) কুচিয়ামারী মাসান (৩) কানার দীঘি মাসান (৪) শূর মাসান (৫) সুন্দরমালা মাসান (৬) চাপিলা মাসান (৭) খ্যাতাওড়া মাসান (৮) পোড়া মাসান (৯) ভ্যাড়া মাসান (১০) টসা মাসান (১১) ঘুগরা মাসান (১২) গড়কাটা মাসান (১৩) জলুয়া মাসান (১৪) ঘোড়া মাসান (১৫) হাতি মাসান (১৬) সিংহ মাসান (১৭) পানিমাছ (কচ্ছপ) মাসান (১৮) নিস্কিন্দা মাসান (১৯) মুড়িয়া মাসান (২০) কালী মাসান (২১) শ্মশান মাসান (২২) মহাদেব মাসান (২৩) যখা মাসান (২৪) পোষা মাসান।

প্রথমেই বলা হয়েছে মাসান ঠাকুরের পাট বা থানের অবস্থান লোকালয়ের বাইরে হয়। কোথাও বা ছন দিয়ে দোচালা ঘর, কোথাও বট বা শ্যাওড়া গাছের নীচে ফাঁকা জায়গায় এর অবস্থান। তবে মুক্তাঙ্গণ জঙ্গলাকীর্ণ জায়গায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূজিত হন শোলার তৈরী অশ্বারোহী মাসান । দিনহাটা মহকুমার বর্ধিষ্ণু সব গ্রামাঞ্চলে বেশীরভাগ মাসান পাট হল টিনের চারচালা বা দোচালা বা দোচালা পাকা দেওয়াল বিশিষ্ট। জেলার বিভিন্ন মহকুমায় মাসানের পূজা পদ্ধতিতে কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন — তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী, নাটাবাড়ী, হরিরহাট গ্রামে মাসান ঠাকুরের পূজায় ওঝা, বৈদ্য বা পূজারী এবং আক্রান্ত রোগী ব্যতীত পূজার সময় কেউ সামনে থাকে না। আবার দিনহাটা মহকুমার বালাসী, আলোকঝাড়ি, ত্রিমোহিনী এবং হলদিবাড়ী - মেখলিগঞ্জের বিভিন্ন গ্রামে এর বিপরীত দৃশ্য দেখা যায়। অর্থাৎ মাসান এখানে সার্বজনীন ভাবে পূজিত।

মাসান ঠাকুরের মূর্তি বা আদল বিচার করলে দেখা যায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মৃন্ময় মূর্তি দন্ডায়মান অথবা পদ্মাসনে উপবিষ্ট। হাতে কোথাও পেন্টি কোথাও গদা। গ্রামরক্ষী লোকদেবতার বড় অস্ত্র এই দুটি। তুফানগঞ্জ ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার প্রত্যন্ত বহু গ্রামে স্থানীয় লোকশিল্পীদের তৈরী শোলার অশ্বারোহী মাসান পূজিত হন। এই লোকদেবতার মূর্তির গড়ন এবং বাহনের বৈচিত্র্য প্রসঙ্গে বলা যায় - বীভৎস মূর্তিমান এই দেবতা কোথাও মুন্ডহীন বক্ষে চোখ, কোথাও রুদ্ররূপী হাতি বাহন ও সিংহ বাহন, কোথাও গদাধারী ভীমরূপী। কোথাও বা পদ্মাসনে আসীন শিব বা মহাকালের মত গায়ের রঙ, কোথাও বা কৃষ্ণবর্ণ ও নীল, কোথাও তার বাহন কচ্ছপ, কোথাও শোলমাছ, ভেড়া, কোথাও ঝাকড়া চুলে মাথায় পেট্টি (ফেট্টি) বাঁধা - এটাই কোচবিহারের মাসান নামক লোকদেবতার মূর্তি কল্পনার বাস্তপ রূপ।

পূর্বে থান বা পাটে বা ঝোপঝাড়ে এই লোকদেবতা মূর্তিহীন ভাবে পূজিত হতেন। সময়ের বির্বতনে প্রচলন হয় শোলার মূর্তির। বিমূর্ত থেকে এই মূর্তিতে উত্তরণের মধ্যে অশাস্ত্রীয় এই লোকদেবতা আজ সর্বত্রই শাস্ত্রীয় দেবতার মত সম্মানিত ও মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত। তবে রূপ বৈচিত্র্যে যাই হোক না কেন রুক্ষতা ও উগ্রতা প্রায় সব মূর্তিতেই বিরাজমান। কালের বিবর্তনে দেবদেবীর প্রভাব আদিম মানুষের মনকে প্রভাবিত করে নিজস্ব মূর্তিতে ধরা দেয়। জেলার মাসান নামক এই লৌকিক দেবতার মূর্তি কল্পনাতেও এই বিবর্তন এসেছে।

মাসান ঠাকুরের কোপ, আক্রমণ বা ভর হয় সাধারণত সংক্রান্তি, অমাবস্যা, শনি ও মঙ্গলবার। রোগাক্রান্ত বা বিকারগ্রস্ত মানুষের আরোগ্য কামনায় এই পূজা করা হয়। এই অপদেবতা দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির লক্ষণ হিসেবে দেখা যায় হাতে তুড়ি মারা, বাঁশের শব্দ, ঢিল মারা, আগুণ জ্বালানো এবং রাত্রে মাছ ধরতে চাওয়া, পোড়ামাটি খেতে চাওয়া প্রভৃতি উপসর্গ। গ্রামের সাধারণ মানুষ বিশেষ করে জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় ওঝার মাধ্যমে এই ভয়ঙ্কর দেবতার পূজায় মানত করেন। পূজার উপকরণে থাকে উনানের পোড়ামাটি, শোলমাছ ও মাটির প্রদীপ এবং এগুলি রাখা হয় কলার পাতায়। সঙ্গে এক জোড়া কবুতরও থাকে তবে এই পূজার প্রধান উপকরণ আঁটিয়া কলা, ঘটিতে পাতা দই, ভুরভুরা চিড়ার দশ বা পাঁচ খোল

নৈবেদ্য, লাল রঙের দুটি নিশান, চালভাজা, কোন কোন গ্রামে সুরা ও ডিম। পূর্বে এই পূজায় শূয়োরের মাংসও দেওয়া হত। মানতকারীগণ শূয়োর বলি দিয়ে উৎসর্গ করতেন। পূজার প্রশস্ত সময় ভর দুপুর ও নিশা (গভীর) রাত্রি। মাসানের উগ্রতা ও আক্রান্ত রোগীর অবস্থা বুঝে অনেকে এই পূজার প্রসাদ খান না। নির্দিষ্ট পূরোহিত না থাকলেও ওঝা ও স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণ পৌরোহিত্য করেন। অনেক বর্ধিষ্ণু গ্রামে শর্মা উপাধিকারী শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণগণও পৌরোহিত্য করেন। বলি হিসেবে মানতকারীগণ সামর্থ অনুযায়ী শূকর, পাঁঠা, পায়রা উৎসর্গ করেন। পূজার জায়গাটিতে মাটি দিয়ে লেপে পাঁচটি সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আরোগ্য লাভে যখন এই পূজা হয় তখন ঠাকুরের সামনে রোগীকে কাঠের পিঁড়িতে বাঁদিকে বসানো হয়। ধাতুর পাত্রে জল দিয়ে মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক সেই জল রোগীর গায়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়। দিনহাটা মহকুমার ত্রিমোহিনী গ্রামের মাসানের মহিলা পূজারী ও ওঝা ফুলেশ্বরী রায় সাক্ষাৎকারে এই পূজার এক মন্ত্র শোনান —

"এসো কালী বস চালে কথা কও কর্ণমূলে
কর্ণের কথা কর্ণে কও যত মিথা মনে খাবি
করম করম ধরম ধরম সাতালি পর্বত চালং
নরং লোকের নাক চালং, মরা বর্তা মাসান" [২৫]

এই লোকদেবতার পূজার শেষে কলাপাতা, নৈবেদ্য, শোলার মূর্তি একসঙ্গে বেঁধে জঙ্গলে বা নদীতে ফেলে দেওয়া হয়। এভাবে পূজা পালনের ফলে রোগীর দেহ থেকে সমস্ত উপসর্গ অন্তর্হিত হয়। পূজার পূর্বে পূজারী বা ওঝা নিজেও সতর্ক থাকেন যাতে মাসান তাকে আক্রমণ করতে না পারে। যে সব ক্ষেত্রে রোগীকে ঝাড়ফুকের প্রয়োজন হয় সে সব ক্ষেত্রে রোগীকে ঝাড়ার পূর্বে রোজা বা ওঝা দৈব শক্তি সম্পন্ন সর্ষের মাহাত্ম্য বর্ণনা করে মন্ত্র উচ্চারণ করেন। যেমন —

"বার চাষ দিলে গোসাই তের পাট মই
চাষের ভুই খান করিল খলধল
ক্যান্না দুরা বন ফ্যালেয়া বেচিয়া
গোঁসাই বলে নারদ শুন মোর কথা।
এক কাঠা সরিষা দে জমিনে ফেলেয়া"[২৬]

এই লোকদেবতার পূজার পূর্বে রোগীর রোগ নির্ণয়ের জন্য রোজা হাতে পাট কাঠি মেপে পরীক্ষা করেন। এভাবে ঝাড় ফুক বা স্বাভাবিক ভাবে মাসান ঠাকুরের পূজার মাধ্যমে রোগী আরোগ্য লাভ না করলে পরবর্তী পর্যায়ে পূজার বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে ঝাড় ফুকের যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'ভোমর ডাঙানো'। এই ক্ষেত্রে যিনি মূল ওঝা অর্থাৎ যিনি ঝাড়-ফুক করবেন তাকে বলা হয় ভোঙরিয়া। প্রধান ভূমিকা তিনিই গ্রহণ করেন। সঙ্গে থাকে ঢাকি এবং দেউরী। সেখানেও দশ খোল নৈবেদ্য সাজানো হয়। এভাবে দ্বিতীয় পর্যায়েও যদি রোগী আরোগ্য লাভ না করে সে ক্ষেত্রে মাটির ঘট, একটি কবুতর, রঙিন কাপড় ও প্রদীপ জ্বালিয়ে একটি ভেলা ভাসানো হয়।

মাসান এতদঞ্চলে কখনই গৃহদেবতা হিসেবে সম্মান পাননি। জেলার লোকসংস্কৃতিতে আবহমান কাল ধরে স্থানীয় লোকসমাজের উজ্জ্বল ও মহান লৌকিক সৃষ্টি হিসেবে সবার ভীতি ও উদ্বেগের পাশাপাশি শ্রদ্ধাও আকর্ষণ করে আসছেন এই লোকদেবতা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, "মাসান দেবতার দ্বি-বিধ রূপ স্ত্রী ও পুরুষ। জেলার লোকায়ত ধর্মে যখন স্ত্রীরূপে তাকে কালী জ্ঞানে পূজা করা হয় তখন তিনি সিংহ বাহিনী ও চতুর্ভুজা, পদতলে শিবের শয়ান মূর্তি। পুরুষ দেবতা রূপে তাকে শিব, শিবানুচর, কখনও বা অপদেবতা জ্ঞানে উপাসনা করা হয়। অমঙ্গল, মহামারী এবং পথদুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য এই দেবতার আরাধনা হয়ে থাকে।"[২৭]

মাঘপালা গ্রামে মাসান শূকর পৃষ্ঠে আসীন। তাঁকে চতুর্ভুজ শিবও বলা হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার কোচবিহার,

আসাম জাতীয় সড়কের পাশে তল্লিগুড়ি, মারুগঞ্জ এবং ফলিমারী, শালবাড়ী ও হরিরহাট গ্রামে পথের পাশে মাসান পাটে মানত পূজা উপলক্ষ্যে পাঁঠা ও পায়রা বলিদেন অনেকে। তবে প্রায় সর্বত্রই বৈশাখ মাসের প্রত্যেক শনি ও মঙ্গলবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামে প্রায় ৮ টি মাসান পাট রয়েছে। মাথাভাঙ্গা মহকুমার পাটছড়া, গোপাল পুর গ্রামে সন্ন্যাসী ঠাকুর, বানমারা ঠাকুর, ঢাংটিং ঠাকুর প্রভৃতির সঙ্গে মাসানও পূজিত হন।

বিজ্ঞানের দৌলতে আজ আমরা অনেক লৌকিক বিশ্বাস, সংস্কার ও ধর্মীয় ভাবনাকে কুসংস্কার বলে মনে করি কিন্তু এমন একদিন ছিল যেদিন আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রসার লাভ করেনি। সবাই এধরনের পূজা পার্বণ, ঝাড় ফুক ও ওঝা - কবিরাজকে শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন। ইন্দোমঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত আদিবাসী ও রাজবংশী সমাজে প্রাচীন এই কোপন স্বভাব লোকদেবতার পূজার প্রচার, লোকাচার ও আনুষ্ঠানিকতা আজ ক্রম হ্রাসমান।

কোচবিহার জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষায় যে উল্লেখযোগ্য প্রভাবশালী জাগ্রত মাসান লোকদেবতার সন্ধান পাই সেগুলি হল নিম্নরূপ —

গড়কাটা মাসান ঃ জেলার উল্লেখযোগ্য প্রাচীন ও প্রভাবশালী মাসান হল গড়কাটা মাসান। দিনহাটা মহকুমার গোঁসানীমারী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত আলোকঝারি গ্রামে পাকা রাস্তাব ধারে এই মাসান পাট অবস্থিত। দিনহাটা গোঁসানীমারী জাতীয় সড়কের উক্ত গ্রামের বাম পার্শ্বে টিনের চাল যুক্ত পাকা পশ্চিমমুখি মন্দিরে এই মাসান অধিষ্ঠিত। জেলার প্রাচীন জাগ্রত ও সর্বজন পূজিত এই গড়কাটা মাসান উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা। প্রাচীন কামতাপুরের কামতেশ্বর রাজার দুর্গের প্রাচীনতর বা গড় কাটা বা ভাঙ্গার সময় এই লোকদেবতার প্রতিষ্ঠা হয় বলে স্থানীয় লোকমনে এই দেবতা গড়কাটা মাসান নামে বেশী পরিচিত। শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের প্রাচীনতর এই মাসান গড়কাটা নামের চেয়েও 'আলোকঝারি মাসান' নামেই খ্যাত । প্রতিবছর ১৫ ই বৈশাখ থেকে ৩১ শে বৈশাখ পর্যন্ত মাসানের মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয় ১৫ দিন ব্যাপী পূজা ও মেলা। এ সময় মূল মন্দিরের সম্মুখে শত শত ভক্ত বাঁশের কঞ্চিতে লাল নিশান বেঁধে, ছোট ছোট মৃন্ময় মাসান ও শূকরের মূর্তি মানত করেন। মন্দির চত্বরে উন্মুক্ত ভাবে স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক আঁটিয়া কলা, ঘটিয়া দই (মাটির ঘটে পাতা কাঁচা দুধের দই) চিড়া দিয়ে তিন বা পাঁচ বা দশ খোল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা দেন। মন্দিরের বাইরের চাতালে মানত পূজায় অধিকারী ব্রাহ্মণ পৌরোহিত্য করলেও গড়কাটা মাসানের মূল পূজায় পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে শুধু মাত্র স্থানীয় সম্প্রদায়ই নয় দূর অঞ্চলের শহর ও গ্রামবাসীগণও বৈশাখমাসের উক্ত দিনে এখানে ছুটে আসেন মানত করে পূজা দিতে । বৈশাখ মাস পূজার প্রশস্ত সময় হলেও উক্ত মাসের শনি ও মঙ্গল বারেই মানত পূজা হয় বেশী। মেলার সময় ১৫ দিন ব্যাপী মন্দিরের সম্মুখে চলে পাঁঠা ও পায়রা বলি। অনেক মানতকারী আবার শূকর বলি দেন। এই মাসানের প্রাচীনত্ব ও নামের মাহাত্ম্যের সুবাদে গ্রামটি মাসান পাট নামেই সর্বাধিক পরিচিত।

প্রথম দিকে এই লোকদেবতার পূজার সমস্ত উপকরণই ছিল কাঁচা (কাঁচা দই, কাঁচা আঁটিয়া কলা, কাঁচা সাটি মাছ, চিড়া) তাই এই লোকদেবতাকে সবাই 'কাঁচা খাওয়া' দেবতা বলতেন। এই দেবতার পূজার সময় রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব তৈরী গোবরের ধূপকাঠি পুরোহিত প্রথমে জ্বালিয়ে দেন ঠাকুরের সামনে। এই ধূপকাঠি যতক্ষণ প্রজ্জ্বলিত থাকবে ততক্ষণ পূজা চলবে, এটাই প্রচলিত নিয়ম।

তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত বাঁশরাজা গ্রামের রাভা ও রাজবংশী সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত হন পোড়া মাসান। এই মাসানের মূল পূজা অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে। নৈবেদ্য হিসেবে থাকে কাঁচা দৈ, চিড়া, আঁটিয়া কলা এবং পোড়া সাটি মাছ। এই লোক দেবতা পোড়া মাছ খান বলে এরূপ নামকরণ।

এই জেলার অপর উল্লেখযোগ্য মাসান হল ভেড়া মাসান। মাসানের বাহন এখানে ভেড়া হওয়ায় এই নামকরণ। দিনহাটা মহকুমা সদর থেকে সাহেবগঞ্জ সড়ক হয়ে বামন হাটের দিকে দুই কিলোমিটার দূরত্বে উত্তর লাউচাপরা গ্রামের ভ্যাংরা পুলের পাশে পশ্চিমমুখী একটি টিনের চালা ঘরে এই ভেড়া মাসানের অধিষ্ঠান। প্রতি বছর মাঘমাসে এই দেবতার বাৎসরিক পূজা হয়।

মাথাভাঙ্গা মহকুমার ডাঙ্গবোকা গ্রামের দিগডারু নদীর বাম পার্শ্বে ময়না দলী রোডের কালভার্টের পাশে টসা মাসানের অবস্থান। মাসানের বাহন এখানে শূকর ও শাল মাছ। বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় রাসপূর্ণিমায়।

সিতাই ব্লকের চামটা গ্রামের ধূমদহপাড় অশোকাষ্ঠমী স্নান উপলক্ষ্যে পূজিত হন জলুয়া মাসান। তার বাহন এখানে শাল মাছ। জলে বসবাসকারী অপদেবতা জলকাওরী স্ত্রী জাতীয় অপদেবতা হলেও কোচবিহারে পুরুষ অপদেবতা জলুয়া মাসানের সঙ্গে এর সাদৃশ্য অনেক। যার উপর এই অপদেবতা ভর করবেন তাকে শেষ রাত্রে কিংবা মাঝ রাত্রে ঘুমের ঘোরে মাছ ধরার ছিপ, জাল, জাকই, বর্শি নিয়ে মাছ ধরতে যাওয়ায় প্ররোচিত করবেন।

কোচবিহার শহরের উত্তরপ্রান্তে খাগরাবাড়ী থেকে নিউকোচবিহার মুখি রাস্তার দক্ষিণপাশে ডোম সম্প্রদায়ের বাস। এই ডোম পাড়ায় অবস্থিত শূকর বাহন শূর মাসান।

দিনহাটা মহকুমার ত্রিমোহিনী গ্রামে খ্যাতা ওড়া মাসানের অধিষ্ঠান। এই মাসানের বিশেষত্ব হল এর পূজার জন্য গ্রামবাসীগণ সূচ ও সূতা মানত করেন। এই মাসান পূজার অপর বৈশিষ্ট্য এর পৌরোহিত্য করেন ফুলেশ্বরী রায় নামে এক মহিলা ওঝা।

মুন্ডহীন বক্ষে চোখ, দন্ডায়মান, হাতে গদা ও মৃত শিশু - বীভৎসরূপী ভয়ঙ্কর নিষ্কিন্দা বা মুড়িয়া মাসান নামেও পূজিত হন অনেক গ্রামে । তুফানগঞ্জ মহকুমার থেটার পাট গ্রামে, গোঁসানিমারী বাজারের পশ্চিম পাশে, নাটাবাড়ীর মাছুয়াটারী গ্রামে, বামন হাটে এই নিষ্কিন্দা মাসানের অধিষ্ঠান।

যখাযখি ঃ কোচবিহারের গ্রাম জীবনে এক উল্লেখযোগ্য লৌকিক দেবদেবী হলেন যখাযখি। শিশু আক্রমণকারী ও শিশু রোগের আরাধ্য এই দেবদেবীর পূজা প্রায় প্রত্যেক গ্রামবাসী রাজবংশী সমাজে প্রচলিত। এই প্রসঙ্গে বলা যায় উত্তরবঙ্গের অন্য কোন জেলায় শিশু রোগের প্রতিরোধে এই পূজার প্রচলন দেখা যায় না। যখাযখি নামের ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে মনে হয় এটির উৎপত্তি যক্ষ শব্দ থেকে। মাসানের নামে যে কুবেরের ধ্যান করা হয় সেই কুবেরেরই অপর নাম যক্ষ। এই লোকদেবতার শোলার তৈরী মূর্তিতে কালো রঙ দিয়ে তৈরী যখা - যখি স্বামী ও স্ত্রী রূপে পূজিত হন কিন্তু, মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হলে সেক্ষেত্রে অবশ্যই হাঁস বলি দিয়ে মানত করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ভাবে শুধু যখাও পূজিত হন। যখাকে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা মহকুমার অনেক গ্রামে মাসানের বিকল্পরূপ কল্পনায় পূজা করা হয়। অনেক গ্রামে যখা ও যখির মূর্তির পাশে শিবের মূর্তিও পূজিত হন।

এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় দিনহাটা মহকুমার হোকদহ গ্রামের চৈতার ছড়া নামক এক বিলের দক্ষিণ পার্শ্বে যখা ও যখি ঠাকুরের বহু পুরাতন পাট । এই পাটে মৃন্ময় মূর্তি অধিষ্ঠিত। একটি যখার অপরটি স্ত্রী যখির। প্রতি বছর চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজার অশোকাষ্টমীর দিন উক্ত ছড়ার দক্ষিণপাড়ে বাসন্তী বা অন্নপূর্ণার পাশাপাশি এই যখা - যখি মূর্তির পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বাৎসরিক এই পূজার সময় শোলার মূর্তির বদলে মাটির দ্বিভূজ ব্যাঘ্র বাহন, পদ্মাসনে উপবিষ্ট মাথায় বৃহৎ এক জটা ও বাহুতে ভয়ঙ্কর উদ্যত ফণার দুটি সাপ বাহুবেষ্টন করে আছে। বাম পাশে লাল রঙের শাড়ি পরিহিতা অলঙ্কার ভূষিতা নারী মূর্তি হলেন যখি। বাৎসরিক পূজায় মৃন্ময় মূর্তি তৈরী করলেও গ্রামবাসীগণ সারাবছর টিনের চালাঘরের ঐ মন্দিরে দুটো প্রস্তর খন্ডকেই যখা - যখি জ্ঞানে পূজা করেন। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে অনেক গ্রামে সাধারণত এই পূজা ফাল্গুন মাসে হয়। সেই ক্ষেত্রে এই পূজা হয় কোন ধাম বা পাটে। বর্তমানে অনেক রাজবংশী পরিবারে পুত্র ও কন্যার বিয়ের পূর্বে বিষহরির মত যখাযখির পূজাও করেন। আঁটিয়া কলা, দই, দুধ, চিনি, গাজা - এই পূজার প্রধান উপকরণ। মানত করে অনেকে পাঁঠা ও পায়রাও বলি দেন। অনেক গ্রামে পাঁঠা ও পায়রার মাংস ও ভাত রান্নাকরে প্রসাদ রূপে গ্রামবাসীদের খাওয়ানো হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে, দিনহাটা মহকুমার কিশমতদশ গ্রামে গাভী বাচ্চা প্রসব করলে গ্রামবাসীগণ প্রথম বারের দুধ দোহন করে দই তৈরী করে এই দেবতাকে উৎসর্গ করেন। শুধু শিশু রোগ নয় বয়স্ক মানুষ ও গৃহপালিত পশুর রোগ নিরাময়ের জন্যও অনেক গ্রামবাসী আঁটিয়া কলা ও দই দিয়ে এই দেবতার পূজা মানত করেন। জেলা সদরের মাঘপালা গ্রামে যখাযখির পূজায় দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভের আশায় বলি দেওয়া হয়।

কোচবিহার জেলার শিশু রক্ষক এই দেবতার সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বীরভূম ও বাঁকুড়া জেলার পঞ্চানন্দ ও ওলাবিবি নামক লোকদেবতার সাদৃশ্য দেখা যায়। বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও হুগলীর শিনি পুজার সঙ্গেও কোচবিহারের যখির কিছু মিল আছে। জেলার রাজবংশী রমনীগণ যাদের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে যায় বা সন্তান প্রসব হওয়ার পর অল্প দিনেই মারা যায় তারাও এই লোক দেবতার শরণাপন্ন হন। ভুত - প্রেত ও অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ওঝা বা রোজা নিয়ন্ত্রিত এই যখাযখি ও মাসান পূজার মাধ্যমে গ্রামবাসীগণ খুঁজে পান সান্ত্বনা।

স্থানীয় রাজবংশী সমাজে শিবযখা নামে যখার একটি স্বতন্ত্র রূপ পূজিত হয়। জেলার স্থানীয় সম্প্রদায় নবজাতক জন্মাবার পর বাড়ীর পূর্ব প্রান্তে ছনের দোচালা ঘর তৈরী করে অনেক সময় ওঝার মাধ্যমেও যখাযখির পূজা দেন। মানতপুষ্ট শিশু আক্রমণকারী এই যখাযখির পূজার পর ওঝা বা পূজারী মানতকারী পরিবারের নবজাতকের হাতে বেঁধে দেন যখা যখির নামে সূতা ও মাদুলী। এছাড়াও "ব্যাধিগ্রস্ত শিশুকে যখাযখি দেবতার মন্ডপের সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দেন এবং শিশুর নামে মানত করে 'হিতুমাটি (যখার মন্ত্রপুত মাটি) শিশুকে খাওয়ানো হয় এবং গায়ে মাখানো হয়।" [২৮] ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা জেলার পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামে তিন রকমের যখা ঠাকুরের সন্ধান পাই। যেমন শিবযখা, কালযখা ও বৈষ্ণব যখা।

ঢেল ঠাকুর / জুড়াবান্দা ঠাকুর ঃ

কোচবিহার জেলার লোকদেবতার বৈচিত্র্যে এক বিমূর্ত দেতার সন্ধান পাওয়া যায় যার নাম ঢেল ঠাকুর বা জুড়াবান্দা ঠাকুর। দিনহাটা মহকুমার গোঁসানীমারী রোডে শকুন্তলা স্টপেজে এ রকম এক ঢেলঠাকুরের পূজা হয়। এই দেবতার কোন মূর্তি নেই। লোকবিশ্বাস, কোথাও গাছের তলার একটি মাটির ঢিবি বা প্রস্তর খন্ড এই দেবতার প্রতীক। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস আমবাড়ি চৌপথীর বড়াই (কুল) গাছের নীচে এই দেবতার অধিষ্ঠান। পথ চলতি পথিকগণ যাতায়াতের সময় যে কোন বস্তু দিয়ে ঢিল দিলে এই দেবতা তুষ্ট হন। ঢিল এখানে এই দেবতার প্রতীক। এই দেবতার অপর বিশেষত্ব হল প্রথাগত পূজার উপকরণ, পুরোহিত বা মন্ত্রের কোন প্রয়োজন নেই। কোচবিহার সংলগ্ন আসাম সীমান্তবর্তী ধুবরী জেলার কালডোবা ও ছত্রসালের মধ্যবর্তী অঞ্চলে এক জাগ্রত ঢেলঠাকুরের অধিষ্ঠান আছে। পথপার্শ্বস্থ তেঁতুল, শেওড়া, পাকুড়, প্রভৃতি গাছেই এই দেবতার অধিষ্ঠান। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামে হাট - বাজারগামী পথিক ও গ্রাম বাসীগণ চলার পথে শুকনো ঘাস, কাঠ, পাথর ইত্যাদি দুটিবস্তু একসঙ্গে জোড়াবেঁধে গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেন অথবা ঢিল মারেন। এটাই এই লোকদেতার অর্ঘ্য নিবেদনের একমাত্র উপায়।

মাথাভাঙ্গা মহকুমার নবীনের দোলা গ্রামে আর একটি জুড়াবান্দা ঠাকুরের থান আছে। এখানেও পথচারী মানতকারী ব্যক্তিগণ পথে কুড়িয়ে পাওয়া যে কোন দুটি বস্তুকে জোড়াবেঁধে ঢিল মেরেই ঠাকুরকে ভক্তি নিবেদন করেন। দিনহাটা মহকুমার সিতাই থেকে গিরিধারী গ্রামে যাওয়ার পথে পাগলার হাট গ্রামে জিগা গাছের নীচের মাটির একটি ঢিবি এখানে ঢেল ঠাকুরের প্রতীক। এখানেও পথচারী ব্যক্তিগণ এক জোড়া ঢিল দিয়ে ঠাকুরের কাছে ভক্তি নিবেদন করেন।

চরকাটাকুয়া (শিশু আক্রমণকারী লৌকিক প্রেতাত্মা)ঃ

লৌকিক প্রেতাত্মা বা শিশু খাদক টাকরা -টাকরি নামে এক লোকদেবতার সন্ধান পাওয়া যায়। শিশু হত্যাকারী এই অপদেবতা অশরীরী প্রেতাত্মা বলে এক লোক বিশ্বাস কোচবিহারে প্রচলিত। একে ব্রহ্মদৈত্য রূপী পরোপকারী ভূত রূপেও মান্য করেন অনেকে। প্রেতযোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ ব্রহ্মদৈত্যে রূপান্তরিত হয়েছে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বাংলার লোকসাহিত্য গ্রন্থে (চতুর্থ খন্ড) ব্রহ্মদৈত্য নামে একটি লোককাহিনীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত ভূত - প্রেত, রাক্ষস, খোক্কস, দৈত্য দানব ভারতীয় পুরাণ কাহিনীতে নেই। আরব -পারস্য কাহিনীতে মানুষের উপর প্রভাব বিস্তারকারী দৈত্য দানবের কথা আছে। অতএব মানুষের জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ভূত প্রেতাদি আরব্য সংস্কৃতির প্রভাব জাত বলে মনে হয়।

কুমির দেব / গাবুরদেব ঃ

কোচবিহার জেলা সদরের খোলটা গ্রামে বিশেষ দুটি উল্লেখযোগ্য লোকদেবতা পূজিত হন। যা জেলার অন্য কোন গ্রামে দেখা যায় না। তারা হলেন কুমীর দেব ও গাবুর দেব। এই দুই দেবতার নাম ও বাহনে বৈপরীত্য দেখা যায়। জেলার

খোলটা গ্রামের দ্বিভুজ কুমীর দেবের বাহন কুমীর না হয়ে বাঘ। এই পুরুষ দেবতার গায়ের রঙ বেগুনী। পূজার প্রশস্থ সময় বৈশাখ মাস। গ্রামের অনেক রাজবংশী গৃহস্থবাড়ীর দক্ষিণ পূর্ব কোনে এই দেবতার থান বা পাট আছে। তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই মাটির বেদীর উপর লাল নিশানকেই কুমীর দেবতাজ্ঞানে পূজা করেন সবাই। ক্ষেত্র সমীক্ষায় ও সাক্ষাৎকারে খোলটা গ্রামের নরেন্দ্র নাথ রায় তার বাড়ীর পূর্ব প্রান্তের সুর কুমীর দেবতার থান দেখান। তার মতে মাটির ঢিবি এবং বাঁশের কঞ্চিতে লাগানো দুটি লাল নিশানই কুমীর দেবতা।

এই খোল্টা গ্রামেই অপর বিরল দৃষ্ট লোক দেবতা পূজিত হন চতুর্ভুজ মহিষ বাহন গাবুরদেব। গবুরদেবের ডান দিকের উপরের হাতে অসি, নীচের হাতে তীর, বাঁদিকের উপরের হাতে ঢাল, নীচের হাতে ধনুক। গ্রামবাসীগণ এই দেবতার থানে ডিম, পাঁঠা, পায়রা, মহিষ মানত করেন। ডাংধরা বা গোরক্ষ নাথের মত কোচবিহারের মহিষ রক্ষক দেবতা এই গবুরদেবকে অনেকে মৈষাল দেবতাও বলেন। নির্মল চন্দ্র চৌধুরী "চারুচন্দ্র সান্যাল স্মারক" গ্রন্থের ২২০ পৃষ্ঠায় তাঁর "উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী" গ্রন্থে কুমীর দেবতা সম্পর্কে উক্ত গ্রামে প্রচলিত একটি ছড়ার উল্লেখ করেছেন—

"কালজানি আন্ধার কিল কিল রাতি
নামেয়ে সুর কুমীর দেও নিশিভাগ রাতি
চাইর কোনে প্রিথিমী ধেইছে জানিয়া
সত্তম চরই ফল্যার বুকে ভর দিয়া।" [২৯]

বাঘ সুর ঃ

জেলার অপর এক উল্লেখযোগ্য লৌকিক পুরুষ দেবতা হলেন বাঘসুর। নামের মধ্যেই বোঝা যায় এই দেবতার বাহন হবে বাঘ। ব্যাঘ্র ভীতি থেকেই এই দেবতার উদ্ভব। বুড়ার ব্যাটা বা বাঘকে সন্তুষ্ট রেখে গবাদি পশুর প্রাণ রক্ষার্থেই এই দেবতা পূজিত হন। কিন্তু তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল ২নং অঞ্চলের অন্তর্গত ছাট গেন্দুগুড়ি গ্রামের বাঘসুর দেবতার বাহন বাঘের পরিবর্তে সিংহ। উক্ত গ্রামের প্রবীণ ভোঙরীয়া কালীচরণ দাস কালারায়ের পাটে বাঘসুর দেবতার একাধারে পূজারীও ভোঙরিয়া। স্থানীয় লোকবিশ্বাস বাঘসুর মাসানের বিকল্প লোকদেবতা। এই পুরুষ দেবতার গায়ের রঙ নীল, মাথায় চূড়া, একহাতে গদা, অন্যহাতে অভয়, বাহন সিংহ। কার্তিক মাসের রাস পূর্ণিমার বাৎসরিক পূজায় পৌরোহিত্য করেন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ অম্বুঠাকুর। নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করা হয় দই, চিড়া, মনুয়াকলা ওফলমূল। স্থানীয় গ্রামবাসীর কাছে বাঘসুর শুধু বাঘেরই দেবতা নন। তিনি যেমন ব্যাঘ্রীতি দূর করেন তেমনি জ্বর, প্যারালাইসিস, ব্যথা প্রভৃতি রোগেরও মুক্তিদাতা। রাজবংশী, রাভা, পূর্ববঙ্গীয় এবং মুসলিম সম্প্রদায় নির্বিশেষে বাঘসুর দেবতার থানে পাঁঠা, পায়রা মানত করেন। ব্যক্তিগত ও পারিবারিক রোগমুক্তির কামনায় সব মানতই নির্দেশিত হয় ভোঙরিয়ার নির্দেশে। এরূপ বাঘসুর পূজিত হয় তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা - নাটাবাড়ী রাস্তার ডানপাশে নাটাবাড়ী বাজারের আধমাইল আগে কালীধামে। এখানে দক্ষিণমুখী ছনের চালাঘরে ব্যাঘ্রপৃষ্ঠে আসীন বাঘসুর পূজিত হন প্রতিবছর রাসপূর্ণিমায়।

কালারায় ঃ

ছাট্গেন্দুগুড়ি গ্রামের অপর জাগ্রত পুরুষ লোকদেবতা কালারায়। যদিও কোচবিহারে পূজিত এই লোক দেবতা কালারায়ের সঙ্গে সোনারায়ের কোন সম্পর্ক নেই। পশ্চিমমুখী পাকা দালানে অধিষ্ঠিত এই দেবতার একহাতে পেন্টি অন্যহাতে অভয় মুদ্রা, গায়ের রঙ কালচে নীল। মাথায় গামছার পাগরী। কালারায় প্রকৃত পক্ষে এখানে গ্রামদেবতা। গ্রামরক্ষীর ভূমিকায় সকল অশুভ শক্তিকে দূর করে গ্রামবাসীকে রক্ষা করেন এই পুরুষ দেবতা। এখানেও পুরোহিত ও ভোঙরিয়া কালীচরণ। প্রতি শনি ও মঙ্গলবার ভোঙর ডাঙানো নামক লোকচিকিৎসার মাধ্যমে দূর দূরান্ত থেকে আসা অসহায় গ্রামবাসীর দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ে রোগী ঝাড়ান। ভোঙরিয়া কালীচরণ ভরগ্রস্থ হয়ে এক হাতে পেন্টি দিয়ে নিজের পিঠে আঘাত করেন ও বিড় বিড় করে ঝাড়ফুকের মাধ্যমে রোগী ঝাড়ান। স্থানীয় কবিয়াল হোসেন আলী মিঞা জানান, মানত হিসেবে এখানে ভক্তগণ পাঁঠা, পায়রা, ফলমূল নিবেদন করেন। তার মতে ভোঙরিয়া রোগী ঝাড়ার সময় কোন জাত দেখেন না।

ডাংধরা দেবতা ঃ

কোচবিহার জেলার উত্তর অংশে বিশেষ করে তুফানগঞ্জ, নাটাবাড়ী, বানেশ্বর অঞ্চলের ডাংধরা দেবতা ডাংধরা ঝান্টা, ডাঙ্গা, ডাংঘটি প্রভৃতি নামেও পূজিত। এসকল অঞ্চলে ডাংধরার সহচর হিসেবে কালামাসান, কালমাতৃ নামেও পরিচিত। ডাংধরা দেবতার বাহন হিসেবে সর্বত্রই বাঘকে কল্পনা করা হয়। মহিষের বাচ্চা হলে তার দুধ খাওয়ার পূর্বে এতদ্‌ঞ্চলে ব্যাঘ্র দেবতার নামে নিবেদন করে নানা উপাচারে পূজার প্রচলন আছে। এই ব্যাঘ্র দেবতার নাম ডাংধরা। এই দেবতার হাতে একটি দন্ড থাকে বলে দেবতার নাম হয়েছে ডাংধরা। এই দেবতার উদ্ভবের মূলে রয়েছে ব্যাঘ্রভীতি। বর্তমানে মহিষ বাথান না থাকলেও ব্যাঘ্রদেবতা ডাংধরা যথারীতি বিভিন্ন গ্রামে পূজিত হন।

কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামে ডাংধরা দেবতা কোন মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হন না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বাড়ীর তুলসী মঞ্চের পাশে শাস্ত্রীয় পুরোহিতের বদলে গৃহকর্তা কতৃক এই দেবতা পূজিত হন।

ডাংধরা দেবতা এক বিচিত্র লোকবিশ্বাসে দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ গ্রামে পূজিত হন বটপাকুর ও জিগাগাছের নীচে বাঁধানো চাতালে। একটি প্রস্তর খন্ডই ডাংধরা দেবতার বিমূর্ত প্রতীক। এখানে ডাংধরার পাশাপাশি পূজিত হন কালী, মহকাল, পাগলাপীর। হিন্দু - মুসলমান সকল সম্প্রদায়ের মানুষই গবাদি পশুর মঙ্গল কামনায় সমবেত ভাবে এই পূজা দেন। তুফানগঞ্জ মহকুমার শিকারপুর গ্রামে, মেখলিগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ী থানার রাজবংশী সম্প্রদায় গরুর বাচ্চা হওয়ার দশ বারো দিন পর দুধ সংগ্রহ করে সেই বাঁচাদুধে তৈরী দই, চিড়া, আঁটিয়াকলা, কোন কোন গ্রামে উক্ত দুধের ক্ষীরের নাড়ু তৈরী করে নৈবেদ্য দিয়ে বাড়ীর উঠোনে তুলসীমঞ্চের পাশে ডাংধরার কোপদৃষ্টি থেকে গৃহস্থের গরুর যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই উদ্দেশ্যে ডাংধরা দেবতাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করা হয়। এখানে ডাংধরা দেবতার রূপ কল্পনা করা হয় ঝাঁকড়াচুলে সর্বাঙ্গ কাথাদিয়ে মোড়া , অনেকটা ক্যাথা ওরা মাসানের মত। ডাংধরা দেবতা শ্মশানচারী শিব। জেলার পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণও গরুর বাচ্চা প্রসবের দশ থেকে বারো দিনের মধ্যে নতুন দুধের ক্ষীর (গোক্ষুরের নাড়ু) এই দেবতার নামে উৎসর্গ করেন। সেই ক্ষেত্রে অবশ্য তারা ডাংধরা না বলে গোরক্ষ নাথের নামেই তাদের নৈবেদ্য উৎসর্গ করেন।

মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রাণবাদী রাজবংশী সম্প্রদায়ের ডাংধরা নামক মুক্তাঙ্গন লোকদেবতার পূজা আদিম পশুপূজা ও জড়বস্তুর উপাসনাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানা অঞ্চলে বলরাম ধামের ভোঙরিয়া নরেন বর্মন দীর্ঘ দিন ধরে ডাংধরা দেবতার পূজা করেন। নিম্নলিখিত গুরুমন্ত্রদিয়ে তিনি ডাংধরা দেবতার পূজা করেন—

"ও গণেশায় নমঃ (২)
ধর্ম হল মহাদেব বলিয়া
পূজা কইরলোং শিবগুরু বলিয়া
ফুল রথে আসিল নামিয়া" [৩০]

ভোঙরিয়া নরেন বর্মনের মতেও এতদ্‌ঞ্চলে ডাংধরা দেবতা শিবের অনুষঙ্গী বা প্রতীক। অনেকে এই দেবতাকে বুড়া ঠাকুরও বলেন।

কালী ঠাকুরাণী ঃ

জেলার শুধু রাজবংশী সম্প্রদায়ই নয় সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেও কালীঠাকুরাণীর প্রভাব ব্যাপক ও গভীর। উত্তরবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারেও কালী ঠাকুরাণী পূজিত হন বহুনামে। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে শ্যামাকালী, কাচাকালী, ভদ্রকালী, শ্মশানকালী, প্রভৃতি নামে কালীর ধ্যান, উপাসনা ও আরাধনার প্রচলন আছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের কাছে কালী শুধু শক্তি সম্পন্না ভীষণা দেবী নন,তিনি মাসানের স্ত্রীরূপেও পূজিত। সন্ন্যাসী ও গেরাম ঠাকুরের মত কালীও এখানে এক অর্থে সর্বমঙ্গলকারিনী গেরাম ঠাকুর রূপে সম্মানিত। বেশীরভাগ গ্রামে গেরাম ঠাকুরের পাশাপাশি কালীও পূজিত হন।

উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজে প্রচলিত কালীর বিভিন্ন মূর্তিকে প্রচলিত আদলে শিবের উপর দন্ডায়মান দেখা যায় না। এবং অনেক ক্ষেত্রে কালীর জিহ্বাও মুখ থেকে বহির্গত নয়। এই মত ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল মহাশয় সমর্থন করেন। সিংহবাহনা ও ষড়ভুজা কালীও কালীর বৈচিত্র্যে এক নূতন সংযোজন।

" জেলার দিনহাটা মহকুমার খলিসা গোঁসানীমারী গ্রামের শূকর বাহনা মাসানকালী পূজিত হন।" [৩১] নিত্য পূজিত এই কালীর রূপ ও বৈচিত্র্য জেলার অন্যকোথাও দেখা যায় না। কালীই একমাত্র এতদ্‌ঞ্চলে সম্মানিতা স্ত্রীদেবতা, যার প্রভাব, মর্যাদা এবং দৈবী শক্তির প্রতি ভক্তি ভাব যা অন্যকোন দেবতার মধ্যে দেখা যায় না।

মূর্তিহীন কালী ঃ

মূর্তিহীন কালী পূজার নিদর্শন আছে এই জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে। উক্তব্লকের কাশিয়াবাড়ী রাজার সংলগ্ন পশ্চিমপার্শ্বে শতাধিক বছরের প্রাচীন এক মন্দিরে পূজিত হন এই দেবী। এই কালী মন্দিরের উৎপত্তি সম্পর্কে স্থানীয় মানুষের মধ্যে একাধিক বিশ্বাস প্রচলিত আছে। সারাবছর মূর্তিহীন ভাবে পূজিত হলেও দক্ষিণ মুখী ভগ্নপ্রায় ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন এই মন্দিরে শুধু দীপান্বিতায় এই কালী সাড়ম্বরে মৃন্ময় মূর্তিতে পূজিত হন। বর্তমান পুরোহিত স্থানীয় রাজবংশী সমাজের তারিনীকান্ত রায় স্থানীয় কৃষ্টি অনুযায়ী পূজা করেন। এই পূজার বংশানুক্রমিক ঢাকি অমূল্য হাজরা। মানত হিসেবে পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়। রাজরক্ষী সূর্য প্রসাদ নিঃসন্তান থেকে সন্তান লাভের পর বর্তমান মন্দির নির্মাণকরেন। বাৎসরিক পূজা মূর্তি দিয়ে হলেও পূজার রাতে সূর্য ওঠার আগেই দেবীর ভাসান হয়। এই প্রথা এখনও সচল। এছাড়াও সারা বছর শনি ও মঙ্গলবার মূর্তিহীন বেদীতে দক্ষিণাকালী কল্পনায় পূজা করেন গ্রাম বাসীগণ। বর্তমান পুরোহিত তারিনীকান্ত রায় ভর উঠিয়ে ভোঙর ডাঙান এবং রোগ নিরাময়ের জন্য ঝাড়ফুক করেন। রাজবংশী সম্প্রদায়ের কালী পূজার মন্ত্রে যে মূর্তি কল্পনার আভাস নেই, হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামের কালী ঠাকুরাণী তার দৃষ্টান্ত।

মাধাই খালের কালী ঃ

দিনহাটা মহকুমার বামন হাট অঞ্চলের পাথরশোন গ্রামে সকল সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত জেলার উল্লেখযোগ্য কালী ঠাকুরাণী এই মাধাই খালের কালী। প্রতিবছর চৈত্রমাসের অষ্টমী তিথির পরের শনি বা মঙ্গলবার পূজা শুরু হয় এবং পরের শনি বা মঙ্গলবার মহিষবলির মাধ্যমে এই পূজার সমাপ্তি ঘটে। এটি প্রকৃতপক্ষে জেলার অন্যতম মাইগ্রেটেড বা স্থানান্তরিত কালী ঠাকুরাণী। " বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুর জেলার কুঁড়িগ্রাম মহকুমার মাধাই খাল গ্রামের খর্গনাথ বর্মন(পূজারী) এই ভদ্র কালী এই গ্রামে প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি ভছর চৈত্র মাসের বাসন্তী পূজার পর শনি অথবা মঙ্গলবার পূজা শুরু হয় এবং চলে ১২দিন ব্যাপী। বাংলা ১৩৫৯ সন থেকে এই পূজা শুরু হয়। " [৩২]

এই পূজার বৈশিষ্ট্য অষ্টমদিনে পাঁঠা, পায়রা ও মহিষ, মানকচু, চালকুমড়ো বলি। বলিকৃত শোণিত মাটির মালসায় কালীকে নিবেদন করা হয়। দক্ষিণমুখী টিনের পাকা মন্দিরে এই কালী ঠাকুরাণী অধিষ্ঠাতা। উচ্চতা ১২ হাত / এই ভদ্রকালীর পূজা উপলক্ষ্যে২০০ একর জমির উপর জেলার বৃহত্তম ও সর্বাধিক জনসমাগমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় লোক বিশ্বাস মতে বিভিন্ন রোগভোগের ভয়ে যেমন মানত হয়, তেমনি জেলার মানুষের বদ্ধমূলধারণা এই কালীর পাটের তুলসী পাতা ও মাটি খেলে যে কোন দুরারোগ্য ব্যাধি সারে। দিনহাটা মহকুমার বামন হাট অঞ্চলের পাথরশোন গ্রামের এই ভদ্রকালী ঠকুরাণীকেই কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায় কতৃক 'সাতবইনীর অন্যতম রূপে কল্পনা করা হয়। বর্তমান পূজারী আদ্যনাথ ভাগবতী, ভোঙরিয়া দেবেন্দ্র নাথ বর্মন এবং বলিকার ভদ্র নাথ বর্মন । বামন হাটের এই ভদ্রকালী সম্পর্কেএকটি লোকশ্রুতি রয়েছে। এই লোকবিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে এখনও এই মেলায় ভদ্রকালীকে প্রণাম করে হাজার হাজার বিবাহিতা রমণীগণ শাঁখা পরেন।

এছাড়াও দিনহাটা মহকুমার সাহেবগঞ্জ অঞ্চলে প্রতি বছর ভাদ্রমাসের অমাবস্যায় পূজিত হন ছিন্নমস্তাকালী। এই মহকুমার অপর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কালী পূজার পীঠস্থান বাউসমারী গ্রাম। উক্ত গ্রামের গ্রামবাসীগণ কালীকে 'বাউসমারী কালী' বলে ভক্তি করেন। এই গ্রামের পুরনো কালীবাড়ীর সিদ্ধেশ্বরী মিলনমন্দির প্রাঙ্গণে পূজিত হন এই কালী ঠাকুরাণী।

মনস্কামনা কালী ঃ

প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় তুফানগঞ্জ মহকুমার পলিকা গ্রামের পোয়াতী বিলের পাশে দক্ষিণমুখী পাকা মন্দিরে পূজিত হন মনস্কামনা কালী। বাংলা ১৩৬০ সনের মাঘী পূর্ণিমা থেকেই সাড়ম্বরে এই পূজা উপলক্ষ্যে একদিনের একটি মেলাও বসে। অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল অঞ্চলের লৌকিক বিশ্বাস এবং এতদ্‌ঞ্চলের রাজবংশী সম্প্রদায়ের লৌকিক দেব দেবীর সঙ্গে একাকার হয়ে যান এই কালীঠাকুরাণী। বিশেষ করে পূর্ববঙ্গীয় টাঙ্গাইলের নাথ যোগী সম্প্রদায় এবং স্থানীয় রাজবংশী সমাজের মিলিত প্রয়াসেই এই পোয়াতি বিলের মনস্কামনা কালীঠাকুরাণীর পূজার সূচনা হয়। পলিকাগ্রামের প্রবীণ শ্রী অক্ষয় কুমার নাথ মেলাপ্রাঙ্গণে সাক্ষাৎকারে এক কাহিনী শোনান। "স্থানীয় লোকশ্রুতি পলিকা গ্রামের মাঝখানে বিলের ধারে ছিল রাজবংশী অধর দাসের বাড়ি। তার অশীতিপর বৃদ্ধা মা পলিকার বিলের বটগাছের নীচে বুড়া ঠাকুরের পূজা দিতেন। এই বুড়িমার কাছথেকেই মাসান ও বুড়া ঠাকুর সম্বন্ধে অলৌকিক কাহিনী শুনেছিলেন স্থানীয় নাথ সম্প্রদায়ের প্রবীণ ব্যক্তিগণ। বুড়িমার স্বপ্নাদেশের কথা মাথায় রেখে আজ থেকে ৪৬ বছর পূর্বে শোলা ও ছনের তৈরী মাটির মন্দিরে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে দেবীর আরাধনা শুরু হয় এবং এই গ্রামে মনস্কামনা কালী পূজা শুরু হয় "

কোন এক অদৃশ্য শক্তির বলে উক্ত পলিকা বিল নূতন করে গভীরতা প্রাপ্ত হয়ে জলে ভরে ওঠে এবং মায়ের কাছ থেকে নির্দেশ আসে এখানে পূজা দিতে হলে এই বিলেই স্নান করতে হবে। তখন এর নাম হয় কালীগঙ্গা। পলিকার মায়ের কৃপায় মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, এই বিশ্বাসের ফলেই প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ ছুটে আসে এই থানে পূজা দিতে। নারীর বন্ধ্যাত্ব ঘোচে, দৃষ্টিহীন পায় আলোর সন্ধান। বহু দুরারোগ্য ব্যাধি গ্রস্ত মানুষ নিরাময় লাভ করেন, পথভ্রষ্ট পথিক পায় সঠিক পথের সন্ধান। তাই তুফানগঞ্জ মহকুমার জাগ্রত মনস্কামনা কালী এই পলিকা গ্রামের কালী।

মাসান কালী ঃ

জেলা সদরের অন্তর্গত দেওয়ানহাট ব্লকের ধুমপুর বালাসী গ্রামে একটি বট গাছের নীচে এই কালীর অধিষ্ঠান। মূর্তিহীন ভাবে কালীস্বরূপা মাসান দেবতার প্রতীক হিসেবে পূজিত হয় একটি ঘট। প্রতি মঙ্গবার এখানে পূজা হয়। পূজার মূল উপকরণ পাঁচখোল দই, চিড়া ও আঁটিয়াকলা। পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলের মানুষ একত্রিত হয়ে পূজা দেন। এই মনস্কামনা কালীর থানে ভোঙরিয়ার নির্দেশে পাঁঠা, পায়রা, হাঁসের ডিম ও ফলমূল মানত হিসেবে উৎসর্গ করা হয়।

সিংহ বাহনা কালী ঃ

জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল ২ নং অঞ্চলের অন্তর্গত ছাট্ গেন্দুগুড়ি গ্রামের কালারায়ের ধামে পূজিত হন সিংহবাহনা রণকালী। বাৎসরিক পূজা প্রতিবছর রাস পূর্ণিমায় শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ কতৃক অনুষ্ঠিত হলেও নিত্যপূজায় ভোঙরিয়া কালীচরণ বর্মন পৌরোহিত্য করেন।

এই মহকুমারই বারোকোদালী ২নং অঞ্চলের ভারেয়া গ্রামে পূজিত হন সিংহ বাহনা ষড়ভূজা কালী। দেবীর গাত্রবর্ণ নীল, সঙ্গে ডাকিনী যোগিনী। বাৎসরিক পূজা অনুষ্ঠিত হয় প্রতি বছর পৌষ মাসের শনি অথবা মঙ্গলবারের যে কোন এক দিন। বাংলা দেশের টাঙ্গাইল অঞ্চলের দেওপুরাগ্রামের মদনপুর থেকে আগত স্থানীয় পূর্ববঙ্গীয়গণ প্রতিষ্ঠা করেন এই কালী পূজার। পাঁঠা ও পায়রা বলির জন্য এখানে মানত করা হয়।

মনসা / বিষহরি / পদ্মা / যাইটল বিষহরি ঃ

এতদঞ্চলে সর্পভীতি থেকে প্রচলিত যে স্ত্রী দেবতার পূজার প্রচলন তিনি বিষহরি বা মনসা। সর্পের দেবী মনসাই কোচবিহারের লৌকিক জীবনে বিষহরি নামে পূজিতা। রাজবংশী সমাজে দুই রকম মনসা বা বিষহরি পূজার প্রচলন আছে। সর্পরূপী মনসা নামক প্রাণী পূজা সম্পূর্ণই অনার্য ধর্মীয় ভাবনার ফসল। এতদ্‌ঞ্চলে মনসা বা বিষহরি যেমন সর্পাঘাত থেকে রক্ষাকারী দেবতা তেমনি প্রজনন দেবতাও বটে। দ্রাবিড় মূল 'মঞ্চ' শব্দ থেকে মনসাদেবী নামের উৎপত্তি। ভারতবর্ষের দক্ষিণে কোন কোন রাজ্যে তাই সন্তান কামনায় মনসা দেবীর পূজা হয়। কোচবিহারের লোকায়ত বিশ্বাস ভাদ্রমাসের সংক্রান্তি এবং নাগপঞ্চমী তিথিতে সাপের বিষ বৃদ্ধি পায়। স্থানীয় রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায় কোন মৃন্ময় মূর্তির পূজা করেন না। শোলার তৈরী মনসার মূর্তি অঙ্কিত মঞ্জুষাই সর্পদেবী বিষহরির মূর্তি। কিন্তু কালের বিবর্তনে পূর্ববঙ্গীয় ধর্মীয় সংস্কৃতির মিশ্রনে

চতুর্ভুজা, সর্পধৃতা, পদ্মাসনা, হংসারূঢ়া, মৃন্ময়ী মূর্তিতে অনেকে পূজা করেন। কোচবিহারে রাজবংশী সমাজের বিবাহ পরবর্ত্তী বা পূর্ববর্তী সময়ে মনসা বা বিষহরি পূজা অবশ্য কর্তব্য। তখন মনসা দেবীর পূজার নাম হয় মারাই পূজা। কোচবিহারের অন্যান্য লৌকিক দেবদেবীর মত মনসা বা বিষহরির কোন স্থায়ী পাট, থান বা মন্দির নেই, যেখানে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই পূজা করেন। শাস্ত্রীয় সর্পদেবী বা মনসার প্রভাবপুষ্ট হয়ে গ্রামীণ লোকায়ত জীবনে শোলার মঞ্জুষা মূর্তি পূজা কমে যাচ্ছে। অনেকক্ষেত্রেই মনসা পূজার আবশ্যিক উপকরণ হিসেবে দেখা যায় সিজ বৃক্ষের ডাল। লৌকিক বিশ্বাস এই বৃক্ষের ডাল বিষহরণ করে। এটি আদিম টোটেম বিশ্বাসেরই ফল।

কোচবিহারে সর্পঘাতের আধিক্য না থাকাসত্ত্বেও স্থানীয় রাজবংশী সমাজে সর্পদেবী বিষহরি পূজার ব্যাপক প্রচলন সম্পর্কে বিস্ময় প্রকাশ করে W.W. Hunter সাহেব বলেছেন — " The snake goddess, Bis Hara (Poison destroyer) is also very largely worshipped by the people. This is the more strange, as there are very few poisonous snakes in kuch Behar" [৩৩]

আসামের মনসা পূজায় দেওধানি পূজা হয়। কামরূপ কামাখ্যার পুরুষ দেওধাদের মত এই দেওধানি মেয়েরাও দশাগ্রস্ত অবস্থায় নাকি 'ভর' পড়েন এবং ভবিষ্যৎ বাণী করতে পারেন।

"বাংলা তথা কোচবিহারের সর্পদেবী হংস বাহনা হলেও আসামের কোন কোন অঞ্চলে হস্তিবাহনা মনসাও পূজিত হন। কোচবিহারের মত আসামেও একে মারাই নামে পূজা করা হয়। শিলং - এর খালিয়া সম্প্রদায় এক সময় উথলেন নামক লোকদেবতাকে পূজা করে নরবলি দিতেন। অনেক ক্ষেত্রে মনসা বা শীতলা দেবীকে পূজা করা হয়। যেখানে তিনি সর্পাঘাতের চেয়েও মহামারী বা বসন্ত রোগের প্রতিরোধকারিনী।" [৩৪]

মনসা সাপের দেবী। সাপের উপদ্রব থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য শুধুমাত্র হিন্দুরাই নয়, অন্যান্য সম্প্রদায়ও পূজা করে থাকেন। কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বালাভূত গ্রামের মনসা বা বিষহরি পূজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়। বালাভূত মোড়ে স্থানীয় দিলীপ রায়ের বাড়িতে এই পূজা অনুষ্ঠিত হলেও হিন্দু - মুসলিম সকলের সহযোগিতায় ও আন্তরিকতায়, ওঝা রসতুল্লা মিঞার পৃষ্ঠপোষকতায় এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার দিন রসতুল্লা মিঞা তার সাপে কাটা রোগী ঝাড়ার চামর, লাঠি, ডুগডুগি ও অন্যান্য উপকরণ মনসার সামনে রাখেন। কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজের অন্যান্য অনেক পূজা পার্বণের মত এখানেও একজোড়া হাঁসের ডিম দেওয়া হয়। পূজার দিন শুধু বালাভূত নয়, অন্যান্য অঞ্চলের ওঝারাও বিশেষ করে রসতুল্লা ওঝার শিষ্যরা সবাই উপস্থিত থাকেন। এই পূজা উপলক্ষ্যে স্থানীয় জনশ্রুতি হল (এমনকি রসতুল্লা ওঝা নিজের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতায় বলেন) পূজার দিন মন্ত্রপাঠের সময় জীবন্ত সাপ চলে আসে মূর্তির পাশে।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সমাজে মূলত দুই রকমের বিষহরি পূজার প্রচলন দেখতে পাওয়া যায়। প্রথম হল পারিবারিক এবং দ্বিতীয় রূপ হল মারাই পূজা বা গিদালী বিষহরি পূজা। এই পূজার মূল উদ্দেশ্য নবদম্পত্তির জীবনের নিরাপত্তা, সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা। বিয়ের পূর্ব থেকেই অনেক পরিবারে এই পূজা শুরু হয়। বিয়ের আনুষ্ঠানিক লোকাচারে দেখা যায় মারাই দেবীকে প্রণাম করে বর কন্যার বাড়িতে যাত্রা করেন; ফিরে এসে বরকন্যা দুজনে পুনরায় বিষহরি দেবীকে ফুলজল দিলে রাতে গানবাজনার মাধ্যমে পূজার লোকাচার শেষ হয়।

"রাজবংশী গৃহস্থের বাড়িতে তুলসী তলায় তুলসীগাছের পার্শ্বে দুইটি ছোট ছোট ঢিবি তৈরী করা হয়। এই ঢিবির একটি বিষহরি। মাটির ঢিবি বলে একে অনেকে মাটিয়া বিষহরি বলেন" [৩৫] কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমায় 'মাটিয়া বিষহরি' পূজার প্রচলন বেশী।

জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে বিষহরির মাটি ও শোলার তৈরী মূর্তি পূজার প্রচলনই বেশী। আবার সন্তান কামনায় সাইটল বিষহরি পূজাও করেন অনেকে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস সাইটল বিষহরির কৃপাতেই বিবাহিতা রমনীগণ সন্তান ধারণ করেন।

জেলার মাঘপালা গ্রাম, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী আসামের ধুবরী ও গোয়ালপাড়া জেলার রাজবংশী সমাজে মারাই পূজার চারটি রূপ আছে, যাকে বলা হয় ছটাকী, পোয়াকি, আধসেরী ও সেরকী। এই পূজার সংক্ষিপ্ত আয়োজনকে বলা হয় ছটাকী। আর পোয়াকী বলতে বোঝায় যে সবক্ষেত্রে মূর্তিদিয়ে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সেরকী বা আধসেরী অনুষ্ঠানে মূর্তির সঙ্গে কার্তিক, গণেশ, লক্ষ্মী, সরস্বতীও থাকেন। অনেকক্ষেত্রে নেতা আর গোদাগোদানীর মূর্তিও থাকে। তবে সকল ক্ষেত্রেই বিষহরির মাথার উপর অবস্থান করেন স্বয়ং মহাদেব। কোচবিহার জেলার মারাই পূজার আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল বিষহরি পূজায় বিষহরি দেবীর ডানদিকে থাকবে শোলার তৈরী কাণি বিষহরি, বাঁদিকে থাকবে গণেশের ঘট। এই ক্ষেত্রে পূজার উপকরণ থাকে চুয়া - চন্দন, কাশ, ফুল, দূর্বা, তুলসীপাতা, তিল, কসাল (হরিতকি), চিরুনী (কাকই) সিঁদুর কৌটা, গন্ধতেল, একটি গামছা ও এককাদি কলা।

গিদালী বিষহরি পূজায় গিদালীগণ দুই রকম গীত পরিবেশন করেন - জাগানী ও ভাসানী গীত।

মনসা বা বিষহরির অলৌকিক মাহাত্ম্য নিয়ে কোচবিহারের লোক জীবনে একটি জনপ্রিয় লোক শ্রুতি প্রচলিত আছে। এই লোকশ্রুতিকে কেন্দ্র করেই এতদঞ্চলে মনসার নাম হয়েছে 'হাড়হাড্ডি মনসা'। কোচবিহারের মদনমোহন বাড়িতে প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এই হাড়হাড্ডি মনসার পূজা আজও অনুষ্ঠিত হয়।

এতদঞ্চলের বিষহরি পূজার বৈশিষ্ট্য হল এই পূজাকে উপলক্ষ্য করেই লোকসাহিত্য, লোকবিশ্বাস ও লোকসঙ্গীতের সবকটি শাখাই সমৃদ্ধ হয়েছে।

থানসিড়ি ঃ

জেলার রাভা উপজাতি সমাজে বিয়ের আগের দিন গৃহদেবী থানসিড়ি পূজার আয়োজন করা হয়। থান সিড়ি রাভা উপজাতি সমাজের গৃহদেবী। থানসিড়ি শব্দটির অর্থে বোঝায় বসতবাড়ি বা গৃহস্থ বাড়ির সৌন্দর্য। অর্থাৎ গৃহস্থ বাড়ির মঙ্গল কামনা থেকেই এই দেবতার নামের উৎপত্তি হয়েছে বলে মনে করা হয়। কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে তুলসী মঞ্চে অধিষ্ঠিত বাস্তু দেবতার মতই জেলার কৃষিজীবী রাভাগণ এই স্ত্রীদেবতার পূজা করেন। পূর্বদিকের বড়ঘরের দক্ষিণ - পূর্ব কোণে অথবা উত্তর দিকের বড় ঘরের উত্তর - পূর্ব কোণে দুই হাত উচ্চতা বিশিষ্ট একটি বংশ দন্ড মাটিতে পুতে সিঁদুর ও সরষে তেল লেপন করে স্থানীয় রাজবংশীগণ এই লৌকিক গৃহদেবতার পূজা করলেও রাভা সমাজের থানসিড়ি দেবতার রূপ সম্পূর্ণ ভিন্ন। থানসিরি কোচবিহার জেলার রাজবংশীদের ধারনায় রন্ধনের দেবী এবং এই লৌকিক দেবীর পূজার নির্দিষ্ট কোন দিন নেই। স্থানীয় রাজবংশীদের মত কৃষিজীবী রাভাগণ পুত্র বা কন্যা সন্তানের বিবাহের পর থানসিরির সঙ্গে অনেক সময় শোলার মূর্তিতে কানিবিষহরির পূজাও করেন। থানসিরি রাভা সম্প্রদায়ের গৃহদেবী এবং কালীর প্রতিরূপ। এই দেবীর মূর্তি বলতে বোঝায় বাড়ীর উত্তর বা পূর্ব দিকের বড়ঘরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে ছোট্ট একটি বাঁশের মাচার উপর দাম না করে অর্থাৎ একদামে কেনা একহাঁড়ি চাল, তার উপর দুটি হাঁস বা মুরগীর ডিম বসিয়ে দেওয়া হয়। ডিম দুটির গায়ে দেওয়া হয় সিঁদুরের ফোঁটা। চকত বা হাতে তৈরী মদ এই পূজার প্রধান প্রসাদী উপকরণ। তুফানগঞ্জ মহকুমার ছাটরামপুর গ্রামের নৈচান রাভা তার পুত্র স্বপন রাভার বিয়ের পূর্বে থানসিরি পূজা করেন ২৭ শে বৈশাখ ১৪০৫ সন। কোচবিহারে বসবাসকারী কৃষিজীবী রাভাগণ অপর এক লৌকিক দেবতার পূজা করেন, যার নাম 'নাখোব ঠাকুর'। গ্রামের কোন নির্জন প্রান্তে এই লোকদেবতার থান প্রতিষ্ঠা করেন তারা। নববর্ষ বা 'নভাতখোয়ার' দিন এই দেবতাকে পূজা দেওয়া তাদের অবশ্য কর্তব্য। মূর্তিহীন একটি প্রস্তর খন্ড অর্থাৎ বুড়া ঠাকুর বা মাসানের অনুরূপ এই দেবতার পূজায় রাভাগণ ফলমূলের সঙ্গে নিজস্ব তৈরী মদ অবশ্যই নৈবেদ্য হিসেবে দেন। জেলার কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায় বাড়ীর বলরাম বা তুলসী মঞ্চের পাশে অর্ধেক প্রোথিত কোন প্রস্তর খন্ডকে বৈদ্যনাথ ঠাকুর জ্ঞানে পূজা করেন। গৃহদেবতা বৈদ্যনাথ রাভা সম্প্রদায়ের কাছে শিবের প্রতিরূপ।

বারভাই বাইশ্যাল ঃ

বর্তমান বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার পোড়াবাড়ী গ্রামের স্থানান্তরিত লোকদেবতা এই বারভাই বাইশ্যাল। এই দেবতার পূজায় কোন মৃন্ময় মূর্তি নেই। বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার একমাত্র তুফানগঞ্জ মহকুমার ভানুকুমারী অঞ্চলের থ্যাটার পাট গ্রামে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পুরোহিত কৈবর্ত্য দাস সম্প্রদায়েস্বর্গত

কবিরাজ সয়ম্বর দাসের পুত্র দীনেশ চন্দ্র দাস। বারভাই বাইশ্যাল লোকদেবতার মৃন্ময় মূর্তি না থাকলেও পুরোহিত দীনেশ চন্দ্র দাস নিজের হাতে পূজার মন্দিরের সম্মুখস্থ উন্মুক্ত স্থানে সিঁদুর দিয়ে যে তেরজন দেবতার মূর্তি চিত্রিত করেন, তাঁরাই বারভাই বাইশ্যাল নামে পূজিত হন। স্থানীয় কৈবর্ত্য, ঝালমালো, দাস- সম্প্রদায় এই তের জন লোকদেবতাকে জাগ্রত মাসানের মত ভক্তি শ্রদ্ধা করেন। তেরজন লোকদেবতা হল —

" ১। জলকুমার ২। পুষ্পকুমার ৩। কৃষ্ণকুমার ৪। রূপকুমার ৫। মধুভঙ্গিরা ৬। হরিপাতাল
৭। রূপমালী ৮। গভূরদলন ৯। ডোকরানাং ১০। নিশাচরা ১১। সুচিমুখী ১২। মহামালী
১৩। জনযক্ষিনী" ৩৬

'জনযক্ষিনী' এই বারোজন দেবতার একমাত্র বোন। এই তের জন দেবতার উদ্দেশ্যে তেরটি খোলে ফলমূল নৈবেদ্য দিয়ে পূজার অর্ঘ্য সাজানো হয়। কোন শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ এই পূজা করেন না। বর্তমান পূজারী দীনেচন্দ্র দাস।

শীতলা / বুড়িমা ঃ

জেলার রাজবংশী সমাজে বসন্ত রোগের দেবী হিসেবে পূজিত হন শীতলা, কোথাও বুড়িমা বা মাঠাকুরুণ নামেও পূজিত হন। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও সবার আজন্ম বিশ্বাস, এই শীতলা বা বুড়িমাই যেমন বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটায় তেমনি এই রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতাও রাখেন। লোকায়ত বিশ্বাস মতে জেলার সকল গ্রামাঞ্চলে সরাসরি এই রোগের নাম উচ্চারণ না করে বলা হয় 'মায়ের দয়া' হয়েছে। এই রোগের নাম উচ্চারণ করলে শীতলা বা বুড়িমার কোপ সরাসরি পড়তে পারে। এমনকি শিশুদের গায়ে হাম হলেও বলা হয় 'মাসি - পিসি' হয়েছে। রোগ প্রতিরোধকারিণী এই লৌকিকদেবীর পূজাকে কেন্দ্র করে বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত বিশেষ পূজা পদ্ধতি গড়ে উঠলেও জেলার একাধিক গ্রামে যেমন মাঘপালা গ্রামে বুড়িমা, হলদিবাড়ী থানার পয়ামারী গ্রামে বুড়িরপাট, তুফানগঞ্জ মহকুমার ছটরামপুর গ্রামে মা ঠাকুরাণী নামে পূজিত হন। এই পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সর্বত্রই পূজা অনুষ্ঠিত হয় গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এবং এজন্য মাগন সংগ্রহ করা হয়।

তুফানগঞ্জ মহকুমার ছটরামপুর গ্রামের কালারায়ের ধামে পাকা দালানে পূজিত হন লৌকিক দেবী মাঠাকুরুণ। মা টাকুরুণ এখানে শীতলার লৌকিক রূপে ওলাওঠা, জলবসন্ত, ম্যালেরিয়া প্রভৃতি রোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রোগ নিরাময়ের জন্য গ্রামবাসীগণ ভোঙরিয়া কালীচরণের নির্দেশে মানত করে পূজা দেন। বাৎসরিক পূজার সময় হল কার্তিক - পূর্ণিমা। স্ত্রীদেবতা মা ঠাকুরুণ অশ্বপৃষ্ঠে আসীনা; তাঁর বাম হাতে মঙ্গলঘট ও আয়না, ডান হাতে অভয়। মা ঠাকুরুণের গায়ের রঙ হলুদ।

এই মহকুমারই ২ নং ব্লকের অন্তর্গত ভানুকুমারী অঞ্চলের থ্যাটারপাট গ্রামের বুড়িমা পূজিত হন প্রতি বৈশাখ মাসের দ্বিতীয় শনিবার। বুড়িমাকে গ্রামবাসীগণ নবদুর্গা ও শীতলাজ্ঞানে পূজা ও ভক্তি করেন। স্থানীয় লোকশ্রুতি হলদি মেখে বুড়িমার আবির্ভাব হয়েছিল। সেজন্যই বুড়িমার গায়ের রঙ হলুদ। লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিহিতা এই দেবী ত্রিনয়নী। অবিভক্ত বাংলার টাঙ্গাইল মহকুমার পোড়া বাড়ির স্থানান্তরিত কৈবর্ত্য সমাজ এই পূজার প্রবর্তন করেন। শীতলার বিকল্প বুড়িমার পূজার মানত স্বরূপ এককুলা ধান, একটি গামছা, কাপড়, পাঁঠা ও পায়রা অনেকে উৎসর্গ করেন। জেলার হলদিবাড়ী থানার অন্তর্গত পয়ামারী গ্রামে ক্ষেত্রসমীক্ষায় শ্রীদামদাস নামে এক ভ্রাম্যমান শীতলার মাগন সংগ্রহকারী ও পূজারীর সন্ধান পাওয়া যায়।

জয়নাথ মুন্সীর রাজোপাখ্যান মতে কোচবিহারে "বুড়ো - বুড়ি বলতে শিব - দুর্গা বোঝাত। বুড়া শব্দের অর্থ বাবা, বুড়ি মা। হীরা দেবী প্রত্যহ প্রাতে গাত্রোত্থান করে চিকনা পর্বতের প্রান্তস্থিত নদীতে স্নান করে তটস্থিত বুড়ির মন্ডপ নামক দেবস্থানে বনপুষ্প ও বিল্ব পত্র আহরণ করে পার্বতীসহ মহাদেবের পূজায় ধ্যানস্থ ও তদ্‌গত চিত্ত হয়ে থাকতেন" ৩৭

সাত বইনী ঃ

সাত বইনী বা সপ্ত মাত্রিকার পূজার প্রভাব বাংলাদেশ বা বাঁকুড়া জেলার গ্রামাঞ্চলে সাতবইনী নামক এই লৌকিক দেবীর পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলায় এই দেবীর অস্তিত্ব খুব বেশী নেই। হলদিবাড়ী ব্লকের তিস্তাবুড়ি পূজার প্রবীণা মারেয়ানী বা দেওধা রেবতীবালা রায়ের মতে 'তিস্তাবুড়ি পাঁচ বইনীর অন্যতম।' কল্পিত এই পাঁচ বইনী হলেন দুর্গা, কালী, গঙ্গা, সরস্বতী ও তিস্তা। ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী ১ নং অঞ্চলের অন্তর্গত বাঁশরাজা

গ্রামে প্রতিবছর চৈত্র মাসের অশোকাষ্টমী তিথিতে সাতবোনের মূর্তি করে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। "বাংলাদেশেও মুসলিম ধর্মাবলম্বীদের ওলাবিবি, ঝোলাবিবি, খড়িবিবি, আসানবিবি, আজগই বিবি, বাহরা বিবি, ঝেটুন বিবির প্রভাব আছে।"[৩৮] লোকসংস্কৃতিবিদ ডঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে বাংলাদেশে এর প্রভাব বেশী থাকলেও এপার বাংলার একমাত্র ২৪ পরগণা জেলাতেই এই লৌকিক দেবীর প্রভাব বেশী। সাত বইনীর বিকল্প সাতবিবির সম্পর্কে অনেক লোকগাঁথাও শোনা যায়। কোচবিহারে পাঁচটি মহকুমার গ্রামাঞ্চলে পূজিত শীতলা, বুড়ি, কালী, তিস্তাবুড়ি, যখি প্রভৃতি নামে একক ভাবে পূজিত হলেও সাতবোন একসঙ্গে পূজিত হওয়ার ঘটনা খুবই বিরল। বর্ণহিন্দু সমাজে সপ্ত মাত্রিকার পূজা হয়। এক্ষেত্রে নাম পাওয়া যায় ব্রাহ্মী, ইন্দ্রাণী, বৈষ্ণবী, বরাহী প্রভৃতি শাস্ত্রীয় দেবীর। কোচবিহারের সাতবইনীও সপ্ত মাতৃকা বা সপ্তবিবি কল্পনা প্রসূত বললে অত্যুক্তি হবে না। দক্ষিণ ভারতেও সপ্তভগ্নী রূপী সাতবোনের পূজার প্রচলন আছে। বাঁকুড়া জেলার অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে হিংস্রজন্তুর আক্রমণ ও শিশুরোগের নিরাময়ের জন্য সাতবইনীর পূজার প্রচলন দীর্ঘ দিনের। নিজস্ব সম্প্রদায়ের পুরোহিত কর্তৃক প্রতিবছর পৌষ সংক্রান্তির দিন শুরু হয় সাতটি নির্দিষ্ট স্থানে সাত দিনে এই পূজার আয়োজন। কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার বামনহাট অঞ্চলের পাথরশোন গ্রামের বারহাত কালীকেও সাতবইনীর অন্যতম বলে মানা হয়।

উত্তরবঙ্গের অন্যতম কোচবিহার জেলা লোক সংস্কৃতির উৎসভূমি। এই জেলারই আসাম সীমান্তবর্তী প্রত্যন্ত তুফানগঞ্জ মহকুমার বাঁশরাজা গ্রাম। রাজবংশী রাভা অধ্যুষিত এই গ্রামের পঁচিশটি রাভা জনজাতি পরিবার কৃষি নির্ভর দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসে একাত্ম হয়ে থানসিড়ি ও রঙতুক পূজা যেমন করেন তেমনি গ্রামের রাজবংশী সমাজের সঙ্গে একাত্ম হয়ে শিব, বুড়াঠাকুর, মহাকাল, বলরাম ও বৈদ্যনাথ ঠাকুরের পূজাও করেন। এই গ্রামেরই প্রবীণ নৈচান রাভার পুত্র জ্যোতিষ চন্দ্র রাভা তার স্ত্রী অঞ্জলি রাভা ক্ষেত্রসমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে গ্রামের সাতবইনী লোকদেবীর পূজা ও মেলার কথা শোনান। বোনকে স্থানীয় রাজবংশী ভাষায় বলা হয় বইনী। তুফানগঞ্জ মহকুমার বাঁশরাজা গ্রামের পূর্ব প্রান্তে রায়ডাক নদীর এক মরাখাতে শেওড়া গাছের নীচে ছনের চালাঘরে সাত বইনীর সাতটি মূর্তি পাশাপাশি শীতলার মত পা নামিয়ে বসা অবস্থায় এই দেবী পূজিত হন। এই দেবীর কোন বাহন নেই। সাতবোনের মাঝের মূর্তিটি বড় বোনের। প্রত্যেকের ডানহাতে শাঁখা, বাঁ হাতে বরাভয়। তিন বোনের মুখের রঙ হলুদ, বাকি চার বোনের কমলা, সাতবোন সাত রঙের শাড়ি পরা। মূর্তি শিল্পী রাজবংশী সমাজের স্থানীয় তিলেশ্বর বর্মণ। চৈত্র মাসের অষ্টমী তিথিতে পূজা হয়। রাজবংশী, রাভা ছাড়াও অন্যান্য সম্প্রদায়ও এই পূজা করেন। সবই উৎসর্গকরা হয়, বলি হয়না। স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায় পৌরোহিত্য করেন। কোচবিহার জেলায় এরূপ স্বতন্ত্র মূর্তি দিয়ে একই সঙ্গে সাতজন লোকদেবীর পূজার দৃষ্টান্ত খুবই বিরল। রোগ, ব্যধি, প্রাকৃতিক বিপর্যয় শিশুরোগ ও অপদেবতার হাত থেকে রাজবংশী ও রাভা সম্প্রদায়ের সৃষ্ট এই পূজা ও মেলা জেলার একমাত্র উল্লেখযোগ্য লোকায়ত নিদর্শন বলা যায়।

সুঙ্গাই ঃ

কোচবিহার জেলার প্রায় সব মহকুমায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গ থেকে আগত বিশেষ করে ঢাকা ময়মনসিংহ ও বিক্রমপুর অঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের এক আরাধ্য দেবতা সুঙ্গাই। কোন শাস্ত্র গ্রন্থে এই দেবতার নামও উল্লেখ নেই। অশাস্ত্রীয় এই লৌকিক দেবতা পান উৎপাদন কারী বারুজীবী সম্প্রদায়ের আরাধ্য দেবতা। এই সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস, সুঙ্গাই দেবী সদয় হলে যেমন পানের উৎপাদন বৃদ্ধিপাবে তেমনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে পানের বরজ রক্ষা পাবে। প্রতিবছর আশ্বিন মাসের শারদীয় নবমী তিথিতে পানের দেবতা সুঙ্গাই পূজিত হন। এই লোক দেবতার কোন মূর্তি বা মন্দির নেই। তাৎক্ষণিক ভাবে পানের বরজেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের বারুজীবী সম্প্রদায়ের পান চাষীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল তারা সুঙ্গাই দেবীর পূজা করেন একটি বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও বারুজীবী সমাজে উপাস্য দেবী সুঙ্গাই অনেকের মতে 'অকুমারী' এবং এই দেবীর অধিষ্ঠান পানের বরজে। এই বিশেষ সম্প্রদায়ের আজন্ম লালিত বিশ্বাস, এই দেবীর আশীর্বাদেই পৃথিবীতে পান উৎপাদন সম্ভব, লোক শ্রুতি এই যে সুঙ্গাই দেবী বারুজীবী সম্প্রদায়ের কাছে পূজা প্রার্থণা করে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি তাদের রক্ষা করবেন। তাই বারুজীবী সমাজ তাদের জীবন ও জীবিকার স্বার্থেই প্রতিবছর শারদীয়া নবমী তিথিতে এই পূজা করেন। ডঃ কাঞ্চন মিত্র তাঁর বঙ্গীয় লোক সংস্কৃতি কোষ গ্রন্থে একটি লোকশ্রুতির উল্লেখ করেছেন "সুঙ্গাই কার্তিকের বাগদত্তা ছিলেন, বিবাহ বাসরে দেবী সুঙ্গাই জানতে পারেন কার্তিক প্রজনন ক্ষমতায় অক্ষম। তাই তিনি বিবাহে নারাজ হন। বাগদত্তা সুঙ্গাই লগ্ন ভ্রষ্টা হন। তাই তিনি কুমারী এবং সধবা নন। ফলত দেবী অকুমারীই থেকে যান।"

এই পূজায় মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। ঘট স্থাপন পূর্বক পুরুষরাই দেবীর অধিষ্ঠান পানের বরজে এই পূজা দেন। দেবী সুঙ্গাই এর হারানো কুমারীত্বের যন্ত্রণা ও সধবার ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের কারণে এতদঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের মহিলারা এই পূজা করেন না। পূজার উপকরণ পান সুপারী, তেল, সিঁদুর, বাতাসা ও আম্রপল্লব সহ একটি ঘট। কোন মন্ত্র নেই। ভক্তি বিনম্রচিত্তে অর্ঘ্য প্রদান করে প্রণামই এই পূজার মূল আঙ্গিক।

ক্ষেত্রসমীক্ষায় এক সাক্ষাৎকারে (১৭/১০/৯৭ইং) তুফানগঞ্জ মহকুমার প্রবীণ বারুজীবী সম্প্রদায়ের ধীরেন্দ্র দত্ত ও সুমতি দত্ত জানান 'বর্তমানে তাদের মধ্যে যারা শুধুমাত্র পান চাষের সঙ্গে যুক্ত অর্থাৎ যাদের পানের বরজ আছে তারাই এই পূজার সঙ্গে যুক্ত। যারা ভিন্ন পেশা বা অন্যপেশায় যুক্ত তাঁরা এই পূজা করেন না।' জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ধলপল গ্রাম কোচবিহারের বাবুর হাট গ্রামাঞ্চলের বারুজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী।

ভান্ডানী ঃ

লোক সংস্কৃতির এক প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী জেলা হল কোচবিহার, আর তার ধর্মীয় সংস্কৃতির অন্যতম প্রতীক হল লৌকিক দেবদেবী যার অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত ভান্ডানী / ভান্ডালী দেবী। জেলার লোক জীবন ও সংস্কৃতির মেল বন্ধন ঘটেছে এই লৌকিক দেবী ভান্ডানীর মাধ্যমে। উত্তরবঙ্গের কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডানী দেবী কোন কোন গ্রামে ডাংধরী মাও নামেও পূজিতা। ভান্ডানী দেবী জলপাইগুড়ি, কোচবিহার জেলায় স্থান ভেদে ভান্ডালী কিংবা ভান্ডারনী নামেও পরিচিতা। পৌরাণিক দুর্গা পূজার দশমীর পরদিন অর্থাৎ একাদশীর দিন থেকে তিনদিন ধরে এই পূজা হয়ে থাকে। জলপাইগুড়ি জেলার সকল গ্রামে এই পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহার জেলার তিস্তা ও তোর্ষা নদীর পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে এই লৌকিক দেবীর পূজার প্রচলন দেখা যায়। ব্যাঘ্র বাহনা নারী মূর্তি এই দেবীর প্রতীক। দ্বিভুজা এই দেবীর এক হাতে পাত্র অন্যহাতে বরাভয়। আবার জলপাইগুড়ি জেলার ভান্ডানী গ্রামের মূর্তির দুটি হাতই খালি। এখানে ভান্ডানীর সঙ্গে শিব / মহাদেব কিংবা অন্যকোন মূর্তি নেই। ভান্ডানী পূজার মূল উপকরণ দুধ, দই, চিনি বাতাসা, আতপচাল, কলা, নারকেল, বাতাবিলেবু, বিল্বপত্র, ধান, দুর্বা, ফলমূল। যজ্ঞের জন্য আটরকম জ্বালানী কাঠ। স্থানীয় পুরোহিত দেউসী রাজবংশী ভাষায় ভান্ডানী দেবীর প্রাণ প্রতিষ্ঠা, আবাহন বিসর্জন যাবতীয় মন্ত্র পাঠ করে পূজা শুরু করেন। বর্তমানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই পূজার পুরোহিত আসামের শর্মা উপাধিধারী ব্রাহ্মণ। এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় মেখলীগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ গ্রামে ভান্ডানী পূজায় উপস্থিত থেকে বর্তমান পূজারী উপেন্দ্র নাথ শর্মার কাছ থেকে একটি ধ্যানমন্ত্র শোনা যায়। এটি হল —

"ওঁ দেবীং দানব মাতরম নিজ সদাঘূর্ন্মহালোচনাম্।
দংষ্ট্রাভামমুখী জটানিবিল সম্মৌলী, কপাল স্রজন্,
বন্দোলোক ভয়ঙ্করীং খম রুচিং নাগেন্দ্র হাড়োজালাম্।
সর্পাবদ্ধ নিতম্ব বিপুলাং বানালধনুকি প্রতীম্।" [৩৯]

ভান্ডানী পূজা জলপাইগুড়ি জেলার প্রায় সকল গ্রামে অনুষ্ঠিত হলেও কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার ডাঙ্গার হাট, নিজতরফ গ্রাম, রাণীর হাট, কামাত চাংড়াবান্দা, দেবীর ডাঙ্গা প্রভৃতি গ্রামে সার্বজনীন ভাবে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাচীনত্বের বিচারে নিজতরফ গ্রাম ও রাণীর হাট গ্রামের পূজা অগ্রণী। নিজতরফ গ্রামের বাঁধানো ভিতের উপর টিনের চালাঘরের দক্ষিণমুখী মন্দিরে ভান্ডানী দেবীর বাৎসরিক পূজা যথারীতি অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামের সকল পূজায় পাঁঠা ও পায়রা বলি হয় মানত স্বরূপ। ভান্ডানী অনেক গ্রামে বনদুর্গা নামেও পরিচিত। জলপাইগুড়ির অনেক গ্রামে পশু বলি হয়না। ভান্ডানী দেবী সঙ্গে দুর্গার মত লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ থাকে না। মহকুমার সবকটি পূজা ও উৎসবকে কেন্দ্র করে সংশ্লিষ্ট গ্রামে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার কেশরী বাড়ি ও কেদার হাটে ভান্ডানী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মেখলীগঞ্জ মহকুমার মাথাভাঙ্গা ও হলদিবাড়ির নির্দিষ্ট কয়েকটি গ্রাম ব্যতীত জেলার আর কোন মহকুমার গ্রাম বা শহরাঞ্চলে এই পূজার প্রচলন নেই।

ভান্ডানী দেবী মূলতঃ দ্বিভুজা, ব্যাঘ্রবাহনা। তা সত্ত্বেও কালের বিবর্তনে কোন কোন ক্ষেত্রে চতুর্ভুজা, দশভুজা এবং সিংহ বাহনাও দেখা যায়। এই দেবী সম্পর্কে তিনটি লোক শ্রুতি প্রচলিত আছে। জেলার পাটছড়া গোপালপুর গ্রামে প্রতি বছর আশ্বিন মাসের দুর্গা পূজার পরদিন অর্থাৎ একাদশী তিথিতে ব্যাঘ্রবাহনা চতুর্ভুজা ভান্ডানী দেবীর পূজা হয়।

শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আগ্রাসী প্রভাবে দেবী ভান্ডানীর গায়ের রঙের পরিবর্তন এবং বাহন বাঘ থেকে সিংহ, দ্বিভুজা থেকে চতুর্ভুজা, সঙ্গী হিসেবে লক্ষ্মী, সরস্বতী যিনিই থাকুকনা কেন, কালের বিবর্তনে মূর্তির যে পরিবর্তনই হোক না কেন অসুর দলনী, অশুভ শক্তির বিনাশকারী, দুষ্টের দমনকারী, কল্যানময়ী মায়ের রূপ থেকে যেমন সরে আসেননি তেমনি জেলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বাহন হিসেবে লৌকিক এই দেবী শ্রদ্ধায় ও ভক্তিভরে নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠির গন্ডি পেরিয়ে আজ সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে।

কোচবিহারে লোকায়ত সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে লৌকিক দেবদেবীর অবস্থান কত গভীরে তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই ভান্ডানী দেবী। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে একদা উত্তরবঙ্গ তথা জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহারের অরণ্য অধ্যুষিত অঞ্চলের এই লৌকিক দেবীকে অরণ্যদেবী বা বনদেবী বললেও অত্যুক্তি হবে না।

হিন্দু মুসলিম মিলিত সংস্কৃতির দেবতা ও অনুষ্ঠান (পীর, দরবেশ ইত্যাদি)

ফার্সি পীর শব্দের বুৎপত্তিগত অর্থ হল 'বৃদ্ধ ব্যক্তি'। কিন্তু প্রচলিত অর্থে আমরা এই অর্থ ব্যবহার করি না। পীর অর্থে মুসলিম সাধক বোঝালেও সর্বাধিক প্রচলিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় পীর শুধু জ্ঞানী ব্যক্তি নন, তিনি অতি মানবিক, অতি লৌকিক শক্তিধর ব্যক্তি হিসেবে পীর আখ্যায় ভূষিত হন। এক কথায় যিনি পাপী - তাপীর মুক্তির পথ প্রদর্শক, তিনিই ব্যাপক অর্থে পীর। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও লোকায়ত ধর্মীয় বিশ্বাস হল পীর পয়গম্বর হলেন আল্লার সাক্ষাৎ প্রতিনিধি। "শেখ, মুর্শিদ, ওস্তাদ, হুজুর প্রভৃতি পীরের সমার্থক শব্দ। হিন্দুর যোগী, বৌদ্ধের 'থের' প্রভৃতি পীর শব্দের সমার্থবাচক। ইসলামের সুফী মতবাদ থেকে পীরের গুরু তত্ত্বের উদ্ভব। শুদ্ধ ও সিদ্ধ ব্যক্তিই সুফী। তিনিই পীর, তিনিই মুর্শিদ।"[৪০]

মুসলিম সুফী দর্শন অনুযায়ী পীরবাদ এবং হিন্দু ধর্মানুযায়ী গুরুবাদ একই ধারণা প্রসূত। দুটি তত্বই অধ্যাত্ম সাধনার বিষয়ের উপর দাঁড়িয়ে আছে। হিন্দুমতে ভক্তের সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক, মুসলিম মতেও তেমনি আল্লা ও বান্দার সম্পর্ক তৈরী হয় ভক্তি ও উপাসনার দ্বারা।

ভারতবর্ষে পীর দরবেশের আগমন দশম শতাব্দীতে ঘটলেও কামরূপে খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে ধর্মাবলম্বী সাধুসন্তগণ এতদঞ্চলে আসতে শুরু করেন। ইসলামের ভক্তি শাস্ত্র অনুযায়ী এদের স্থান ভেদে বিভিন্ন নামে পরিচিত আছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ইসলাম ধর্ম প্রচারকগণ পর্যটকের ভূমিকায় এসে পীর, ফকির, দরবেশ নামে পরিচিত লাভ করেন। এঁদের অনেকে হিন্দুর আকরা, ধাম, সত্র প্রতিষ্ঠানের মত ধাম বা আকরা প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার করেন এবং অনেকে দেহরক্ষা করে উক্ত স্থানকে দেবত্বের মহিমায় ভূষিত করেন। কোচবিহার জেলায় এমনি উল্লেখযোগ্য একাধিক প্রাচীন মাহাত্ম্যমূলক দরগাহ বা ধাম আজও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

কোচবিহারে হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের সম্মিলিত সংস্কৃতিজাত ও ধর্মীয় ভাবনার উৎসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পীর মাহাত্ম্যসূচক দরগা ও মাজার গুলি। এই জাতীয় পীর দরগা নির্ভর উৎসবের প্রচলন ও উদ্ভবের পেছনে যে সমকালীন ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, প্রশাসনিক ও সামাজিক কারণ বিদ্যমান তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না। "মুসলিম কর্তৃক বঙ্গ বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে উত্তরভারত থেকে মুসলিম ফকিরগণ বাংলা দেশে এসে প্রবেশ করতে আরম্ভ করেন এবং সমকালীন রাষ্ট্রীয় শক্তির সহায়তায় তারা এদেশীয় হিন্দু সমাজের জনমানসে ইসলাম ধর্মীয় চেতনার প্রভাব বিস্তারে মনযোগী হন।" [৪১]

বাঙ্গালীর জাত - পাত নির্ভর বর্ণভেদ প্রথা এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অত্যাচার, ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণে বিভেদ ও ব্রাহ্মণ সমাজের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ফলেও অনেক হিন্দু ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে দেখা যায় বাহিরকে ঘর করার এবং পরকে আপন করার বাঙালী মনোবৃত্তি। বাংলার ধর্মীয় সংস্কৃতিতে দেখা যায় শাক্ত- বৈষ্ণবের মিলন। তাই বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধিকাকে দিয়ে কৃষ্ণ লীলার উপাসনা করান।

ইসলাম ধর্মের মূল কথা হল শক্তি, মৈত্রী, আত্মসমর্পণ ও পাপমুক্তি। সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল কথা যা ভারতবর্ষের ভক্তি আন্দোলনের উন্মেষ পর্বে এই দুই উদার ধর্মের সমন্বয় সাধনের ক্ষেত্রে ভক্ত কবির, শঙ্করদেবের মতই চৈতন্যদেব এবং সুফী সাধকদের ধর্মীয় বিশ্বাস বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় সংস্কৃতি ও ললিত কলার অংশীদারও হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের যৌথ সাধনা। তাই বলা যায় উত্তরপূর্ব ভারত, উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারেও হিন্দু মুসলিম সমন্বয়ের সুফল হল এই পীর - দরগা ও মাজার সরিফ কেন্দ্রিক উৎসব, অনুষ্ঠান ও মেলা।

কোচবিহারের মুসলিম ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি স্বরূপ কয়েকজন পীরের জীবন মাহাত্ম্য, অলৌকিক কার্যকলাপ, ধর্মীয় প্রচার মূলক বৃত্তান্ত ও পীরগণের আত্মত্যাগ ও তাঁদের পুত চরিত্র নিয়ে অনেকে গীত ও পাঁচালী রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তরবঙ্গের হিন্দু কবি কৃষ্ণ হরিদাস। তিনি রচনা করেন সত্যপীরের পাঁচালী। বিস্ময়ের ব্যাপার এই হিন্দু কবির গুরু ছিলেন মুসলিম মামুদ সরকার —

" তাহের মামুদ গুরু শমস নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরি গান।"

প্রাচীন কামাতাপুর, ধলুয়াবাড়ী, কোচবিহার সদরের তোর্ষাপীর ধাম নামক মুসলিম পীরের দরগা আজ ঐতিহাসিক পুরাসম্পদে পরিণত হয়েছে। কোচবিহারের তোর্ষা পীর, শাহফকির কামাল পীরগণ উল্লিখিত দরগায় একদিন নিরাপদে নিশ্চিন্তে বাস করে তাদের ধর্মীয় মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। বর্তমানে উক্ত স্থানগুলি পীরোত্তর বা পীরপাল ভূমি হিসেবে কোচবিহার রাজ আমল থকে চিহ্নিত।

পীর দরবেশদের বাৎসরিক 'ওরস' বা ইসালে সাওয়াব নামক ধর্ম সভা বা ধর্মীয় মিলন মেলা একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান যা প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় পীরগণের সমাধিস্থল, মাজার বা দরগাহে। এই উৎসবের সঙ্গে হিন্দুর মেলা নামক উৎসবের সাদৃশ্য আছে। জেলার লোক উৎসব ও মেলায় ধর্মীয় সাংস্কৃতিক কর্তব্য পালন করে চলেছেন ভক্তপ্রাণ মুসলিমগণ তাদের নির্দিষ্ট বিভিন্ন তিথি ও তারিখে। এমনই এক উল্লেখযোগ্য ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মন্ডিত পীরদরগাহ বা মাজার নির্ভর উৎসব হল হলদিবাড়ী ব্লকের হুজুর সাহেবের মেলা। হিন্দুর মেলায় মুসলমান, মুসলমানের মেলায় হিন্দুর আগমন এরূপ উৎসবকে এক মিলন মেলায় পরিণত করেছে। শুধু কোচবিহার জেলাই নয় হলদিবাড়ীর হুজুর সাহেবের মেলা আজ দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের ভক্তপ্রাণ মানুষের কাছে হিন্দু মুসলিম সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোচবিহারের হিন্দু বাঙালীর লোকায়ত ধর্মীয় জীবন, কৃষিকর্ম ভিত্তিক সমাজ জীবন, আর্থ সামাজিক ও লৌকিক সংস্কৃতি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার অন্তস্থলে পীরবাদের শেকড় নিহিত, এই পরিপ্রেক্ষিতে জেলার তুফানগঞ্জ, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, মেখলীগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকের জনজীবনে লোকবিশ্বাস জাত যে ধ্যান ধারণা ও শ্রদ্ধাভক্তি মিশ্রিত অখন্ড বিশ্বাস গড়ে উঠেছে পীর ও দরবেশ গণের সর্ম্পকে তা হল —

১। সকল পীরগণই আধ্যাত্মিক মহিমায় মহিমান্বিত ধর্মগুরু, যাদের জীবনে ভোগের চেয়ে ত্যাগের আদর্শই বড়।

২। প্রত্যেক পীরই অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এবং তাদের ক্ষমতা ও কেরামতি দ্বারা তারা যেমন যে কোন জিনিস ঘটাতে পারেন তেমনি যেখানে খুশী যাতায়াত করতে পারেন। প্রাকৃতিক ঘটনা নিয়ন্ত্রণ ও দুর্ঘটনাকে ও প্রতিরোধ করতে পারেন। কোচবিহারের তোর্ষা পীর ও পাগলপীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৩। প্রায় সকল পীরগণই ভবিষ্যৎ বাণী করার অধিকারী।

৪। সকল পীরগণই মানুষের মনস্কামনা পূর্ণ করেন, সন্তানহীনকে সন্তান দান করেন। ফলহীন বৃক্ষকে ফলবতী

করেন। এঁদের অনুগ্রহে আরব্ধ কাজে সফলতা লাভ করা যায়। খোয়াজ পীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৫। পীরগণ দুরারোগ্য ব্যাধি নিবারক ও প্রতিরোধের ক্ষমতা রাখেন। মানুষের শারীরিক প্রতিবন্ধকতা দূর করেন, মহামারীর আক্রমণ প্রতিরোধ এবং রোগাক্রান্ত ব্যাক্তিকে রোগমুক্ত করেন। পীরগণ তুকতাক, ঝাড়ফুঁক লোক চিকিৎসার কাজ করেন। বাংলা তথা উত্তরবঙ্গের সর্বত্র পূজিত সত্যপীর এই শ্রেণীভুক্ত।

৬। পীরগণ শুধু মানুষের উপরই কতৃত্ব করেন না জীব জন্তুর উপরও করেন। সাপ, বাঘ, কুমীর, কুকুর তাদের বশমানে। এ সকল জীব জন্তু মানুষকে আক্রমণ করলে বা কামড়ালে পাগলা পীরের শরণাপন্ন হলে মুক্তি পাওয়া যায়। এই বিশ্বাস সমগ্র কোচবিহারের মত উত্তরবঙ্গে ও সমধিক প্রচলিত।

ডাঃ ওয়াকিল আহমেদের মতে পীর গণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন — "ঐতিহাসিক, পৌরাণিক, লৌকিক।" [৪২]

জেলার সকল শ্রেণীর হিন্দুগণ মূর্তিপূজায় বিশ্বাসী হলেও পীর পূজার ক্ষেত্রে কোন মূর্তির আরাধনা করেন না। সকল ক্ষেত্রেই পাট বা প্রস্তরখন্ডকে পীরের প্রতীক হিসেবে পূজা করা করেন। কোচবিহার জেলার বিভিন্ন গ্রামে ক্ষেত্র সমীক্ষায় যেসব পীরের প্রতীক আমরা চাক্ষুষ করেছি তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী হল সত্যপীর, পাগলাপীর, তোর্ষা পীর ও হুজুর একরামূল হক - এর মাজার সরীফ। জেলার লোকায়ত বিশ্বাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে এই পীরগণের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। এঁদের আধ্যাত্মিক শক্তির কেরামতি ও লৌকিক কাহিনী উত্তরবঙ্গের লোক মানসে এক চিরস্থায়ী আসন লাভ করেছে।

কোচবিহার জেলার হিন্দু - মুসলিম সংস্কৃতিসমন্বিত যে সকল পীরের মাহাত্ম্য কোচহিারের লোকসংস্কৃতির এক ঐতিহ্যবাহী নিদর্শন, তা হল ১/পাগলাপীর, ২/তোর্ষা পীর, ৩/খোয়াজ পীর, ৪/সত্যপীর, ৫/পীর একরামূল হক(হুজুর সাহেব)।

পাগলা পীর ঃ পীর কথাটি মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতির পরিচয়বাহী হলেও কোচবিহারের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে বিশেষ করে গ্রামের শিশু কিশোরদের মধ্যে পাগলা পীরের পূজার প্রচলন দেখা যায়বেশী। কোন কোন মহকুমার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ দলবদ্ধ ভাবে মাগন সংগ্রহের মাধ্যমে এই পাগলা পীরের পূজা উৎসবে মেতে উঠেন। হলদিবাড়ী, মেখলীগঞ্জ মহকুমায় গ্রামীণ বালকগণ একটি বাঁশের কঞ্চির মাথায় পাট এবং মান্দার গাছের লাল ঝুমকোফুল বেঁধে দিয়ে দলবদ্ধ ভাবে বাড়ী বাড়ী ঘুড়ে পাগলা পীরের মাগন তুলে বেড়ান। গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে প্রবেশ করে সোনরায়ের মাগন তোলার ঢংএ প্রতিবছর ফাল্গুন মাসের ১৩তারিখে এই পাগলা পীরের ভক্তের দল বলে ওঠেন "পাগলা পীরের নিমাস্তে বলো আল্লা"। "হুকা করে টোরোৎ টারাৎ ছিলিমের পুটকিত ছাই, এই বাড়ীর ভিক্ষা পাইলে অন্যবাড়ী যাই"। অর্থাৎ হুকার জলে শব্দ হয়ে কল্কিতে ছাই জমেছে, এই বাড়ীর মাগন পেলে অন্য বাড়ী যাওয়া হবে ইত্যাদি। অনেক ক্ষেত্রে পাগলা পীরের ভক্তগণ মাগন দেওয়ার পর দাতাকে এটি মাদারের ফুল আশীর্বাদ স্বরূপ দেন।" [৪৩]

এই অনুষ্ঠান জেলার একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমার হিন্দু - মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যায়। সারাদিন অর্থ ও মাগন সংগ্রহের পর ভক্তগণ, দই, চিনি, কলা, বাতাসা প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে গ্রামের কোন পাটে বা থানে উক্ত পাগলা পীরের প্রতীককে পূজা দেন। কোচবিহার জেলায় পাগলা পীর গ্রাম / গেরাম ঠাকুরেরই অন্যতম রূপভেদমাত্র। অনেক পাড়াতেই গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হিন্দু রাজবংশীগণের পূজিত গ্রাম ঠাকুরের থানে বা পাটে পাগলা পীরের আসন বা থান নির্দিষ্ট আছে। তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই রাজবংশী যুবকগণ এই পূজার উদ্যোগী। নির্দিষ্ট থান বা পাটের বাইরেও জমিতে ১ - ২ফুট উঁচু বেদী তৈরী করে মাগনে অংশগ্রহণকারী বালকগণ একটি করে লাঠিপুঁতে দেন। বালকদের মধ্যে বয়সে যিনি জ্যেষ্ঠ পশ্চিম দিকে মুখ করে দুধ, চিনি, কলার 'ছিন্নি' তৈরী করে পাগলা পীরেরউদ্দেশ্যে নিবেদন করেন। এসময় পরিধেয় ধুতির কাছা খুলে তিন বার প্রণাম করেন। এ পূজায় নির্দিষ্ট কোন পূজারী বা মন্ত্র নেই। জেলার একমাত্র মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ী ব্লকেই পাগলা পীরকে কেন্দ্র করে এরূপ অনুষ্ঠান হতে দেখা যায়। পূজার সময় পাগলা পীরের নিমিত্তে আঙ্গিক ও মাগন

তোলার পদ্ধতি সবকিছুর সঙ্গেই জেলার হিন্দু রাজবংশীগণের পালিত সোনারায়ের পূজার, আঙ্গিক ও লোকাচারের সাদৃশ্য আছে। গত ৯/৩/৯৮ ইং তারিখে জেলার দিনহাটা মহকুমার কিসমৎদশগ্রামে এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় আমরা প্রত্যক্ষ করি উক্ত গ্রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ময়না, জিগা ও বটগাছের নিচে মূর্তিহীন পাঁকা বেদীর লোকদেবতা "ডাংধরার" পাটের পাশেই পাগলাপীরের বাঁধানো বেদীর অবস্থান। এই ডাংধরার পাটের পাগলা পীরের পাশাপাশি পূজিত হন কালী ও পোষামাসান। ষাট ঊর্ধ্ব গ্রামবাসী সিন্ধু বর্মন জানান জীব জন্তু কামড়ালে বিশেষ করে পাগলা কুকুরের কামড়ের ফলে জলাতঙ্ক রোগের হাত থেকে বাঁচার জন্য এবং যাতে পাগলাকুকুর না কামড়ায় তার জন্যই গ্রামবাসীগণ এই পাগলা পীরের থানে মানত পূজা দেন। মূর্তিহীন এই সিমেন্টের বেদীই এখানে পাগলা পীরের প্রতীক এবং এই মানত পূজার কোন নির্দিষ্ট দিন তারিখ নেই। অনেকে মনস্কামনা পূর্ণ হবার পর পায়রা বা কবুতর উৎসর্গ করেন।

পাগলা পীরের প্রকৃত পরিচয় অনেকেরই জানা নেই। তাঁর আচরণ উন্মত্ত বা পাগলের মত ছিল বলেই লোকে পাগলা পীর বলে ডাকেন। সকল পীরের মধ্যে কোচবিহার জেলায় এই পীরের প্রভাব সবচেয়ে বেশী। এই পীরের পাগলামী ও অসংযত আচরণের মাধ্যমে ধর্ম প্রচার ও লোকশিক্ষার বহু উপাদান আছে। "কোচবিহারে প্রচলিত পাগলা পীর সম্পর্কে লোক বিশ্বাস হল শৃগাল, কুকুর এই পীরের দর্শন করা মাত্র শান্তভাব ধারন করত, এই জন্য কোথাও কুকুর, শৃগাল ক্ষিপ্ত হলে বা পাগলা হয়ে উঠলে পাগলা পীরের নামে বাঁশ খাড়া করার প্রথা প্রচলিত আছে। এই অনুষ্ঠানের মধ্যে একজন "ভঁওরিয়া" বা "ভোঙরিয়া" (যিনি পীর কর্তৃক ভর হয়ে থাকেন) পাগলের ন্যায় আচরণ ও ভবিষ্যৎবাণী করেন।" [৪৪]

জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের মাইল দশেক দক্ষিণে বর্তমান বাংলাদেশের রংপুর জেলার অন্তর্গত চিলমারী গ্রামে (তিস্তা নদীর প্রান্ত দেশে) পাগলা নদীর তীরে প্রতি বছর চৈত্র মাসে পাগলা পীর বা পাগলা দেও এর নামে একটি মেলা বসে।

কোচবিহার জেলার গুদাম মহারানীগঞ্জ অঞ্চলের তোর্ষা পীরের সমাধি সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে তোর্ষা পীর, সত্য পীর পূজিত হন। প্রতিবছর পবিত্র মহরমের দিন পাগলা পীরের শ্বেত শুভ্র বেদীতে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্ত প্রাণ মানুষ লাল ও সাদা রঙের নিশান, খই, বাতাসা ও ধূপকাটি নিবেদন করেন। দেড়ফুট উঁচু পাকাবেদীর উপর উল্টানো পেঁয়াজের মত চুন কাম করা তিনটি বেদী এই পীরের প্রতীক। বেদীর সামনে ষোলটি সিঁদুরের ফোঁটা।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ২নং অঞ্চলের চারালজানি গ্রামের মাহুত পাড়ায় জেলার ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন এক পাগল পীরের পাট অবস্থিত। পূর্বমুখী দরমার বেড়ায় ঘেরা একটি টিনের চালা ঘরেই এই পাগলা পীরের অধিষ্ঠান। থানের মধ্যে দুটি লাল শালুর নিশান, দুটি বাতিগছা, জোরা তরোয়ালের মত দুটি জোড়া বাঁশ মাটির বেদীর উপর অধিষ্ঠিত এবং উপরের ছোট লাল কাপড়ের চাঁদোয়া টাঙানো এটাই পাগলা পীরের প্রতীক। এই থানে পাগলা পীরের পাশাপাশি সত্য পীরও পূজিত হন। "মুসলিম সম্প্রদায়ের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত শতাধিক বছরের প্রাচীন পাগলা পীরের এই থানে শৃগাল , পাগলা কুকুরের কামড়, দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি ও মনস্কামনা পুরনের জন্য সকল সম্প্রদায়ের মানুষই এখানে দুধ, কলা, আতপচাল, পাঁঠা, পায়রা,মোরগ উৎসর্গ করেন। পাগলাপীরের নামে সোয়া কেজি দুধ, চাল দিয়ে সিন্নি দেন অনেকে।" [৪৫] পাগলা পীরের এই থানে দৈনিক ফুল জল দেন গ্রামবাসীগণ। গ্রামবাসী মহম্মদ মহীউদ্দিন মিঞা ও সবেমিঞার মতে পাগলাপীর ও সত্যপীর এখানে গ্রামবাসীর রক্ষক ও জাগ্রত গ্রামদেবতা। উক্তঅঞ্চলের মাছুয়াটারির ধামে কালী, বাঘশূর, বিষহরী, বুড়া- বুড়ি, মুরিয়া মাসান ও কুমীর দেবের পাশাপাশি পূজিত হন পাগলা পীর। কোচবিহার জেলার হিন্দু মুসলিম ধর্মীয় সংস্কৃতি সমন্বয়ের এটি একটি বিরল দৃষ্টান্ত।

জেলার মাথাভাঙ্গা মহকুমার অন্তর্গত শিতলকুচী থানার মুসলিম অধ্যুষিত বড় মরিচা গ্রামের হিন্দু মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ পাগলা পীরের নামে খই , বাতাসা মোমবাতি দেন। অনেকে মুরগী ও মানত করেন। এছাড়াও পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের থান ও পাটে মাসান, কালী ও বুড়া ঠাকুরের পাশাপাশি পাগলা পীর ও সত্য পীর পূজিত হন। জেলার তিস্তা বুড়ি পূজার শেষের দিনে গ্রাম ঠাকুর ও কালী ঠাকুরের থানে ও কোচবিহারের রাজবংশী ওঝা ও ভোঙরিয়াগণ লোকচিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেন। পাগলাপীরের ভোঙরিয়াগণ ও এর দ্বারা প্রভাবিত বলে মনে হয়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং জেলার রাজবংশী সমাজের মধ্যে পাগলা পীরের পূজার প্রচলন যতটা দেখা যায় পূর্ব ও পশ্চিম দিনাজপুর এবং মালদহ জেলায় এর প্রভাব ততটা দেখা যায় না।

তোর্ষা পীর ঃ- কোচবিহার জেলার হিন্দু মুসলিম সমন্বিত সংস্কৃতির অপর এক নিদর্শন হল তোর্ষা পীর ধাম বা দরগা। কোচবিহার জেলার পুরা কীর্তি বা প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন স্বরূপ এই স্থানটি আজ কেবল কোচবিহারই নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে একটি পবিত্র ভূমি। বর্তমানে কোচবিহার শহরের পৌর এলাকা থেকে আধমাইল দক্ষিণে তোর্ষা নদীর রেল সেতুর উত্তর পার্শ্বে গুদাম মহারাণীগঞ্জ অঞ্চলে তোর্ষাপীরের মাজার অবস্থিত। স্থানীয় জনমানসে তোর্ষাপীর ধাম নামে পরিচিত। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণের আমলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে এই পীরের আবির্ভাব ঘটে। জেলায় প্রচলিত জনশ্রুতি হল এই তোর্ষা পীরের প্রভাবে ও তার অলৌকিককর্মকান্ডে অভিভূত হয়ে বহু মানুষ ইসমলামধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এই পীরের প্রকৃত নাম কেউ জানেন না। শুধুমাত্র তোর্ষা নদীর তীরে সাধন ভজনের জন্য বাস করতেন বলে তাঁর নাম তোর্ষাপীর হয়। কোচবিহার জেলায় তোর্ষানদী এবং তোর্ষাপীর সম্পর্কে বহু অলৌকিক কাহিনী ও লোকশ্রুতি প্রচলিত আছে। তোর্ষাপীর সম্পর্কে জেলার মানুষের অখন্ড বিশ্বাস তিনি ছিলেন অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী। তিনি যেমন একাধারে অনেকক্ষণ বা কয়েকদিন ধরে তোর্ষানদীর জলে ডুবন্ত অবস্থায় যোগাভ্যাসকরতে পারতেন। তেমনি ঐ অবস্থায় যদি কোন দর্শনার্থী বা ভক্ত তাঁর দর্শন প্রার্থনা করেন তাহলে তিনি হাত তুলে তাদের অবস্থানের কথা জানাতেন এবং মনস্কামনা পূর্ণ করতেন। মহারাজা হরেন্দ্র নারায়ণ ছিলেন তাঁর একান্ত অনুগত ভক্ত। "তৎকালীন অন্যান্য রাজাগণও এই পীরের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং তোর্ষা পীরের দরগায় নিয়মিত সিন্নি প্রদানের জন্য তৎকালীন রাজ সরকার দীর্ঘদিন ধরে অর্থ সাহায্য করতেন। মহারাজা হরেন্দ্র নারারায়ণ পীরের এই দরগার বা মাজারের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমি পীর পাল বা পীরোত্তর হিসেবে দান করেন।"[৪৬] বর্তমানে কোচবিহারে এই অঞ্চলটি গুদাম মহারানীগঞ্জ নামে পরিচিত। এই অঞ্চলের তোর্ষাপীরের বর্তমান মাজার কোচবিহারের দেবত্র ট্রাস্টের পৃষ্ঠপোষকতায় রক্ষনাবেক্ষণ হয়। মাজারটি প্রায় চার ফুট উঁচু, প্রায় দশ ফুট লম্বা, চওড়া চারফুট। চার চালা টিনের ঘরের মধ্যে অবস্থিত চারদিকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা।

বিগত ৭/৫/৯৮ইং তারিখ, মহরম উৎসবের দিন ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারে উক্ত মাজারের মহরম উৎসবের তাজিয়া শিল্পী গাটু মিজ্জা ও আকবর মিজ্জা জানান মহরমের দিন এই তোর্ষাপীরের "সমাধিস্থলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ মোরগ, পোলাও , সাদাকাপড়ের ঝুটি সহলাল নিশান, বাতাসা, খই, মুড়ি মানত হিসেবে নিবেদন করেন।" [৪৭] জেলার জাগ্রত এই পীরের সমাধিস্থলে ভক্তপ্রাণ হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ অনেক আশা আকাঙ্ক্ষাও মনস্কামনা নিয়ে হাজির হন প্রতিবছর মহরমের দিন। তোর্ষা পীরের সমাধি বেদীর রং সাদা, ওপরে মধ্যস্থলে একটি মৃন্ময় ঘট চক ও সিঁদুরের তিনটি ফোঁটা দিয়ে সজ্জিত। ঘটের উপর আম্র পল্লব এবং ঘটের সম্মুখে শোলার ফুল। এই মাজার বা দরগায় লাল নিশান এবং খই বাতাসা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন দর্শনার্থীগণের একটি পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করা হয়।

পীরের সমাধির উপর লাল শালু , মাটির ঘট তার উপরে সিঁদুর ও চকের টিপ , সাতটি পাতাযুক্ত আম্র পল্লব- হিন্দুর ধর্মীয় সংস্কৃতির প্রভাব বলে মনে করা হয়।

তোর্ষাপীর ধামের তোর্ষা পীরের উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত সত্যপীর, গাজীপীর, পাগলা পীরের বেদী। উন্মুক্ত স্থানে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই তিন পীর একই সঙ্গে মহরমের দিন সকল মানুষের শ্রদ্ধা ও ভক্তির নিবেদন স্বরূপ লাল নিশান ও খই বাতাসা পেয়ে থাকেন। প্রতি বছর পাঁচ পীরের উদ্দেশ্যে মহরমের পাঁচদিন আগে সোয়া কেজি দুধ দিয়ে সিন্নির নৈবেদ্য নিবেদনের প্রাচীন প্রথা এখনও বিদ্যমান।

খোয়াজ পীর ঃ- উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায় কর্তৃক পূজিত পীর হলেন খোয়াজ পীর। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এই পীর কোচবিহার জেলায় একদিন দেব মহিমায় উন্নীত হন। "উত্তরবঙ্গের মানুষের লোকায়ত বিশ্বাস জলের হাত থেকে খোয়াজ পীর মানুষকে উদ্ধার করেন । নৌকাডুবির সম্ভাবনা থাকলে খোয়াজ পীরের নাম স্মরণ করলেই মানুষ নৌকাডুবি থেকে রক্ষা পায়। শ্রাবণ ভাদ্র মাসে খাল, বিল, নদী, নালা যখন জলে ভরে যায় তখন শিশুগণের যাতে জলমগ্ন অবস্থায় মৃত্যু না ঘটে সেইজন্য খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এই দিন রোজা পালন করেন । সাধারণত ভাদ্র মাসে খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠানটি পালিত হয় ।" [৪৮]

নদী প্রধান কৃষিনির্ভর কোচবিহার জেলায় রাজবংশী সমাজে প্রতি বছর ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবার খোয়াজ পীরের

বেড়া ভাসানো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে । যদিও জেলার সব মহকুমায় এর অস্তিত্ব বেশী নেই। জেলার হলদিবাড়ী ব্লকের একাধিক গ্রামে খোয়াজ পীরের বেড়া ভাসানো অনুষ্ঠানটি হয়ে থাকে । সম্পূর্ণ নারী নির্ভর এই অনুষ্ঠানে অনেক সময় পুরুষরাও অংশগ্রহণ করেন। "ভদ্র মাসের বৃহস্পতিবার ও রবিবার হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। এই অনুষ্ঠানের আঙ্গিকে দেখা যায একটি কলাগাছের ভেলা তৈরী করে তার উপর শোলার তৈরী রঙিন কারুকার্যমণ্ডিত বেড়া দিয়ে একটি নৌকার মত তৈরী করা হয়। সন্ধ্যার সময় এটি স্থাপন করা হয় কোন গৃহস্থ বাড়ীর পার্শ্ববর্তী পুকুর বা নদীতে এবং গৃহস্থ নারীগণ ও বয়স্ক স্ত্রী লোকেরা সন্ধ্যার সময় জলাশয়ের ধারে গিয়ে উক্ত ভাসমান বেড়া সজ্জিত নৌকায় পান,সুপারী ফুল সহ দুধ, কলা, চিনির সিন্নির নৈবেদ্য দিয়ে পশ্চিম মুখে খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে হিন্দুরা প্রণাম ও মুসলিমগণ সালাম জানিয়ে বেড়াটি ঠেলে দেন। এভাবেই খোয়াজ পীরের উদ্দেশ্যে বেড়া ভাষান পার্বণটি সম্পন্ন হয়।"[৪৯] খোয়াজ পীরের এই শোলার বেড়াকে অনেকে 'দোনা'ও বলে । এই পীরের নামে বেড়া ভাসানো পর্বের পবিত্র মুহূর্ত হল গোধূলী লগ্ন। আর ময়দা, চিনি, গুড়, কলার সিন্নি এর নৈবেদ্যের প্রধান উপকরণ।

কোচবিহার জেলায় ভাদ্র মাসে রাজবংশী সমাজ, পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে মনসা বা বিষহরি পূজার দিন বেহুলার ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠান হয়ে থাকে । সেক্ষেত্রে গ্রামীণ বিবাহিত রমনীগণ স্বামী ও সংসারের মঙ্গল কামনায় সজ্জিত ভেলায় প্রদীপ জ্বালিয়ে বাড়ির পার্শ্ববর্তী কোন পুকুরে ভাসিয়ে দেন। একে বলা হয় 'ভেলাভাসানো' অনুষ্ঠান ।

"খোয়াজ পীরের প্রকৃত নাম বলীয়ান এবং বংশগত নাম আবুল আব্বাস । তিনি হজরত নূহের বংশধর এবং ইহুদি বংশধর ছিলেন বলে কোচবিহারে প্রচলিত জনশ্রুতি আছে । জীবনের শুরুতেই তিনি একজন বণিক এবং রসায়নবিদ্ ছিলেন। পরোপকার ছিল তার জীবনের ব্রত । জীবনের শেষ প্রান্তে এসে তিনি ঈশ্বরপরায়ণ এবং সন্ন্যাসীর জীবন পালনের মাধ্যমে ধর্মপ্রচারে আত্মনিবেদন করেন।" [৫০] সাধারণ মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শন ও তাদের দুঃখ কষ্ট নিবারনের জন্য তিনি সকল সময় সচেষ্ট ছিলেন । পূর্বে কোচবিহারের অনেক গ্রামেই খোয়াজ পীরের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শিত হলেও বর্তমানে ভাদ্র মাসে এই পীরের ভেলা ভাসানো অনুষ্ঠানটি প্রায় বিলুপ্তির পথে। নবাবী আমলে বিশেষ করে মুর্শিদাবাদে এই উপলক্ষ্যে বিরাট অনুষ্ঠান হয়। ভাগীরথী নদী বক্ষে এবং দুই তীরে উপস্থিত সহস্র দর্শকের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে অত্যুজ্জ্বল আলোক ছটা এবং অগ্নি ক্রীড়ার তুমুল শব্দ ও অতুল স্বপ্ন শোভার বিস্তার করতে করতে তারা চলে যেত। কথিত আছে যে, ঢাকার নবাব মোকরম খাঁ এই উৎসবের প্রবর্তক ছিলেন। মাতান্তরে, 'ব্যাড়াভাসান' চীন দেশীয় একটি প্রাচীন উৎসব বিশেষ।

সত্যপীর ঃ- সমগ্র উত্তরবঙ্গ এবং বর্তমান বাংলাদেশে হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতি সমন্বিত যেসকল দেবতার পূজার প্রচলন সবচেয়ে বেশী তারমধ্যে সত্যপীর অন্যতম । সত্যপীরই একমাত্র পীর যাঁকে নিয়ে সর্বত্রই ছড়া, কথা, পুঁথি, পাঁচালী ও কাহিনী রচিত হয়েছে সবচেয়ে বেশী । "সত্যপীরের পাঁচালীর মধ্যে বৃহত্তম ও বিচিত্রতম উত্তরবঙ্গের কবি কৃষ্ণহরিদাসের রচনা। কবি হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও তার গুরু ছিলেন মুসলিম মামুদ সরকার।

তাহের মামুদ গুরু শমস-নন্দন
তাহার সেবক হয়ে কৃষ্ণহরিদাস ।

কৃষ্ণহরিদাসের গ্রন্থে সত্যপীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিরূপে উপস্থাপিত হয়েছেন । মালঞ্চার রাজা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ময়দানবের অবিবাহিতা কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে সত্যপীরের জন্ম হয়েছিল। শঙ্কর-আচার্যের পাঁচালীতেও সত্যপীরের ইতিহাস অনেকটা এই রকম, সেখানে তিনি আলা বাদশাহের কানীন দৌহিত্র। শঙ্কর আচার্যের গ্রন্থ লেখা হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে, কৃষ্ণহরির বই অষ্টাদশ শতাব্দীর অথবা উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে ।"[৫১] এছাড়াও লোকসাহিত্যের বহু শাখা প্রশাখায় সত্যপীরের মাহাত্ম্য প্রচারিত হয়েছে । বর্তমান বাংলাদেশের রাজশাহী জেলায় সত্যপীরের ভিটা এখনও বর্তমান ।

হিন্দুর পৌরাণিক দেবতা সত্যনারায়ণের সঙ্গে সত্যপীরের সাদৃশ্য সর্বজন স্বীকৃত। স্কন্দ পুরাণেও সত্যপীরের উল্লেখ আছে। এদিক থেকে সত্য পীর প্রাচীন বলে মনে হয়। বিষ্ণুরই অপর নাম নারায়ণ। তিনিই শাশ্বত ঈশ্বর । সেই অর্থে সত্যনারায়ণের দেব কল্পনা অসম্ভবনয়।

ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে সংস্কৃতি সমন্বয় সাধন প্রচেষ্টা নয়, মুসলমান শাসনের চণ্ড নীতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুগণ এরূপ মিশ্র দেবতার উদ্ভাবন করে নিজ নিজ ধর্মের মুসলমানী রূপান্তর ঘটিয়ে ছিলেন।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে দুই রকম ভাবে সত্যপীরের পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথমত কোন বাড়ীতে অসুখ, মামলা মোকদ্দমা বা কোন ব্যক্তি রাহুগ্রস্ত হয়েছে বলে মনে করা হলে সত্যপীরের ফকিরের মাধ্যমে এই পূজা দেওয়া হয়। প্রকৃত পক্ষে সত্যপীরের পালাগানের মূল ব্যক্তিকেই ফকির বলা হয়। কোচবিহারে প্রচলিত সত্যপীরের পূজার দিন দেখা যায় গৃহকর্তা সস্ত্রীক উপবাস করেনএবং বাড়ীর উঠোনের পশ্চিমাংশে কাচাদুধ, কলা ও চিনির সাহায্যে 'ছিন্নি' তৈরী করে নৈবেদ্যর মাধ্যমে সত্যপীরের পূজা করা হয়। "কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী ও মুসলিম সমাজের বিশ্বাস ফকিরের মাধ্যমে ছিন্নি দিয়ে পূজা দিলেই সত্যপীর সন্তুষ্ট হন এবং বিপদ আপদের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা দূর হয়ে যায়" [৫২] জেলার সর্বজন পরিচিত ও প্রাচীন সত্যপীরের পাট অবস্থিত গুদাম মহারানী গঞ্জের তোর্ষাপীর ধামে। প্রতিবছর মহরমের পাঁচদিন পূর্বে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ভক্তপ্রাণ মানুষ এই পীরের থানে সোয়াকেজি দুধ দিয়ে ছিন্নি তৈরী করে সত্যপীরের নামে উৎসর্গ করেন। কোচবিহার জেলার সত্যপীরের পূজার দ্বিতীয় রূপটি হল, মানসিক পূজা অর্থাৎ বিশেষ কোন উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বা মনস্কামনা থাকলে এই পূজার আয়োজন করেন। জেলার বেশীর ভাগ গ্রামেই কৃষিকর্মের অবসর মুহূর্ত অর্থাৎ মাঘ থেকে বৈশাখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক গ্রামেই এই পূজা উপলক্ষ্যে সত্যপীরের পালাগান অনুষ্ঠিত হয়। আবার অনেক গ্রামে সত্যনারায়ণ এবং সত্যপীর পৃথক পৃথক ভাবে পূজিত হন। "কোচবিহারের ইতিহাসকার খান - চৌধুরী আমানতুল্লা সত্যপীর নামটিকে একটি উপাধি হিসেবে মনে করেছেন। সৈদলন (মহিদলন) নামে কোন রাজার কুমারী কন্যা সন্ধ্যাবতীর গর্ভে ভগবৎ ইচ্ছায় সত্যপীরের জন্ম হওয়ার বৃত্তান্ত পুঁথি এবং গীতে উক্ত হয়েছে। কোচবিহারে প্রচলিত প্রবাদ আছে যে গৌরে পাঠান রাজত্ব কাল সৈদলন মালঞ্চার রাজ ছিলেন। সত্যপীর সম্পর্কে অনেক বৃত্তান্ত প্রচলিত আছে। তিনি হিন্দু বংশজাত ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্ম অবলম্বন পূর্বক তিনি উক্ত ধর্মের প্রচারে নিজের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর নাম মাহাত্ম্যের জন্য উত্তরবঙ্গের বহু মানুষ ইসলাম ধর্মে আকৃষ্ট হয়েছিলেন।"[৫৩]

জেলার শুধু বিশেষ কোন সম্প্রদায়ের মধ্যেই নয় সত্যপীর প্রায় সবারই সর্বজনস্বীকৃত ও পূজিত দেবতা। জেলার হিন্দু সমাজে গৃহদেবতা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত সত্যনারায়ণ। জ্যৈষ্ঠ থেকে ভাদ্র মাস এই পূজার প্রশস্ত সময়। সত্যনারায়ণ এখানে বিষ্ণুরই অবতার। সত্যপীর ও সত্যনারায়ণের অভিন্নতা সম্পর্কে সত্যপীরের পুঁথিতে দেখা যায়,

" সত্যপীর নামে পূজা করিবে যবনে
এরূপে করিবে সেবা যার যে মনে ।"

কথিত আছে, গৌড়েশ্বর গণেশ হিন্দুমুসলমানকে এক মতাবলম্বী করার জন্য সত্যপীরের 'শিরনি' প্রচলন করেছেন । মতান্তরে গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ এই সত্য নারায়ণ নামান্তরে সত্য পীরের পূজা অথবা শিরনি প্রচলন করেছিলেন । সত্যপীরের দেহ কোথায় সমাহিত হয়েছে সে সম্পর্কে কোন জনশ্রুতি এ পর্যন্ত বিদ্যমান নেই ।"[৫৪]

কৃষি নির্ভর কোচবিহার জেলায় শহরের তুলনায় গ্রামাঞ্চলেই সত্যপীরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি নিদর্শনের মাধ্যমে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সংহতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । সত্যপীর কোচবিহার জেলায় লৌকিক, পৌরাণিক,ঐতিহাসিক যাই হোক না কেন জাগ্রত এই পীর জেলার লোকায়ত বিশ্বাস ও জনমানসে দৈবশক্তির প্রতিভূ হিসেবে ও অসহায় গ্রামীণ মানুষের সুখ-দুঃখ, আপদ-বিপদের নিয়ামক হিসেবে আধিপত্য বিস্তার করেছেন । জেলার লোকসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এই পীরকেন্দ্রিক অনুষ্ঠান গুলি । ডঃ সুকুমার সেন এই পীরবাদকে যথার্থই নব পৌরাণিক ধারা বলে উল্লেখ করেছেন ।

পীর একরামূল হক্ (হুজুর সাহেব) ঃ- সমগ্র উত্তরবঙ্গের সর্বজন শ্রদ্ধেয় অন্যতম পীর দরবেশ হলেন হজরত মৌলানাশাহ সুফী একরামূল হক্। জন্ম ভূমি মুর্শিদাবাদ জেলার পুনাশী গ্রামে হলেও সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত পরিভ্রমণের পর ইনি কোচবিহার জেলার হলদিবাড়ী ব্লকে নিজের দেহ রাখেন, পীর একরামূল হক্ বর্তমানে সমগ্র উত্তরবঙ্গে মানবতার মূর্ত

প্রতীক হুজুর সাহেব নামে পরিচিত। দীর্ঘ ষাট বছর পাহাড়, পর্বত, বনে-জঙ্গলে কঠোর তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন। জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় পীর একরামূলহক্ বহু মনীষীর সান্নিধ্য লাভ করেন। দীর্ঘ উনিশ বছর সাত মাস অত্যন্ত কঠোর সাধনায় নিমগ্ন থেকে তিনি তাঁর অভিষ্ঠ লক্ষ্যে পৌঁছান। সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর খেলাফৎ প্রাপ্ত হয়ে আল্লার প্রেরিত দূত রূপে অবিভক্ত বাংলা ও আসামের মানুষের সত্য ও সুন্দরের পথ প্রদর্শক রূপে পরিচিতি লাভ করেন। সমকালীন মুসলিম সমাজের কুসংস্কার দূরীকরণের সঙ্গে সঙ্গে কোচবিহারের হুজুর সাহেব জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের মধ্যে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠার বাণী শোনান। শুধু তাই নয় অসংখ্য ভক্তের অনুরোধে তিনি অনেক অলৌকিক কাজকর্ম প্রদর্শন করতেন। " সুফী আদর্শে বিশ্বাসী এই মহামানব পীর একরামূল হক্ তৎকালীন কোচবিহার রাজার কাছ থেকে ১২৬বিঘা জমি হলদিবাড়ী শহর সংলগ্ন স্থানে কেনেন। উক্ত স্থানেই ভক্তগণের ইচ্ছা অনুসারে ১৩৫১ সনের ১৩ ই ভাদ্র ৯৩ বছর বয়সে জলপাইগুড়ি শহরের এক ভক্তের বাড়ীতে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটলে, হলদিবাড়ীর ভক্ত শিষ্যগণ তাঁকে নিজস্ব জমিতেই সমাহিত করেন। হলদিবাড়ী শহর সংলগ্ন স্থানের আবাধারই বর্তমানে কোচবিহারের তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও আসামের পরিচিত মাজার শরীফ।" [৫৫]

বর্তমানে হুজুর সহেবের মাজার শরীফের তত্বাবধায়ক খোন্দোকার আব্দুল হামিদের মতে,(ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকারের পর প্রযাত) হুজুর সাহেব ছিলেন পীরের অন্যতম। হুজুর একরামূল হক্ যেমন সুফী আদর্শে বিশ্বাস করতেন তেমনি নিজেকে নিঃস্ব ফকির ভাবতেন। অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হওয়া স্বত্ত্বেও নিজেকে লুকিয়ে রাখতেন প্রচার বিমুখতার আড়ালে। বর্তমান হুজুরের এই মাজার শরীফে দক্ষিণমুখী পাকা দরগার মধ্যস্থলে হুজুরের দেহ সমাহিত। এখানেই প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হয় বার্ষিক ইসালে সওয়াব বা ধর্ম সভা যা শুধু কোচবিহারেই নয়সমগ্র উত্তরবঙ্গে হুজুরের মেলা নামে পরিচিত। ইসলামী ধর্মীয় সাধনায় বিশ্বাস করা হয় আল্লার অলিরা মরেন না, দেহ রাখেন মাত্র। প্রকৃত ভক্তের মত আল্লাকে ডাকতে পারলে হুজুরের আশীর্বাদ বা দোয়া থেকে কেউ বঞ্চিত হন না। তাই হুজুরের সমাধিস্থলে হাজির হন মানত স্বরূপ চাল, টাকা, গরু, বাছুর, মুরগী, চাদর, ধূপকাঠি নিয়ে কখনো চিররুগ্ন বা বন্ধ্যা রমণীগণ। স্থানীয় বাসিন্দা ও হুজুরের এই মাজার শরীফের সঙ্গে দীর্ঘদিন যুক্ত ফজলুল হক্ ও জালাল উদ্দিনের মতে, ' হুজুর মানুষের সবরকম মুশকিল আসান করেন। হতাশগ্রস্ত হাজার হাজার নরনারী এই হুজুরের আশীর্বাদে পেয়েছেন নূতন করে বাঁচার প্রেরণা'। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানের যুগে যার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবেনা। নির্দিষ্ট দিনেই নয় সারাবছর হলদিবাড়ী হুজুর সাহেবের মাজার শরীফে চলে অসংখ্য মানুষের যাতায়াত। শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মহামিলনের এমন পবিত্র ভূমি আজ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সর্বধর্মের মানুষের তীর্থ ভূমিতে পরিণত হয়েছে। তাই পীর একরামূল হক্ বা হুজুর সাহেব হলেন সম্প্রীতির মূর্ত প্রতীক এবং হিন্দুমুসলিম সংস্কৃতি সমন্বিত অনুষ্ঠানের দিশারী।

কোচবিহারের পীর একরামূল হক্ বা হুজুর সাহেব ছিলেন একাধারে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী, যাঁর আশীর্বাদে মৃতপ্রায় ব্যক্তি প্রাণ পায়, মনস্কামনা পূর্ণ হয়, নিঃসন্তান লাভ করেন সন্তান। আবার ইনি আধ্যাত্মিক মহিমায় মহীয়ান, ভোগ নয় ত্যাগই তার আদর্শ। এমনি হুজুর সাহেবের জীবনের অলৌকিক ঘটনার একটি হল - " একবার অধুনা বাংলাদেশের নীলফামারীর একগ্রামে ভক্তের বাড়ীতে উপস্থিত হলে সেখানকার গ্রামবাসীগণ হুজুর সাহেবের কাছে আরজি জানান, এতদঞ্চলে বাঘের প্রচন্ড উপদ্রবে আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত প্রায়। আপনি এই বিপদ থেকে আমাদের বাঁচান। অসংখ্য গ্রামবাসীর সকাতর অনুরোধ উপেক্ষা করতে না পেরে তিনি তাদের দুটো তরতাজা ছাগল যোগার করে চামড়া ছাড়িয়ে দুটি বড় গামলায় রাখতে বলেন। যেই বলা সেই কাজ, এরপর হুজুর সাহেব ঐ ভক্তের বাড়ীর বাইরে উঠানে তাঁর বসার ব্যবস্থা করতে বলেন। সেভাবে ব্যবস্থাও হয়। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হলে তিনি নির্দিষ্ট চেয়ারে আসন গ্রহণ করে তাঁর সামনে দুদিকে ছাগল ভর্তি গামলা দুটি রাখতে বলেন। এদিকে কৌতূহলী নর নারীর ভীড় সমানে, বাড়তে থাকে এমন সময় পার্শ্ববর্তী গভীর জঙ্গলে বাঘের প্রচন্ড গর্জন কানে আসতে থাকে এবং প্রচন্ড রুদ্ধ হুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে বাঘটি এগিয়ে আসতে থাকে। দিনের বেলা মুর্তিমান এই যমকে আসতে দেখে উপস্থিত নরনারীগণ ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। হুজুর সাহেব হাতের ইসারায় তাদের শান্ত হতে বলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। বেশীর ভাগ নরনারী পার্শ্ববর্তী বাড়ীতে আশ্রয় নেয়। এদিকে বাঘ দুটি তাদের বিশাল বপু নিয়ে একেবারে হুজুর সাহেবের সামনে হাজির। একটু খানি সময় হুজুরের মুখের দিকে তাকিয়ে বাঘ দুটি তাঁর পায়ে মাথা ঘষতে থাকে। হুজুর সাহেবও পরম আদরে তাদের গায়ে হাত বুলিয়ে শেষে সামনের গামলা দুটির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন বাঘ দুটি মহানন্দে অযাচিত আহারে মনোনিবেশ করে। ভোজন পর্ব সমাধা হলে তারা হুজুর সাহেবের মুখের দিকে তাকাতে থাকে হুজুর তাদের জঙ্গলের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করা মাত্র বাঘ দুটি সুবোধ বালকের মত হেলতে দুলতে জঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করে। এরপর ঐ এলাকায় কোন বাঘের উপদ্রব হয়নি।"[৫৬]

কোচবিহারের হুজুর সাহেব শুধু জীব-জন্তুর উপরই কর্তৃত্ব ফলাতে পারেন না । বাঘের মত হিংস্র জন্তুকে বশ মানাতে পারেন ,উপরিউক্ত কাহিনী তার জীবন্ত সাক্ষী। তাই কোচবিহারের লোকায়ত জনজীবনের অখন্ড বিশ্বাস পীর একরামূল হক্ বা হুজুর সাহেব শুধুমাত্র ইহলোকের অভিলাষই পূর্ণ করেন না, আল্লার সান্নিধ্যে তাঁর ভক্ত বা বান্দাকেও সাহায্য করেন।

এছাড়াও কোচবিহার জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার কামাত চাংরাবান্দা অঞ্চলে হুজুর সাহেবের এক পুত্রের সমাধিস্থলে একটি দরগা আছে । প্রতিবছর মাঘ মাসের শেষে হুজুরের মেলার পরবর্তী সময়ে সমগ্র কোচবিহারের ধর্মপ্রাণ মুসলিমগণ এখানে ইসালে সওয়াব উপলক্ষ্যেএকত্রিত হন।

জাগ্রত এই পীরের দরগা ও মাজারগুলিকে বাদ দিলেও কালের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত প্রায় অস্তিত্বহীন কিছু দরগার সন্ধান পাওয়া যায় । কোচবিহার জেলার চার মাইল দক্ষিণ পূর্বে প্রাচীন রাজধানী ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলে (বর্তমান ঘুঘুমারী সংলগ্ন) শাহ্ ফকির সাহেবের সমাধি আছে। এক সময় কোচবিহার রাজ সরকার এই দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য ৭৭ বিঘা জমি ''পীরপাল'' দান করেন।

'' বর্তমানে গোসানীমারী অঞ্চলের কামতাপুর দুর্গের বহির্ভাগে এবং বাঘ দুয়ারের অদূর দক্ষিণ পশ্চিমে 'শাহ্ গরিব কামাল' নামে এক পীর সমাহিত রয়েছেন। এই পীর আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে অথবা তার পূর্বে বিদ্যমান ছিলেন । পীর শাহ গরিব কামালের যোগবল এবং ধর্মপ্রচার সম্পর্কেঅলৌকিক বৃত্তান্ত কোচবিহারে আজ জনশ্রুতি।'' [৫৭]

দেবদেউল - দরগা, থান-পাট

ভূমিকা ঃ

জেলার লোকায়ত সমাজে আচার অনুষ্ঠান, পূজা পার্বণ এখনও আন্দোলিত হয় বিভিন্ন তিথিতে এতদঞ্চলের দেবদেউল গুলির পবিত্র প্রাঙ্গণে। এক বিচিত্র ধর্মীয় মিশ্রণের ফলে এতদঞ্চলে আদিবাসী জনগণের লোকায়ত বিশ্বাসের প্রচুর উপকরণ দৃষ্ট হয় এই প্রাচীন মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে।। কোচবিহারের রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে যে ধর্মীয় বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল একদিন তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় জেলার বিভিন্ন মহকুমার প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে হিন্দুর মন্দির এবং মুসলমানদের মস্‌জিদ। রাজধর্ম শৈব হওয়া সত্ত্বেও ষোড়শ শতকের বৈষ্ণব আন্দোলনের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে মহারাজাগণ হয়ে ওঠেন বৈষ্ণবভাবাপন্ন। জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠে সত্র - প্রতিষ্ঠান। যার ফলশ্রুতিতে আমরা দেখি এতদঞ্চলে শাক্ত বৈষ্ণবের সহাবস্থান। জেলা সদরের সকল মহকুমাতেই শাক্ত ও শৈব মন্দিরের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়। যে কারণে কোচবিহারকে শৈব তীর্থ বলা হয়ে থাকে। জেলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এমন কি বিশাল ইতিহাস সৃষ্টিতে এই দেবদেউল গুলির ভূমিকা আমরা অস্বীকার করতে পারিনা। জেলার মানুষের আন্তরিক প্রয়াস ও সমকালীন রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানে মন্দির, মস্‌জিদগুলি ধর্মীয় জীবনকে করে তুলেছে বর্ণ বহুল। পথের প্রান্তে, নির্জন নদীতীরে, প্রাচীন কোন বৃক্ষতলে তারা গড়ে তুলেছে অগণিত দেবালয়। মহাকালের বিবর্তনে ভক্তের স্রোত হয়ত কমেছে, মন্দির হয়ে উঠেছে জীর্ণ ভগ্নপ্রায়, তবু সে ইতিহাস সযত্ন দৃষ্টি কেড়ে নেয় আজকের মানুষের।

কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহ থেকে মহারাজ জগদ্দীপেন্দ্র নারায়ণ পর্যন্ত (১৫২২ - ১৫৪৯খ্রী) এই রাজবংশের রাজত্বকালে নির্মিত, পুনর্নির্মিত, সংস্কৃত হয়েছে বহু দেবদেউল - দরগা।

ভৌগোলিক বিচারে কোচবিহার একটি সীমান্ত অঞ্চল হওয়ার সুবাদে এতদঞ্চলে এসেছে নানাজাতি, নানামত, নানাসংস্কৃতি ও নানাধর্ম। কোচবিহারের রাজবংশ ধর্মের দিক থেকে শৈব। এক সময় এই অঞ্চলটি তন্ত্রের পীঠস্থান ছিল। বৌদ্ধ প্রভাব কাজ করেছে অনেক ।

নদীপ্রধান এতদঞ্চলে অতি প্রাচীনকালের তেমন কোন দেবদেউল দৃষ্ট হয় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের ফলে ধ্বংস হয়েছে অনেক দেবদেউল। ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল হওয়ার সুবাদে বাঁশ, খড়, মাটির দেওয়াল ও টিনেরচাল ছিল

একাধিক মন্দিরের উপকরণ। সম্ভবত ষোড়শ শতকের পর থেকে এখানে ইঁটের প্রচলন শুরু হয়। অনেক ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক মন্দির নির্মাণ রীতিতে মুঘল প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। জেলার পাকা দেবদেউল গুলির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল এর উপর মসজিদের অনুকরণে গম্বুজ যা কোচবিহার ব্যতীত রাজ্যের অন্য কোন জেলায় দৃষ্ট হয় না। কোন কোন মন্দিরের বাইরের দেওয়ালেও মিনারের মত অট্টালক (সরু থাম) দেখা যায়। এসবই মুসলমান সংশ্রবের কথা মনে করিয়ে দেয়। বেশীরভাগ মন্দিরই অলঙ্করণহীন এবং পোড়া মাটির কাজ নেই বললেই চলে। একমাত্র ব্যতিক্রম ধলুয়াবাড়ী শিবমন্দির।

"মহারাজা নরেন্দ্র নারায়ণ তৎকালীন দেবদেউল ও মন্দির গুলির এবং দেবোত্তর স্থাবর সম্পত্তি থেকে বাৎসরিক আয় ও ব্যয়ের সুনিশ্চিত ব্যবস্থার জন্য ১৮৬২ সনের ১৩ ই এপ্রিল থেকে প্রতিষ্ঠা করে Debutter Sherista" [৫৮] এই দেবোত্তর সেরেস্তাই পরবর্তীকালে দেবোত্তর ট্রাস্টে রূপান্তরিত হয়। ১৮৬৪ সন থেকেই তৎকালীন কোচবিহার রাজ্যের প্রথম ডেপুটি কমিশনার মিস্টার এইচ্ বেভারেজ সাহেব দেবোত্তর ট্রাস্ট আনুষ্ঠানিক ভাবে চালু করেন।

আনুমানিক খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরুতেই পশ্চিম কামরূপে ইসলাম ধর্মের যে প্রচার আরম্ভ হয়েছিল সেই সুবাদেই বহু ইসলাম ধর্মাবলম্বী সাধুসন্ন্যাসীর আগমন ঘটে এতদঞ্চলে। তাই ইসলাম ধর্মের প্রভাব এই জেলায় দীর্ঘদিনের। বর্তমান কোচবিহারের জনসংখ্যার একটি বিরাট অংশ মুসলিম। তাই মন্দির বা দেবদেউলের পাশাপাশি দরগাহ, ধাম, মাজার প্রভৃতিও উল্লেখযোগ্য। জেলার পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে জেলা সদরের তোর্ষাপীর ধাম,ধলুয়াবাড়ীর শাহপীরের দরগা, শীতলকুচির শাহগরীব কামালের দরগা, হলদিবাড়ীর হুজুর একরামূল হকের দরগা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রসঙ্গত বলা যায় কোচবিহার রাজ্যের পূর্বতন রাজাগণ বংশানুক্রমিকভাবে হিন্দু বা ব্রাহ্ম হওয়া সত্ত্বও মুসলিম ধর্মের প্রচার প্রসারের জন্য অর্থ ও পীরপাল জমি দান করতেন।

মদনমোহন মন্দির ঃ

কোচবিহার জেলার উল্লেখযোগ্য দেবদেউল গুলির মধ্যে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত মদনমোহন মন্দিরটি শুধু কোচবিহারের মানুষের কাছেই নয়, সমগ্র উত্তর - পূর্ব ভারতের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক দিকচিহ্ন রূপে পরিচিত। কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের সময় পর্যন্ত কোচবিহারের রাজধর্ম ছিল শাক্ত এবং দেবী দুর্গা বা ভবানী ছিলেন এই রাজবংশের কুলদেবতা। রাজধর্ম যে শাক্ত হবে এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক তথ্যের বিচারে বলা যায় পরবর্তী কালে ষোড়শ শতকে মহারাজা বিশ্বসিংহের দ্বিতীয় পুত্র মহারাজা নরনারায়ণই প্রথম কুলদেবতা হিসেবে মদনমোহন গোপীবল্লভ জীউরকে প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন ভারতের ভক্তি আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, আসাম ও বাংলার মহাপুরুষীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবর্তক শ্রীমন্ত শঙ্করদেব কর্তৃক। মহারাজা নরনারায়ণ শুধু এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেই ক্ষান্ত ছিলেন না। তিনি ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা শুক্লধ্বজ বা চিলারায়, পরবর্তী কালে লক্ষ্মীনারায়ণ ও প্রাণনারায়ণ একশরণ বৈষ্ণবধর্মের প্রবর্তক শঙ্করদেব ও তাঁর শিষ্য মাধবদেব ও দামোদর দেবকে একাধিক সত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সহায়তা করেছিলেন। জয়নাথ মুন্সী তাঁর 'রাজোপাখ্যান' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "মহারাজা রূপ নারায়ণ (১৭০৪ - ১৭১৭ খ্রীঃ) মদনমোহনের অপূর্ব মূর্তি প্রকাশ করে তাঁর সেবার ব্যবস্থা করে দেন" [৫৯] কোচবিহারের জনশ্রুতি শঙ্করদেবের পরামর্শে মহারাজ নরনারায়ণ যে বিষ্ণুমূর্তি স্থাপন করেন সেই মূর্তিই মদনমোহন ঠাকুর (মদনমোহনের সেই মূর্তি বর্তমানে নেই)। মদনমোহন ঠাকুর এখানে একাকী পূজিত হন। শঙ্করপন্থী বৈষ্ণবগণের মতে নারায়ণের সঙ্গে তাঁর শক্তিরূপিনী লক্ষ্মী বা রাধার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। এই ধ্যান ধারণায় বলা হয় কৃষ্ণের মধ্যেই রাধা বিলীয়মান, সেই থেকে আজ পর্যন্ত কোচবিহারের মদনমোহন একাকী পূজিত হন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'আলমগীরনামা' গ্রন্থে এবং স্টুয়ার্ট সাহেবের ইতিহাস গ্রন্থেও কোচবিহারের অধিদেবতার এই নাম উল্লিখিত আছে। ঐতিহাসিক হরেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই মতকে সমর্থন করে বলেছেন — "Maharaja Rupnarayan profoundly versed in all religious knowledge, and became celebrated for his sanctity. He constructed an image of idol Madan Mohan and established a magnificient worship " [৬০]

অনেকে প্রাণনারায়ণকে কোচবিহারের মদন মোহন বিগ্রহের প্রতিষ্ঠাতা রূপে বর্ণনা করলেও নানা সাক্ষ্য প্রমাণে মনে হয় যে মহারাজা রূপনারায়ণই ছিলেন এর প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। "বর্তমান মদনমোহন মন্দিরটির প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে জানা যায় ১৮৮৯ - ৯০ খ্রীঃ আধুনিক কোচবিহারের রূপকার মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ বৈরাগী দীঘির উত্তরে সাতবিঘা তেরো কাঠা জমির উপর এই মন্দিরের ভিত্তি স্থাপন করেন"। [৬১] বর্তমান মন্দিরের শীর্ষদেশে এক শিলালিপিতে দেখা যায় - "বিধু বিধু সংহিত গজবিধু সম্মিত শাকমিথুনগতমিত্র। নরপনরেন্দ্রাত্মজনি নৃপেন্দ্রাহুয়নৃপতি শরণেত্রে দিনইহ দৈবত গৃহভূস্থাপিত। মকরোদাত্ম করেণ। বাস্তুকৃতোচিত রূপ্যবিনির্মিত শস্ত্রবিশেষধরেণ।"[৬২] ১২১০ফুট বেষ্টনী দৈর্ঘ্যের আয়তনে প্রাচীর ঘেরা এই দক্ষিণ মুখী প্রবেশ দ্বারের উপরেই আছে নহবত খানা। কোচবিহারের অধিকাংশ মন্দিরের মতই নৃপেন্দ্রনারায়ণ প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরেও বাংলা চার চালার অনুকরণে কার্ণিশের উপর গম্বুজ বসিয়ে নির্মিত। পাশাপাশি একাধিক ঘর থাকায় একে দালান মন্দিরের মত মনে হয়। মূল মদনমোহন মন্দিরের উপরেই সোনালীরঙের গম্বুজ আছে। তার উপর আছে পদ্ম, কলস, তাম্রপত্র ইত্যাদি। মন্দিরটির ছাদের সমতলে আছে এক বারান্দা। মূল মন্দিরের চারটি ঘরেই বহু দেবদেবীর অবস্থান। প্রধান বিগ্রহ মূল মদনমোহন ছাড়াও কষ্টি পাথরের তিনটি (বড়টি ৭৮সে.মি. ও অন্য দুটি ৪৭ সে.মি.) মূর্তি আছে। বড় মূর্তিটি রূপার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত। এছাড়াও আছে মূল মন্দিরে পাটদেবী বা দুর্গা। রাধাকৃষ্ণ ও নারায়ণ শিলা। মদনমোহন মূল মন্দিরের ডান দিকের ঘরে শ্বেতপাথরের মহাকাল মূর্তির উপর শায়িত কষ্টিপাথরের কালীমূর্তি আছে। এটি প্রায় দুই ফুট উঁচু। মন্দিরের বামপাশে আছে অষ্টধাতুর জয়তারা অন্নপূর্ণা, কাত্যায়নী, মঙ্গলচন্ডীর মূর্তি। প্রতিবছর রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে এই মদনমোহনকে কেন্দ্র করে ১৫ দিন ব্যাপী এক মেলাও বসে। পূজা ও রক্ষণা বেক্ষণের পূর্ণ দায়িত্ব বর্তমানে কোচবিহারের দেবোত্তর ট্রাস্টের কর্মীদের উপরই ন্যস্ত। প্রতিদিন নিত্যপূজার আয়োজন ছাড়াও বছরের বিভিন্ন তিথি, বিশেষ করে রাসপূর্ণিমা, মদনভুঞ্জি বা বাঁশ পূর্ণিমা, রথযাত্রা এবং বিষহরি, সুবচনী, মঙ্গলচন্ডী, দোল সোয়ারী উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা ও উৎসব হয়ে থাকে। শাস্ত্রীয় দেবদেবীগণের পাশাপাশি অশাস্ত্রীয় লৌকিক দেবদেবীগণ যেমন পূজিত হন এখানে তেমনি শাক্ত বৈষ্ণবের সহাবস্থানের এক উজ্জ্বল নিদর্শন এই মন্দির।

সিদ্ধেশ্বর মন্দির ঃ

এই মন্দিরের দেবীর নামেই গ্রামের নাম সিদ্ধেশ্বরী গ্রাম। কোচবিহার সদর মহকুমার অন্তর্গত এই গ্রামটি শহর থেকে ছয় মাইল উত্তরপূর্বে অবস্থিত। জেলার অন্যতম পুরাসম্পদ এই সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। বানেশ্বর থেকে একটি কাঁচা রাস্তা সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের দিকে চলে গেছে। এই রাস্তার পাশেই সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। দক্ষিণমুখী পাকা আটকোণা ও গম্বুজ বিশিষ্ট এই সিদ্ধেশ্বরী মন্দির। উচ্চতা ৩০ফুট। এই মন্দিরের সম্মুখে আড়াই ফুট উঁচু এক পাকা চত্বর আছে। মন্দিরের দরজা ও উচ্চতা অনেকটা বানেশ্বর শিব মন্দিরের মত। মন্দিরের গর্ভগৃহে সিংহাসনের উপর অষ্টধাতুর সিদ্ধেশ্বরী দেবী উপবিষ্টা। মূর্তির উচ্চতা ১৫.৫ সে.মি., দেবী চতুর্ভুজা, শায়িত শিবরূপী মহাকালের উপর সমাসীনা। এক কথায় দেবী সিদ্ধেশ্বরী কালিকা শবরূপী শিবের উপর আসীন। তার উপরের দুই হাতে কর্তরী ও খড়গ এবং নীচের দুই হাতে কপাল বা দর্পণ ও বরাভয় প্রদায়িনী মুদ্রা। সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে এই দেবীকে কালীজ্ঞানে পূজা করা হয়। সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরের সম্মুখেই একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থানে একটি কামরাঙা গাছকে কামাখ্যা দেবী জ্ঞানে পূজা করা হয়। বৃক্ষ পূজার অতীত স্মৃতিকে এই কামাখ্যা দেবীই স্মরণ করিয়ে দেয়। আটকোণা গম্বুজ বিশিষ্ট মন্দির জেলার আর কোথাও দৃষ্ট হয় না।

বানেশ্বর শিবমন্দির ঃ

উত্তরবঙ্গের শৈব তীর্থ কোচবিহার জেলার উল্লেখযোগ্য পুরাসম্পদ বানেশ্বর গ্রামের বানেশ্বর শিবমন্দির। কোচবিহার শহর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার উত্তরে কোচবিহার আলিপুরদুয়ার পাকা রাস্তার ধারে বানেশ্বর রেল স্টেশনের পূর্ব প্রান্তে উত্তরপূর্বভারতের এক পবিত্র শৈবতীর্থ এবং দ্রষ্টব্য বানেশ্বর শিব মন্দিরটি অবস্থিত। এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে একাধিক মতবাদ ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। এর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে সমগ্র উত্তরবঙ্গের জনমানসে প্রচলিত নাম গুলি হল রাজা বান বা বানাসুর, রাজা জল্লেশ্বর, রাজা নীলাম্বর, মহারাজা নরনারায়ণ এবং প্রাণ নারায়ণ। জনশ্রুতি অনুযায়ী পৌরাণিক বান রাজা বা বানাসুরের নামেই এই শিবের নাম হয় বানেশ্বর। পশ্চিমমুখী চৌকোণাকৃতি প্রাচীন এই মন্দিরটি আজও সুদৃশ্য এবং মজবুত। মন্দিরের উপরিভাগে গম্বুজ এবং কয়েকটি কলসীর উপর একটি ত্রিশূল প্রোথিত আছে। মন্দিরের দুটি প্রবেশ পথ একটি পশ্চিমে, অন্যটি উত্তর দিকে। মন্দিরের দুই পাশে চন্ডী ও ভুবনেশ্বরী দেবীর অধিষ্ঠান। বানেশ্বরের শিব মন্দিরের

আকর্ষণীয় বস্তু হল মন্দিরসংলগ্ন এক বৃহৎ দীঘিতে বিশালাকার কচ্ছপ (পাণিমাছ) যা মোহন নামে পরিচিত। বাবা বানেশ্বর শিবের পূজার ভোগের প্রসাদ প্রথম মোহনকে দেওয়া হয়। সম্প্রতি এই দীঘি সংস্কারের সময় পদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি অষ্টধাতুর শিবমূর্তি পাওয়া যায়। মূর্তিটি বর্তমানে মন্দিরেই আছে। মন্দিরের গর্ভগৃহে বানেশ্বর শিবের গৌরীর পাটসহ কৃষ্ণবর্ণের পাথরের একটি লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। কোচবিহারের ইতিহাসকার খান চৌধুরী আমানতুল্লা সাহেব তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন রিপুঞ্জয় দাস স্বরচিত বংশাবলীতে লিখেছেন যে "মহারাজ নরনারায়ণ কোচবিহার রাজ্যে বানেশ্বর শিব মন্দির স্থাপন করে ঐ অঞ্চলের নাম রেখেছিলেন 'গের্দ্দসাগুারা' মতান্তরে পুরাণে প্রসিদ্ধ বানাসুর নিজের নামে এই শিব স্থাপন করেছিলেন।" [৬৩] দুর্গাদাস মজুমদারের মতে "১৬৬৫ সাল নাগাদ মহারাজা প্রাণ নারায়ণ বানেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।"[৬৪]

বানেশ্বর শিবমন্দির সম্পর্কে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। বর্তমানে পশ্চিমমুখী এই মন্দিরের গর্ভগৃহে শিবলিঙ্গ ও গৌর পট প্রতিষ্ঠিত আছে। এ স্থলে পৌঁছতে হলে পশ্চিম দিকের সিঁড়ি দিয়ে প্রায় দশ ফুট (১০) নীচে নামতে হয়। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পের ফলে এই মন্দির সামান্য পূর্ব দিকে হেলানো। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য এই শিবমন্দিরটির উচ্চতা ৩৫ ফুট দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ৩১ ফুট এবং এর দেওয়াল ৮ফুট পুরু। পার্বত্য ত্রিপুরা অঞ্চলের মত মন্দিরের পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়াল চারটি সমান্তরাল পাটির মত অলঙ্করণ আছে। চালের নীচের অলঙ্করণ সামান্য বাঁকা। সামনে ও দুপাশের দেওয়াল অল্প উদ্‌গত নবরথ অলঙ্করণ আছে। মন্দিরের ভিতরের গাঁথনী ও অলঙ্করণ সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মন্দিরের উপরিভাগের গ্রীবার উপর অবস্থিত গোলাকার গম্বুজ, পদ্ম, আমলক, কলস ও ত্রিশূল স্থাপন করা আছে। মন্দিরের সম্মুখস্থ বিশাল চত্বরটি বাৎসরিক পূজা ও উৎসবে নাটমন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নিত্যপূজা ছাড়াও শিব চতুর্দশী তিথি উপলক্ষ্যে বিশেষ পূজা, পশু, পাখি উৎসর্গ ও বলি যেমন হয় তেমনি সাতদিন ব্যাপী এক মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান পূজারী সাবর্ণ গোত্রের মৈথিলী ব্রাহ্মণ অচিন্ত্য ঠাকুর। মন্দিরের ডানপাশের উঁচু বেদীর উপর বানেশ্বর শিবের বাহন হিসেবে একটি সিমেন্টের ষাড়ের মূর্তি আছে। বানেশ্বর শিবের মূল মন্দিরের উত্তরপাশে একটি টিনের চারচালা মন্দিরে শিব ও অর্ধনারীশ্বরের পিতলের মূর্তি পূজিত হয়। এই শিবের বাম পাশে পদ্মাসনে উপবিষ্ট অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটি (২৯সে.মি. ২৭ সে.মি.) এবং এই মূর্তির ডান অঙ্গটি শিবের ও বাম অঙ্গটি পার্বতীর। ধর্মীয় ও সামাজিক দিক থেকে সীমান্তবর্তী আসাম ও বাংলার যোগসূত্র সৃষ্টিতে কোচবিহারের বানেশ্বর শিব মন্দির এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। বানাসুরের বানেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা এবং বংতী নদী সৃষ্টির কাহিনী কোচবিহারে বহুল প্রচলিত। জেলাশহরে অসংখ্য শিবমন্দির থাকলেও উত্তরবঙ্গের শীর্ষস্থানীয় জল্পেশ শিব মন্দিরের পাশাপাশি বানেশ্বর শিবমন্দির পুরাকীর্তি ও দেবদেউলের ইতিহাসে একটি উল্লেখযোগ্য নাম। বানেশ্বর শিব মন্দির প্রাঙ্গণে অনার্য ও তান্ত্রিক পদ্ধতিতে পায়রা ও খাসি বলি ও উৎসর্গ (ঘার মুচড়ে এবং খিল ঠুকে) একটি বিস্ময়কর ঘটনা। শিবচতুর্দশীর দিন চার প্রহরে চারবার সাড়ম্বরে আনুষ্ঠানিক পূজা, হোম, যজ্ঞ হয়। বানেশ্বর শিবের ভোগ ও বলি প্রদানকে এতদঞ্চলে আসুরিক প্রথাও বলা হয়।

বড়দেবী মন্দির ঃ

কোচবিহার শহরের সাগরদীঘির পশ্চিম প্রান্তে দেবীবাড়ী নামক একটি পল্লীতে বড়দেবী মন্দিরের অবস্থান। মণ্ডপ বিশিষ্ট পশ্চিমমুখী এই মন্দিরে কোন স্থায়ী মূর্তি নেই। বড়দেবীর এই মন্দিরই কোচবিহারের দেবীবাড়ী নামে সর্বত্র পরিচিত। দেবী দুর্গা বা ভবানীকেই এখানে বড়দেবী বলা হয়। প্রতিবছর শারদীয়া দুর্গাপূজার সময় দেবীর মাটির মূর্তি গড়ে পশ্চিমমুখী উঁচু এই স্থায়ী দেবালয়ে পূজার অনুষ্ঠান হয়। প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু এবং আটটি করিন্থিয়ান পিলার এবং মণ্ডপের উপর বড় গম্বুজ সবার দৃষ্টি আর্কষণ করে। একে অনেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় স্থাপত্যের প্রভাব বলে মনে করেন। এই মন্দিরে ছাদের কার্নিশের নীচে পেডিমেন্ট জাতীয় একটি তিনকোণা অলঙ্করণ দেখা যায়। গম্বুজের চারপাশে সমতল ছাদটি লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। শুরুতে নাকি খড়ের ঘরে পূজা হত। তখন ওই ঘরে প্রোথিত হত উড়ুন কাঠের খুঁটি যার নাম দেওপোয়া। আজ আর খড়ের ঘর নেই, বড়দেবীর পাকা মন্দির, কিন্তু দেওপোয়া পূজার প্রচলন আজও অক্ষুন্ন আছে।

সিদ্ধনাথ শিবমন্দির ঃ

জেলা সদর থেকে কোচবিহার দিনহাটা সড়ক পথে ছয় কিলোমিটার দূরত্বে ধলুয়াবাড়ী গ্রামে এই মন্দির অবস্থিত।

পাকা সড়ক থেকে দক্ষিণমুখী এবং পঞ্চরত্ন পোড়ামাটির ফলকযুক্ত সুদৃশ্য এই শিবমন্দিরের অবস্থান। এই মন্দিরটির বাঁকানো চালের উপর চারকোণে চারটি রত্ন আছে। পোড়ামাটির ফলক এবং গম্বুজাকৃতির রত্ন ছাড়া এই মন্দিরটির বৈশিষ্ট্য হল, এর দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের বাইরের দেওয়াল পোড়ামাটির অলঙ্করণ। পুরাতত্ত্ববিদ মাধোস্বরূপ বৎসের মতে এই মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীতে মুসলিম প্রভাব দেখা যায়। মন্দিরের পশ্চিমদিকের দেওয়াল ৯(নয়) ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মিহিরাবের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়। "অষ্টাদশ শতকে কোচবিহারের সাময়িক মুসলিম আধিপত্যের সময়ে মন্দিরটিকে মসজিদে রূপান্তরিত করার চেষ্টা হয়েছে বলে অনেকে মনে করেন।"[৬৬] মন্দিরের সম্মুখস্থ দেওয়ালের বহির্ভাগে হিন্দুধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু ক্ষয়িষ্ণু পোড়ামাটির মূর্তি দেখা যায়। দক্ষিণমুখী ইষ্টক নির্মিত এই মন্দিরের সামনের দেওয়ালে খাঁচকাটা খোপে বহু পোড়ামাটির ফলক যুক্ত আছে। কালের বিবর্তনে এর কিছুটা ভগ্ন প্রাপ্ত। অনেকগুলিতে দশাবতার পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি, নর্তকী ও লতাপাতার অলঙ্করণে সজ্জিত।

বৈকণ্ঠপুর দামোদর দেবের ধাম ঃ

শঙ্করদেবের ভাবশিষ্য দামোদর দেব গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে কোচ রাজ্যে মহারাজা লক্ষ্মীনারায়ণের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তৎকালীন কোচরাজ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও প্রসার কল্পে ধর্মপ্রাণ মাহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারের উত্তরপূর্ব প্রান্তে এক নির্জন স্থানে তাঁর বাসস্থান ও সত্র তৈরী করে দেন। পরবর্তী কালে এই স্থানের নাম হয় বৈকুণ্ঠপুর দামোদর দেবের ধাম ও সত্র।

"পরম আনন্দে রাজা নানা অর্চা করি
বৈকুণ্ঠপুরত থান দিলন্ত সাদরি।" [৬৫]

এই দামোদর দেবের অনুরোধেই মহারাজ লক্ষ্মীনারায়ণের রাজত্বকালে কোচরাজ্যে সমসাময়িক বিভিন্ন পূজাপার্বণে পশুবলি নিষিদ্ধ ছিল। সাত বছর কোচরাজ্যে অবস্থান করার পর এক শতদশ (১১০) বছর বয়সে ১৫৪৮ খ্রীঃ দামোদর দেবের মহাপ্রয়াণ ঘটে এই স্থানে।

এই দেবস্থানটির বর্তমান রূপ হল চার চালা টিনের ঘর ও টিনের বেড়া। মাটির বেদীতে কৃষ্ণ বলরামের মূর্তি। একদিন কোচবিহারের রায়কত পদাধিকারী মন্ত্রীদের বাসছিল এই বৈকুণ্ঠপুর ধামে। বর্তমান সত্রের গর্ভগৃহে দামোদর দেবের পাদুকা রক্ষিত আছে। শুধুমাত্র দামোদর দেবের তিথি অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লা প্রতি পদে এবং ফাল্গুনের শুক্লা দশমী তিথিতে এই পাদুকা ভক্তগণ দর্শন করতে পারেন।

কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির ঃ

কোচবিহার জেলার পুরাকীর্তি ও দেবদেউলের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ও শ্রেষ্ঠমন্দির হল দিনহাটা মহকুমার গোঁসানীমারী বা ভিতর কামতা মৌজার অন্তর্গত কামতেশ্বরী দেবীর মন্দির। দেবী এখানে মূলত মূর্তিবিহীন লৌকিক দেবী। উত্তরবঙ্গ ও আসামের জন মানসে গোসানীদেবী নামেও পরিচিত। এই দেবীর অলৌকিক কর্মকাণ্ড ও বৃত্তান্ত গোঁসানীমঙ্গল কাব্যগ্রন্থে বর্ণিত আছে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে খেন বংশীয় রাজা নীলধ্বজ কামতা রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কামদা বা কামতা দেবী তাঁর উপাস্য দেবী ছিলেন। দেবীর নামানুসারে রাজ্যের নাম রাখেন কামতা রাজ্য এবং রাজধানীর নাম করণ করেন কামতাপুর। এতদ্‌ঞ্চলের সাধারণ মানুষ এই দেবীকে গোস্বামিনী বা সর্বাধিশ্বরী বা গোঁসানা নামে অভিহিত করেন। এই জন্যই পরবর্তী কালে কামতাপুর গোসানীমারী নামেও পরিচিত। বর্তমানে গোসানীমারীতে কামতেশ্বরী বা ভবানীদেবীর যে মন্দির দেখা যায় সেটি কোচবিহার রাজ্যের চতুর্থ রাজা প্রাণ নারায়ণ কতৃক ১৬৬৫ খ্রীঃ নির্মিত। ১৬৬১ খ্রীঃ মীরজুমলা কোচবিহার রাজ্য আক্রমণ করে যখন বহু মন্দির ও দেবালয় ধ্বংস করেন এটি ছিল তার অন্যতম। বিশ্বসিংহ ও নরনারায়ণ কোচবিহার ও কামরূপে যে সব মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন তার মধ্যে কামতেশ্বরী মন্দির, কামাখ্যা মন্দির, হাজোর হয়গ্রীব মাধব মন্দির উল্লেখযোগ্য।

১৮৬৫ খ্রীঃ মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণের আমলে দেবোত্তর সেরেস্তা প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই দেবীর পূজা, সেবা রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যয়ভার গ্রহণ করে উক্ত সেরেস্তা। সমগ্র উত্তর -পূর্ব ভারতের উল্লেখযোগ্য এই প্রাচীন পুরাকীর্তি সমৃদ্ধ দেবদেউলটির সম্পর্কে একটি কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। মন্দিরের বর্তমান বংশানুক্রমিক পুরোহিত সাবর্ণগোত্রের মৈথিলী ব্রাহ্মণ রূপনারায়ণ ঠাকুর। এক সাক্ষাৎকারে (৯/৫/৯৮ ইং তারিখে) তিনি জানান "এই দেবীর প্রাচীন ও অলৌকিক মাহাত্ম্য ও কোচবিহারের মানুষের অখণ্ড লোকায়ত বিশ্বাস ও ভক্তির জন্য সারাবছর ভক্ত সমাগম হলেও বৈশাখ মাসই এই মন্দিরে পূজা ও মানতের শ্রেষ্ঠ সময়।" বিশেষ করে কৃষ্ণপক্ষ, শুক্লপক্ষ, বিষুয়া সংক্রান্তি, দোল সোয়ারী, অম্বুবাচী, তালমবমী প্রভৃতি তিথিতে ভক্তপ্রাণ মানুষের সমাগম হয় বেশী। কামতেশ্বরী দেবীর মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে সিংহাসনের উপর স্থাপিত মহাদেব, নারায়ণ, গোপাল ও প্রজাপতি ব্রহ্মার বিগ্রহ স্থাপিত আছে। প্রাচীর বেষ্টিত এই দেবদেউলের প্রাঙ্গণের মধ্যেই অবস্থিত মহাদেব ও ভৈরবী মন্দির। দক্ষিণপূর্ব কোণে অবস্থিত মহাদেব ও লক্ষ্মী নারায়ণ মন্দির। দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত তারকেশ্বর শিব ও উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত উন্মুক্ত দোলমঞ্চ আজও বিদ্যমান। কোচবিহার সংক্রান্ত সবচেয়ে প্রাচীন গ্রন্থ রাজোপাখ্যানের দ্বিতীয় অধ্যায়ে উল্লেখ আছে "নরকাসুর বশিষ্ঠের অভিশাপে কামতাপুরের কামতেশ্বর নামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন।"[৬৮]

ভেলাডাঙা সত্র ঃ

মহাপুরুষ শঙ্করদেব প্রতিষ্ঠিত তৎকালীন কোচরাজ্যে প্রথম সত্র ভেলাডাঙা সত্র। ডঃ এস. এন. শর্মার মতে এই সত্র প্রতিষ্ঠা করেন মাদবদেব, ১৫৯০ - ৯৬ সনের মধ্যে। সেনাপতি চিলারায় শঙ্কর দেবের মহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নরনারায়ণের পৃষ্ঠপোষকতায় তোর্ষানদীর দক্ষিণ পশ্চিম পাড়ে এই সত্র নির্মাণ করেন। এই অঞ্চলে কিছু মৎস্যজীবীর বাস এবং তারা কলাগাছের ভেলাতে মাছ শিকারে বেরোতেন বলে এই অঞ্চলের নাম হয় ভেলাডাঙা। বিদগ্ধ অসমীয়া সাহিত্যিক উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারু তার 'কথা চরিত' গ্রন্থের ১৯৮ পৃষ্টায় উল্লেখ করেছেন "তৈতে আছে দোবাত মাছ খাব অনেক ভেলা করি। তাতে নাম জন্মিল ভেলা।"

ভেলাডাঙায় শঙ্করদেবের প্রথম আগমনের পর শঙ্করদেব তাঁর 'রাম বিজয়' নাটকটি চিলারায় কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে এই সত্রে বসেই লেখেন। ভেলাডাঙা সত্র বর্তমানে পূর্বাবস্থায় নেই। তেমনি এর প্রাচীন জৌলুসও হারিয়ে গেছে। "প্রায় এক বিঘা জমির উপর বর্তমান সত্রটির অবস্থান। সত্রের পশ্চিম প্রান্তে টিনের চালাঘরে রাজ আসনে প্রতিষ্ঠিত চতুর্ভুজ মূর্তিটির নিত্যপূজা হয়। মন্দিরের গর্ভগৃহে নরসিংহ নারায়ণ, গোপাল বলরাম, চতুর্ভুজ ও মদনমোহন বিগ্রহ আছে" [৬৬] বর্তমানে কোচবিহার দেবত্রবিভাগ থেকে বাৎসরিক অনুদান দেওয়া হয় ১২৭৫ টাকা। বর্তমান পূজারী সত্যনারায়ণ চক্রবর্তী এবং এই সত্রের মূল পৃষ্ঠপোষক শরৎচন্দ্র রায় ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এক সাক্ষাৎকারে জানান (১লা কার্তিক ১৩৯৯) শঙ্কর মাধবের স্মৃতি রক্ষার্থে আসাম সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় স্থানীয় এক ভক্তের দানকৃত জমিতে ভেলাডাঙা সত্রে এক অতিথি শালার ভিত্তি স্থাপন করা হয়।

এছাড়াও জেলা সদরের যেসকল প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী দেবদেউল গুলি সম্বৎসরে বিভিন্ন তিথি ও পবিত্র দিনে কোচবিহারের লোকজীবনকে প্রভাবিত করে সেগুলি হল ডাঙরআই ঠাকুরবাড়ী, হিরণ্যগর্ভ শিব মন্দির, অনাথনাথ শিব মন্দির, বোকালীর মঠ, হরিহর শিব মন্দির, রাজমাতা ঠাকুরবাড়ী, তুফানগঞ্জ মহকুমার দামেশ্বর ও যন্ডেশ্বের শিব মন্দির।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ কর্তৃক নির্মিত হয় উত্তরবঙ্গের প্রথম ব্রাহ্ম মন্দির। জেলার প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই নববিধান ব্রাহ্ম মন্দির উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনে সেতুবন্ধন করেছিল একদিন। যার ঐতিহাসিক স্মৃতি আজও কোচবিহারের মানুষ বিস্মৃত হননি।

শাহগরীব কামালের দরগা (দিনহাটা) ঃ

বর্তমান কামতাপুর দুর্গের বহির্ভাগে এবং বাঘ দুয়ারের নিকট দক্ষিণ পশ্চিম অংশে আনুমানিক সপ্তদশ শতাব্দীতে সমাহিত হয়েছিলেন শাহপীর গরীব কামাল। তৎকালীন কোচরাজ্যে এই পীরের যোগবল ও ধর্মপ্রচার সম্পর্কে অলৌকিক কাহিনী শোনা যায় এতদঞ্চলে। ১৮৭৭ খ্রীঃ রাজকীয় বন্দোবস্ত কাগজে একজন হিন্দু এই দরগার সেবায়েত হিসেবে নিযুক্ত

ছিলেন বলে লিখিতআছে। বর্তমানে প্রায় অস্তিত্ব বিহীন, লোকচক্ষুর আড়ালে অবস্থিত এই দরগার কথা বিশেষ দিনে বিশেষ পর্বে সবাই স্মরণ করেন।

শাহপীরের দরগা ঃ

কোচবিহারের প্রাচীন রাজধানী বর্তমান ধলুয়াবাড়ী অঞ্চলের সিদ্ধনাথ শিব মন্দিরের এক কিলোমিটার উত্তরে এই দরগার অবস্থান। এটি শাহপীরের দরগা নামে পরিচিত। কোচবিহারের প্রচলিত জনশ্রুতি, অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পীর ছিলেন ধর্মপ্রচারক এক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি। সমকালীন কোচবিহার রাজ সরকার এই দরগার ব্যয় নির্বাহের জন্য সাতাত্তর (৭৭) বিঘা জমি পীরপাল হিসেবে দান করেছিলেন। বর্তমানে এই পীরের দরগার মূল অবস্থানের কোন অস্তিত্ব নেই। কিন্তু বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা এই সমাধিস্থলে বা দরগায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আসেন ভক্তি অর্ঘ নিয়ে মানত করতে এবং মনস্কামনা পূর্ণ করতে। মুসলিম বিভিন্ন পরবে আনুষ্ঠানিক মানত ও উৎসব অনুষ্ঠিত হয় এখানে।

থান / পাট ঃ

থান বলতে আমরা সাধারণত বুঝি গ্রাম বাংলার জনমানবহীন প্রান্তরে লৌকিক বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার জন্য নির্দিষ্ট স্থানকে। 'স্থান' থেকেই 'থান' শব্দের উৎপত্তি বলা যায়। আবার পাট বলতে আমরা বুঝি নির্দিষ্ট স্থানের বা মন্দিরের গর্ভগৃহে বা মুক্তাঙ্গনের যে স্থানে দেবতার আসন স্থির হয় সেই উঁচুবেদীর আসনকেই। এরূপ থান বা পাটের বৈশিষ্ট্য হল এদের অবস্থান সব সময়ই বাসগৃহ বা লোকালয় থেকে দূরে, রাস্তার পাশে, তিনরাস্তার মোড়ে, নির্জন কোন মাঠের কোণে, কোন ঝোপঝাড় বেষ্টিত বৃক্ষতলে, নদী বা নির্জন কোন জলাশয়ের ধারে, বট, পাকুর, শেওড়া, সিজ, বেল, নিম বা জিগা বৃক্ষতলে।

গ্রামবাসীগণ বিভিন্ন দেবতার নামে ভক্তিভরে মানত করেন, পশু ও পক্ষী বলি দেন ও উৎসর্গ করেন এ সকল থান ও পাটে। কোচবিহারের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন থান ও পাটে পাঁঠা, পায়রা, ও শূকর বলি দিয়ে উৎসর্গ করার প্রচলন আছে। জেলার একাধিক গ্রামের বিভিন্ন থান ও পাটের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল সেখানে মাটির ঢিবি, বাঁশের গছা বা ঠকা, প্রস্তর বা ত্রিকোণাকৃতি শিলাখণ্ড, মাটির পাত্র, সরা, প্রদীপ, কদলীবৃক্ষ, ছলন, পোড়ামাটির বিভিন্ন মূর্তি, সর্বোপরি ত্রিকোণাকৃতি লাল নিশান থাকে। কোচবিহারের ধর্মীয় লোকজীবনে জেলার বিভিন্ন গ্রাম ঠাকুরের থানে ও পাটে নিশান ব্যবহার এক প্রাচীন ঐতিহ্য। দেবদেবীর মূর্তি পূজার প্রচলনের পূর্বে এই নিশাই ছিল এতদঞ্চলের দেবদেবীর প্রতীক। এটি প্রাচীন ভারতীয় ধর্মানুষ্ঠানেরও একটি ঐতিহ্য। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে "একেক কোম বা গোষ্ঠীর একেক পশু বা পক্ষী লাঞ্ছিত ধ্বজা, সেই ধ্বজার পূজাই বিশেষ গোষ্ঠীর বিশিষ্ট কোমগত পূজা এবং এটাই তাদের পরিচয়। দেব - দেবীর মূর্তি পূজার সঙ্গে এই পশু পক্ষী লাঞ্ছিত ধ্বজা পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন।"[৬৭]

দীর্ঘ ক্ষেত্রানুসন্ধানে আমরা দেখতে পাই সকল গ্রামেই লোকদেবতা, অপদেবতা বা দেও দেবতার স্থানগুলিতে গ্রামের মানুষ যখনই কোন অসুখ - বিসুখ, বিপদ - আপদ, খরা - বন্যা, মহামারী প্রাকৃতিক দুর্যোগের কবলে পড়েন তখনই এসে হত্যে দিয়ে মানত করে পশু পাখী ও বিভিন্ন ফলমূল উৎসর্গ করেন। W.W. Hunter সাহেব কোচবিহারের এরূপ থান ও পাটের মাহাত্ম্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন তার বিখ্যাত গ্রন্থে "Every Village has its thakur - pat the seat of its God, Where the deos or evil spirits, are supposed to reside, and whenever anything goes wrong in a family, the members make offerings there in order to appease the worth of the deo"[৬৮]

জেলায় অবস্থিত এরূপ থান বা পাটগুলি সম্বৎসরে গ্রামীণ শিশুকিশোরদের ক্রীড়ার স্থল হলেও বাৎসরিক পূজার সময় উক্ত স্থানগুলি হয়ে ওঠে ভক্তপ্রাণ মানুষের দেবস্থান। জেলার উল্লেখযোগ্য এরূপ লোকদেবতার থান বা পাটগুলি হল মাথাভাঙ্গা মহকুমার কোচবিহার মাথাভাঙ্গা সড়কের আখড়ারহাট থেকে উত্তরদক্ষিণ দিকে মাঘপালা গ্রামের রাস্তার ডান দিকে ঢেল দেবতার থান। একটি শেওড়া ও জিগা গাছের নিচেই এই দেবতার থান। এই মহকুমারই নবীনেরদোলা গ্রামে

রাস্তার ধারে আর এক ঢেল দেবতার থান আছে। যদিও এই দেবতার নাম এখানে জুড়াবান্দা ঠাকুর। এই মহকুমার আঙ্গারকাটা গ্রামের পূর্ব প্রান্তে বুড়ার পাট নামে একটি দেবস্থান আছে। এই দেবতা শিবের লৌকিক রূপ। উনিশবিঘা গ্রামে ও একটি মাসানের পাট আছে। এখানে পূজা পান ছোট ঠাকুর ও বড় ঠাকুর। জেলার দিনহাটা মহকুমার একাধিক গ্রামেও এরূপ বহু থান বা পাটের অবস্থান আছে। মহকুমার খলিসামারী এবং আলোকঝাড়ী গ্রামে শীতলা ও মাসান পাটে গ্রামবাসীগণ পাঁঠা ও পায়রা বলি দিয়ে উৎসর্গ করেন। উক্ত মহকুমার শহর সংলগ্ন উত্তরপার্শ্বস্থ প্রধান সড়কের ধারে পুটিমারী অঞ্চলে অবস্থিত বুড়িরপাট। কিশমতদশ গ্রামে একটি পাকুর ও জিগা গাছের নিচে রাস্তার ধারে অবস্থিত বাঘের দেবতা জাগ্রত ডাংধরার পাট। এখানে একটি দক্ষিণমুখি পাকা বেদী এবং কয়েকটি সিমেন্টের বাঁধানো ঢিবি পাগলাপীর, কালী ও ডাংধরার পাট হিসেবে পূজিত হন। শিমূলবাড়ী গ্রামে সুপ্রাচীন সন্ন্যাসী ঠাকুরের পাটে প্রতিবছর মাঘ, ফাল্গুন মাসে দীর্ঘ দিন ধরে সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা হয়।

জেলা সদরের অন্তর্গত গোপালপুর গ্রামে অবস্থিত গোপালের পাট। এটি রাজ আমলের প্রাচীন পাট। জেলার রাজবংশী ক্ষত্রিয় হিন্দু - মুসলিম অধ্যুষিত মরিচবাড়ি গ্রামে একটি টিনের চালাযুক্ত দেবালয়ে 'কালীর পাট' ও 'শাখাতী দেবীর' পাট আছে। শাখাতী দেবী এখানে কালীর লোকয়ত রূপ। জেলা সদরের অপর একটি লোকদেবতা অধ্যুষিত গ্রাম হল 'রুইয়ের কুঠি'। এই গ্রামের উল্লেখযোগ্য দেবস্থান হল 'কাম দেবের পাট'।

জেলার অনেক গ্রামের নামকরণ হয়েছে এ সকল লোকদেবতার থান ও পাটগুলির নামে। যেমন — তুফানগঞ্জ মহকুমার বারকোদালী - ২ নং অঞ্চলের চণ্ডীরপাট গ্রাম, জেলা সদরের গোপালপুর গ্রাম, দিনহাটা মহকুমার মাসানের পাট।

এ সকল থান ও পাটের বাইরেও অপর একধরণের দেবস্থান আছে যেগুলি ধাম নামেই সমধিক পরিচিত। মুসলিম পীরের ঐতিহ্যমণ্ডিত হয়েও তোর্ষা পীরের সমাধিস্থলের নাম 'তোর্ষাপীর ধাম'। জেলার সর্বত্রই সংশ্লিষ্ট থান ও পাটগুলিতে বিভিন্ন বৃক্ষের অবস্থান দেখে মনে হয় আদিম বৃক্ষপূজার নিদর্শন আজও বর্তমান এখানে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই এই দেবস্থানগুলির নাম হয়ে থাকে গেরাম ঠাকুরের থান বা পাট।

উত্তরপূর্ব ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, স্থাপত্য ভাস্কর্য এবং স্থান মাহাত্ম্যের দিক থেকে উল্লেখযোগ্য একটি ধাম হল, একশরণ নামধর্মের প্রবর্তক শ্রীমন্ত শঙ্করদেবের পদধূলিপূত 'মধুপুর ধাম'। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের স্মৃতি বিজড়িত এই মন্দির বা ধাম উত্তরবঙ্গ ও আসামের ধর্মীয়, সামাজিক, সংস্কার আন্দোলনের প্রতীক এবং বাংলা আসামের মেলবন্ধনে বিশাল ভূমিকা পালন করে।

প্রাচীন কোচবিহারে বিভিন্ন সময়ে ধর্ম প্রচারকগণের আবির্ভাব ঘটেছিল। যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয়েছিল কোচবিহারের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন নাথ ধর্মের প্রচারক গোরক্ষনাথ। খ্রীষ্টিয় ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম ধর্মপ্রচারক তোর্ষাপীর, শাহফকির খোন্দকার, গাজিপীর, পীর একরামূল হক ও শাহগরীব কামাল। এঁদের মধ্যে অনেকেই কোচবিহারের পবিত্র ভূমিতে দেহরক্ষা করেন এবং সেই পবিত্র স্থান গুলি জেলার উল্লেখযোগ্য পীরের দরগা ধাম নামে আজও পরিচিত।

দেবদেউল বা মন্দিরময় কোচবিহার জেলার একটি বৈশিষ্ট্য হল শাক্ত, বৈষ্ণব ও শৈব ধর্মের সহাবস্থান। শৈব সংস্কৃতি ও তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান হিসেবে শিব মন্দিরের প্রাধান্য দেখা যায় এখানে। কালের করাল গ্রাসে শীর্ণ জেলার মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চলের এই দেবদেউল বা মন্দিরগুলি আবহমান কাল ধরে জেলার কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রবাহকে অক্ষুন্ন রেখেছে। তাই অখণ্ড ধর্মীয় বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে আজও আবর্তিত হয় দেবদেউল গুলির প্রাঙ্গণে বিভিন্ন অনুষ্ঠান। জেলার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পুষ্টিসাধনেও সকল ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রতীকধর্মী মন্দির, মস্‌জিদ ও গীর্জা গুলির অবদান অনস্বীকার্য।

জেলার বিভিন্ন প্রান্তে দেবদেউল মন্দির গুলি শুধুমাত্র পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবেই নয় জেলার সমাজ সংস্কৃতির ইতিহাসও আজ এদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অমূল্য এই পুরা - সম্পদগুলির সঠিক ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ জেলার প্রাচীন

ইতিহাসকেই শুধু সমৃদ্ধ করে না বাংলার পর্যটন মানচিত্রেও সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জেলার দেবদেউল - মন্দির মসজিদ গুলির পাশাপাশি গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা থান, পাট, ধাম গুলিও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলিকে প্রকৃতপক্ষে মুক্তাঙ্গন দেবালয় বলাযায়। গোষ্ঠীবদ্ধভাবে গ্রামের মানুষ থান বা পাটের সৃষ্টি করে, গ্রামরক্ষী হিসেবে এই সব লোকদেবতাদের শ্রদ্ধাভক্তি করেন। আবার গ্রাম দেবতাগণ একেক গ্রামে একেক নামে পূজিত হন। তবে যে নামেই পূজিত হন না কেন, লৌকিক দেব - দেবীগণ এতদঞ্চলের আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের ভয় ও ভক্তির দেবতা, এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কোচবিহারের আদিবাসীগণের পূজার নিমিত্তে এই থান বা পাটগুলি কোনদিনই শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সম্ভ্রম অর্জন না করলেও লোকায়ত জীবনের প্রবহমান ধারাকে অক্ষুন্ন রেখেছে আজও।

বৃক্ষ পূজা ঃ নানা অনুষ্ঠান ঃ

ভূমিকা ঃ

নদীমাতৃক কৃষি প্রধান এই জেলায় সারা বছরই নারী ও পুরুষগণ অগণিত পালা পার্বণের অনুষ্ঠান করে থাকেন। সারাবছর জেলায় অনুষ্ঠিত প্রত্যেক পার্বণের যেমন কিছু নির্দিষ্ট আচার ও রীতি আছে তেমনি সময় ও তিথিও আছে। পার্বণ বা ব্রত অনুষ্ঠানের ব্রতীরা বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নারী। অনেক ক্ষেত্রে আবার অবিবাহিত কুমারী মেয়েদেরও প্রাধ্যান্য থাকে।

পশ্চিমবঙ্গের অনেক জেলার মত কোচবিহারের অনেক পার্বণে আল্পনা দেওয়ার রেওয়াজ আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পূর্ববঙ্গীয়দের 'পৌষ পার্বণ' এবং স্থানীয় রাজবংশীদের 'পুষুনা'। অনেক ব্রত বা পার্বণে এমন কিছু আচার পালন করা হয় যেগুলির উদ্দেশ্য অনেক ক্ষেত্রেই ঐন্দ্রজালিক এবং আদিম ভাবাপন্ন। শাস্ত্রীয় যুক্তিতর্কের বাইরে লৌকিক বিশ্বাসের ফলে উদ্ভূত অনেক পার্বণ আছে এই জেলায়। যেমন — তিস্তাবুড়ি, মেছেনীখেলার ব্রত, সুবচনী, কাত্যায়নী ব্রত, মঙ্গল চন্ডী ব্রত, নাটাই চন্ডী ব্রত, তেরা বেরা, গার্সী ব্রত, পুরুষ চালিত মদন কামের ব্রত এবং সোনারায়ের মাগন সংগ্রহের ব্রত।

কৃষি প্রধান কোচবিহারের ধত্তি পূজা একটি লোকায়ত কৃষি নির্ভর সমাজের অনুষ্ঠান। ফসলের মঙ্গল কামনায় ক্ষেতের ধারে কলাগাছের চারা রোপন করে দুধ কলা দিয়ে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। আবার গাছকে দেবতাজ্ঞানে পূজার প্রচলনও আছে এই জেলায়।

বিষুয়া, বৈশাখী, আমাতি, আষাঢ়িসেবা, ধানের ফুল আনা, গোছরপানা, গুছিদেওয়া, ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা, গমীরা, গেরাম ও বাস্তু পূজা প্রভৃতি লোকায়ত পূজা পার্বণ প্রকারান্তরে এই জেলার কৃষিপূজা বা ভূমি পূজা মাত্র। এমনি করেই বার মাসে তের পার্বণের হাত ধরে ঋতু পরিক্রমায় কৃষি কাজের স্তর ভেদে বিভিন্ন কৃত্য কোচবিহারের লোক মনে দৃঢ় ভিত্তি স্থাপন করে।

বৃক্ষ পূজা ঃ

রবীন্দ্রনাথ বৃক্ষকে পৃথিবীর 'আদি প্রাণ' বলেছিলেন। আবার পন্ডিতগণের মতে ধর্মের আদিমতম রূপ প্রকাশ পায় বৃক্ষ উপাসনাকে কেন্দ্র করে। বনবাসী মানুষের একদিন আশ্রয়স্থল ছিল এই বৃক্ষ। আত্মরক্ষা এবং জীবন জীবিকার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত ছিল গাছপালা। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুযায়ী উর্বরতা বৃদ্ধিতে সহায়ক এই বৃক্ষ মানুষের নীরব বন্ধু। শারদীয়া দুর্গা পূজায় সপ্তমী তিথিতে নবপত্রিকা পূজা অর্থাৎ যে নয়টি বৃক্ষের উদ্দেশ্যে পূজা উৎসর্গ করা হয় সম্পূর্ণই দেবী পুরাণ, কালীপুরাণ, দুর্গাভক্তিতরঙ্গিনী নির্দেশিত। অশ্বত্থ বা বট গাছে দেবত্ব আরোপের ঘটনা শুধুমাত্র লোকায়ত বিশ্বাসের ফল নয়। ভারতের আপামর জনসাধারণের মত প্রাচীন কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ধর্মীয় বিশ্বাসে এতদঞ্চলের লোকজীবনও আপ্লুত। কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়, মেচ, রাভা ও অন্যান্য উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধর্মীয় বিভিন্ন উপলক্ষ্যে সম্বৎসরের বিভিন্ন সময়ে বৃক্ষ পূজার বৈচিত্র্যমূলক নিদর্শন দেখা যায়। শারদীয়া দুর্গা পূজার কলাবউ যেমন সম্মানিত ও পূজিত তেমনি রাজবংশী সম্প্রদায়ের ধান্য রোপনের গোছরপানা বা গচি বোনা অনুষ্ঠানেও কলা গাছকে দেবতার প্রতীক হিসেবেই পূজা

করা হয়। এই পূজার বিস্তারিত বর্ণনা অন্য অধ্যায়ে থাকবে। এই পূজায় পাট ও কচু গাছ একটি উল্লেখযোগ্য উপকরণ।

জেলার পাঁচটি মহকুমায় প্রায় সকল গ্রামের কৃষিজীবী মানুষ বছরের বিভিন্ন সময়ে যে উল্লেখযোগ্য বৃক্ষ দেবতার পূজা করেন সেগুলি হল - ১) জুরা বান্ধা ঠাকুর, ২) জিগা গাছ পূজা ও সই পাতানো, ৩) বট পাকুরের বিবাহ দান, ৪) চৈত্র বৈশাখ মাসে মদন ভুঞ্জি তিথিতে বাঁশ পূজা, ৫) রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে চড়ক পূজা বা গমীরা খেলার শুরুতেই শিশু ও শিমূল বৃক্ষ পূজা, ৬) জেলা সদরের সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের সিদ্ধেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে কামরাঙ্গা বৃক্ষ পূজা উল্লেখযোগ্য।

সমাজ বিজ্ঞানী J.G. Frazer তাঁর Golden Bough গ্রন্থে বৃক্ষ উপাসনার বিভিন্ন ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন। যেমন - বৃক্ষই বৃষ্টি ও সূর্য কিরণের উৎস "Trees or tree - spirits are believed to give rain and sunshine" [৬৯] শস্য উৎপাদনে সহায়ক, উর্বরতা বৃদ্ধির সহায়ক বৃক্ষ উপাসনার সঙ্গে মৌলিক ভাবে উপরোক্ত ধারণাগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

কোচবিহার জেলায় বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে বিশেষ করে ঢাকা, ময়মনসিংহ অঞ্চলের হিন্দু সম্প্রদায় জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীপূজায় কাঁঠাল গাছের ডাল পুঁতে পূজা করেন। পৌষ সংক্রান্তির দিন বাড়ীর উঠোনের দক্ষিণ পূর্ব কোণে জিগাগাছ পুঁতে বাস্তু পূজায় "চরু" নামক পায়েস উৎসর্গ করেন। সর্বপ্রাণবাদী স্থানীয় জন গোষ্ঠীর দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস মাসান নামক ভয়ঙ্কর লোকদেবতার আশ্রয়স্থল শেওড়া গাছ।

জেলার রাজবংশী সম্প্রদায়ের নিজস্ব কৃষ্টিতে অনুষ্ঠিত চড়ক বা গমীরা খেলায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দেখা যায় মাথাভাঙ্গা মহকুমার "চেঙ্গার খাতা, খাগরি বাড়ী" ও মেখলীগঞ্জ মহকুমার 'বানিয়ারটারী' গ্রামে। উক্ত অনুষ্ঠানের দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন সকালে প্রথমেই চড়কের উপযুক্ত শিশু ও শিমূল গাছকে বনের মধ্যে নির্বাচনের পর ছেদনের পূর্বে স্থানীয় দেওবংশী নিজস্ব মন্ত্রে পাঁঠা - পায়রা বলি দিয়ে পূজা দেন। উত্তর বঙ্গের লোক সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন কোচবিহারের বড়দেবী পূজার বিভিন্ন লোকাচার। বড় দেবী পূজার বৈশিষ্ট্য হল তাঁর শিরদাড়া তৈরী হয় ময়নাকাঠে। এই উপলক্ষ্যে পূর্বে বনের মধ্যেই পাঁঠা ও পায়রা বলি দিয়ে ময়নাগাছ কাটার অনুষ্ঠান পালন করা হত। পূজার নৈবেদ্য ছিল দুটি গোবরের পুতুল কলাপাতায় রেখে কলার খোলে দই বাতাসা, আতপচাল ফলমূল দিয়ে এই বৃক্ষ পূজা অনুষ্ঠিত হত। এই পূজাকে বড় দেবীঠাকুরাণীর যূপচ্ছেদন পূজা ও বলা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে দেবত্র ট্রাস্ট নির্দেশিত পূজার নির্ঘন্ট অনুযায়ী পূজা হয় ডাঙর আয়ী ঠাকুর বাড়ীতে। "কলার খোলে পায়েস, তেল, সিঁদুর ও বটপাতা সহ চিত্রিত একটি হাড়ির মধ্যে দাঁড় করিয়ে ময়না গাছের কান্ডটি কেটে দেবীর শির দাঁড়ার কাঠাম তৈরী করা হয়। কোচবিহারে এই পূজা বড় দেবীর কাঠাম পূজা নামে ও পরিচিত। কাঠামের মাথায় স্থানীয় চিত্রকর সম্প্রদায় কতৃক দেবীর কাল্পনিক মুখোশ পরানো হয়।" [৭০] এই ময়না কাঠ ও বড় দেবীর পূজা প্রসঙ্গে কোচবিহারের জনমনে একাধিক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

বৃক্ষ পূজা বলতে শুধু কোন বৃহৎ গাছকে পূজা করা বোঝায় না। বৃহত্তর অর্থে শস্য ও যে কোন উদ্ভিদকেও বোঝায়। "বাংলাদেশের ধান্য উপাসনা (Paddy Cult) বা ফসল কাটার অনুষ্ঠান ও পূজা (Harvest Festival) তাও বস্তুত বৃক্ষ পূজারই অন্তর্গত।" [৭১]

কোচবিহারের অন্যান্য বৃক্ষপূজা গুলি হল বট, পাকুর, অশ্বত্থ শেওড়া, সিজ, শিমূল, ধানের আড়া, জিগা গাছ প্রভৃতি। শাস্ত্রীয় পূজা পার্বণের মধ্যেও বৃক্ষ পূজার প্রচ্ছন্ন প্রতীকী আভাস আমরা দেখতে পাই।

জেলার প্রাচীন লৌকিক দেবদেবীর পূজার ইতিবৃত্তে দেখা যায় স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায় বিভিন্ন রোগ ভোগ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে মুক্তি লাভের আশায় যে সকল লৌকিক দেবদেবীর পূজা করেন তাদের মধ্যে বৃক্ষপূজা অন্যতম। এমন অনেক লোকদেবতা আছেন যাদের অবস্থান অবশ্যই হবে নির্জন কোন গ্রামে বিশেষ কোন গাছের তলায়। জেলার বারুজীবী

সম্প্রদায়ের পানের বরজের সুন্দাই পূজাও বৃক্ষ পূজারই সামিল। ভূমিলক্ষী পূজায় অবশ্যই থাকবে একটি জিগাগাছ। জেলার মেচ উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে শিকারের পূর্বে যে লৌকিক দেবী (শাল বৃক্ষকে) পূজার প্রচলন আছে তার নাম শালেশ্বরী। আবার শাল্ সিড়ি পূজাতেও শালগাছ ব্যবহৃত হয়। মদনকাম বা বাঁশপূজায় বাঁশগাছ উল্লেখযোগ্য উপকরণ।

অরণ্য সমৃদ্ধ কোচবিহার জেলার অনেক গ্রামেই একদিন পাকা রাস্তা ও বিদ্যুতের আলোর প্রচলন ছিলনা। জনবসতিহীন নির্জন রাস্তায় গ্রামের মানুষ চলা ফেরার সময় অজানা আশঙ্কায় ভীত হয়ে পড়তেন এবং এই রূপ ভীতি থেকেই কোচবিহারে এক লোকদেবতার উদ্ভব হয়েছে যার নাম জুরাবান্ধা বা ঢেল ঠাকুর। পথ চলতি নিরক্ষর গ্রামীণ মানুষ ভয় মিশ্রিত ভক্তিতে রাস্তার পাশের তেতুল, শেওড়া বা পাকুর গাছের গোড়ায় কোন দুটোবস্তুকে পেচিয়ে বা জোড়া দিয়ে ঢিল মেরে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। অনেক ক্ষেত্রে পথিকগণ কোন কাঠের টুকরো বা পাথরকে দড়ি দিয়ে বেঁধে মনস্কামনায় গাছের ডালে ঝুলিয়ে দেন। এতেই জুরাবান্ধা ঠাকুর বা ঢেল ঠাকুর সন্তুষ্ট হন বলে গ্রামের মানুষের বিশ্বাস। কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা ও দিনহাটা মহকুার, পার্শ্ববর্তী আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এই ঢেল ঠাকুরের থান দেখতে পাওয়া যায়। শুধু কোন বিশেষ সম্প্রদায়ই নয় সমগ্র গ্রামবাসী মিলিত হয়ে এই ঢেল দেবতার পূজা দেন ও মানত করেন।

কামরাঙ্গা বৃক্ষপূজা ঃ কোচবিহার জেলার পূর্ব প্রান্তে সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে দক্ষিণমুখী সিদ্ধেশ্বরী কালিকা দেবীর মন্দির। এই মন্দিরের দক্ষিণ পাশে অবস্থিত বৃক্ষ রূপিনী কামাখ্যা দেবীর স্থান। একটি প্রাচীন কামরাঙ্গা বৃক্ষই দেবীর প্রতীক এবং পীঠস্থান নামে পরিচিত। বৃক্ষটির চার পাশ উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্ঠিত এবং নীচের অংশ সম্পূর্ণ বাঁধানো। এই বাঁধানো বেদীতেই দেবীর নিত্য পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের স্থানীয় জনমানসে ভক্তি ও শ্রদ্ধায় এই গাছটি কামাখ্যা দেবী জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। জেলার বৃক্ষ পূজার লৌকিক নিদর্শন ও প্রাচীন ঐতিহ্যের স্মারক সিদ্ধেশ্বরী গ্রামের এই কামরাঙ্গা বৃক্ষ। বানেশ্বর মন্দির থেকে দেড়মাইল দক্ষিণ পূর্বে এই সিদ্ধেশ্বরী গ্রামে মহারাজা প্রাণনারায়ণ কতৃক নির্মিত এই মন্দির প্রাঙ্গণে কামরাঙ্গা বৃক্ষরূপী কামাখ্যা দেবীর পূজার ঐতিহ্য আজও বর্তমান।

জিগাগাছের সঙ্গে সই পাতানো অনুষ্ঠান ঃ ব্যক্তি-মানুষের সঙ্গে সই পাতানো বা বন্ধুত্ব স্থাপনের একাধিক লৌকিক অনুষ্ঠান কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের ঐতিহ্য। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় আরও একটি অনুষ্ঠান পালনের প্রচলন আছে তা হল জিগাগাছের সঙ্গে সই পাতানো। পূজার দিন নির্ধারিত জিগাগাছকে নারী রূপে কল্পনা করে একটি শাড়ি পরিয়ে দেওয়া হয় এবং গাছের দুটি শাখায় শাঁখা পরানো হয়। একজন স্ত্রী লোকের মাথা ও উচ্চতা অনুযায়ী গাছের দেহে সিঁদুরের ফোটা দেওয়া হয়। প্রতিবেশী বা বাড়ির স্ত্রী লোকেরাই এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন। দুধ, দই, কলা, চিনি, মুড়কি, খই ইত্যাদি এই পূজার প্রধান উপকরণ। জিগা গাছটির পাদদেশে এগুলি রেখে স্ত্রীলোকটি তার কামনা ও মনোবাঞ্ছা প্রকাশ করেন "সই জিগা তুই তো অমর। মোর ছাওয়া জন্মের পর মরি যায়। সই তুই আশীর্বাদ কর মোর ছাওয়া যেন যুগ যুগ ধরি বাঁচি থাকে।" [৭২] সাধারণত মৃত বৎসা বা বন্ধ্যা নারীরা এই পূজা বা অনুষ্ঠান করে থাকেন সন্তান কামনায়। পশু পাখীর মত বৃক্ষ -প্রজনন শক্তি উপলব্ধি করার ধর্মীয় প্রথা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে প্রচলিত আছে।

কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার রাজবংশী রমণীগণের লোকায়ত সংস্কৃতির এই ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান শুধু রাজবংশীদের মধ্যেই নয় উত্তরবঙ্গের অন্য সম্প্রদায় এমনকি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত। নির্দিষ্ট একটি গাছের সঙ্গে সখ্যতা সৃষ্টির এমন অনুষ্ঠানে স্বাভাবিকভাবেই জাতি, ধর্ম বা বর্ণের কোন প্রভাব থাকে না। অনেক ক্ষেত্রে একই গাছের সঙ্গে হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের স্ত্রী লোকই সই পাতান।

শাল শিড়ি ঃ কোচবিহার জেলায় রাজবংশী,রাভা ও মেচ জনজাতি কর্তৃক পূজিত শালশিড়ি নামক বৃক্ষ দেবতাকে শালেশ্বরী নামেও উল্লেখ করেছেন অনেকে। শালের সঙ্গে স্ত্রী শব্দ সহযোগে শালেশ্বরী নামের উদ্ভব। স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বৃক্ষ দেবতা শাল বাগানের অধিষ্টাত্রী দেবী হিসেবে পূজিত হন।

কোচবিহার জেলার রাজবংশী সম্প্রদায় এই বৃক্ষ দেবতার পূজা করলেও জলপাইগুড়ির মেচ উপজাতি সম্প্রদায়ের

মধ্যেই এর প্রচলন বেশী। অরণ্য দেবতা হিসেবে শালশিড়ির পূজা দিয়েই মেচ ও রাভাগণ শিকার যাত্রার সূচনা করতেন। দক্ষিণ বঙ্গের বনবিবির সাদৃশ্যে এই দেবতাকে স্ত্রী হিসেবেও কল্পনা করা হয়। বনের হিংস্র পশু, মানুষ ও তার গৃহ পালিত পশুর জীবনহানি যেন না ঘটায় সে জন্য এই পূজার প্রচলন। বন্য জন্তুরা যেমন ধান ও শস্য ক্ষেতের ক্ষতি সাধন করত, তেমনি মানুষ ও তার গৃহপালিত পশুরও জীবন হানি ঘটাত।
তাই গৃহপালিত পশু, শস্য ও ব্যক্তি মানুষের জীবন রক্ষার তাগিদেই কোচবিহারের রাজবংশীগণ শালশিড়ি বৃক্ষ পূজার প্রচলন করেন।

পুরুষ নিয়ন্ত্রিত এই পূজার মূল উপকরণ হল ধূপ, ধূনা, ফলমূল, দুধ, দই, আতপচাল, কলা ও একটি মাটির পুতুল। সাধারণত বৈশাখ মাসেই অধিকারী বামুন কর্তৃক এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের শালশিড়ি বৃক্ষ দেবতা এক অর্থে 'গেরাম ঠাকুর'। অনেকে মানত করে এই বৃক্ষ দেবতাকে মুরগি উৎসর্গ করেন। বিশিষ্ট সমাজ বিজ্ঞানী ডঃ চারুচন্দ্র সান্যাল তাঁর বিখ্যাত 'Rajbansis of North Bengal' গ্রন্থে শালশিড়ি বৃক্ষ দেবতাকে মহাময়ী নামে ভূষিত করেছেনএবং এই পূজার মন্ত্রে উল্লেখ করেছেন —

"শালেশ্বরী মহাময়ী, গায় গারাম
সন্ন্যাসী ঠাকুর তিসসাল গুড়ি দেবতাগণ
সহায় হন বাবা।" [৭৩]

মন্ত্রটির আক্ষরিক অর্থ হল মহাময়ী শালেশ্বরী,গারাম, সন্ন্যাসী ঠাকুর, ত্রিশাল কোটি দেবতা সকল তোমরা সহায় থাকিবেন।

বট পাকুরের বিয়া ঃ বৃক্ষ উপাসনা সমগ্র ভারবর্ষের একটি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় সংস্কৃতি। এরই সঙ্গে জড়িয়ে আছে বৃক্ষের বিবাহদান মূলক একটি লোকায়ত অনুষ্ঠান। "মহারাষ্ট্রে কোন বিবাহিত স্ত্রী লোকের স্বামী মারা গেলে বিধবা স্ত্রী লোকটিকে প্রথমে শমী বৃক্ষের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়। কারণ স্ত্রী লোকের তৃতীয় বিয়েতে কোন দোষ থাকে না।" [৭৪]

গাছের সঙ্গে গাছের বিয়ে দেওয়ার রীতি নীতি জেলার রাজবংশী সমাজের দীর্ঘ দিনের ধর্মীয় সংস্কার। বৃক্ষের বিবাহমূলক অনুষ্ঠান সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী জে. জি. ফ্রেজার সাহেব বলেছেন — "যে হেতু বৃক্ষ ও উদ্ভিদ দিগকে সজীব পদার্থ বলে ধারণা করা হয় সে হেতু স্বাভাবিক ভাবে তাদের নারী ও পুরুষ কল্পনা করা হয়ে থাকে। এরা পরস্পর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে।" [৭৫] জেলার রাজবংশী সমাজে পুত্র কামনায় অনেক বিবাহিত রমণী বট ও পাকুর গাছের বিবাহ দিয়ে থাকেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বট পাকুরের বিয়েকে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন বলেও মনে করেন।

কোচবিহারের ইন্দোমঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত সর্বপ্রাণবাদী রাভা, কোচ, মেচ ও পূর্ববঙ্গীয় নমঃশুদ্র সম্প্রদায়ের বৃক্ষ পূজা, প্রস্তর খন্ড পূজা, মাটির ঢিবি পূজা, অচেতন বস্তুর মধ্যে চেতনাময় সত্তার কল্পনা করা, পশু পূজা, নিশানপূজা সবই প্রাগৈতিহাসিক বিশ্বাস উদ্ভূত সংস্কার। কোচবিহারের লোকায়ত জীবনের প্রতিটি স্তরে আজও সচল, সক্রিয় ও বহমান এই সংস্কার। সত্যকে জীবনের উন্মুক্ত ক্ষেত্রে গ্রহণ করেই সৃষ্টি হয়েছে এখানে লোকায়ত ধর্ম। তাই শাস্ত্রীয় যুক্তি তর্কের বাইরে, ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধরা ছোঁয়ার বাইরে লোকায়ত বিশ্বাস ও স্থানীয় মানুষের আন্তরিকতার গভীরে জন্ম নিয়েছে শিব, বুড়াঠাকুর, গেরাম ঠাকুর ও অসংখ্য বৃক্ষ পূজার লোকাচার।

বাঁশ পূজা ঃ সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের রাজবংশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতিতে বাঁশ পূজার ঐতিহ্য এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। কোচবিহারে এই বাঁশ পূজাকে মদনকাম বা কামদেবের পূজা বলা হয়। 'তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ' এর মতে মদন কাম দেবের পুত্র। কালিকাপুরাণের প্রথম অধ্যায়ে উল্লেখ আছে কামদেব ব্রহ্মার মানস পুত্র। এছাড়াও বাঁশের জন্ম স্থান জল হিসেবে আসামের গোয়াল পাড়া জেলায় বাঁশকে 'ইরাজ' বলা হয়। কালিকা পুরাণ মতে মানুষকে মত্ত করার জন্য এই দেবতার নাম হয়েছে মদন। দীর্ঘ একটি বাঁশকে লালকাপড়ে সজ্জিত করে মদনদেব হিসেবে তাকে পূজা করা হয়। যেহেতু বাঁশ

এই দেবতার প্রতীক সেহেতু গোয়াল পাড়া ও কোচবিহারের সর্বত্র এই পূজার নাম বাঁশ পূজা। পূজার পূর্বে বাঁশের যে অংশটি দেবতার প্রতীক হিসেবে নির্বাচন করা হয় সে সম্পর্কে আসামের গোয়াল পাড়ার বিভিন্ন গ্রামের মত তুফানগঞ্জের বারকোদালী ও মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রামে একটি লোকসঙ্গীত প্রচলিত আছে —

"গোরখান ফেলাইল বাঁশের গুরুয়া বুলিয়া
আগাল খান ফেলাইল বাঁশের আগালী তুলিয়া
ঝিক ঝুটুলি ফেলাইক বাঁশের চেচিয়া ছিলিয়া
মধ্যখান নিল বাঁশের মদনকাম বুলিয়া।"[৭৬]

এতদঞ্চলে বাঁশপূজায় বাঁশকে দেবতায় উন্নীত করার লোকায়ত বিশ্বাস, কৃষিনির্ভর লোকায়ত জীবনে বাঁশের প্রয়োজনীয়তা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে অনুভব করেন এতদঞ্চলের মানুষ। আর সেকারণেই দেখা যায় —

(ক) আদিম যুগে জনবিরল স্থানে লোকদেবতার পূজার সময় দীর্ঘ বাঁশ নিশান সহকারে পুঁতে রাখা হত, যাতে দূর থেকে এই দেবস্থান সবাই চিনতে পারেন। পূর্বে বন থেকে তুলে আনা সাধারণ বাঁশকেই পূজা করা হত এবং দীর্ঘ বাঁশের প্রতিযোগিতাও হত।

(খ) বাঁশপূজার প্রশস্ত সময় চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী। দ্বাদশীতে হরিঠাকুর, ত্রয়োদশীতে কামদেব আর চতুর্দশীতে শিব পূজার প্রথা এতদঞ্চলে দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য, এই সূত্রধরেই চৈত্রমাসের শুক্লা ত্রয়োদশীর মদনকাম বা বাঁশ পূজা রাজবংশী সমাজের দীর্ঘ দিনের ঐতিহ্য হিসেবে চলে আসছে।

(গ) বাঁশপূজার প্রধান উপকরণ হল, চালের গুড়া, দুধ, চিনি মিশিয়ে এক প্রকার নাড়ু তৈরী করে মদন কাম রূপী বাঁশ দেবতাকে অর্ঘ্য প্রদান করা হয়। অনেক ক্ষেত্রে নাড়ুর সঙ্গে ভাং মিশিয়ে দেওয়া হয়। দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী অঞ্চলে বাঁশরূপী মদনকামের পূজার একটি গানে এঁর জন্ম সম্পর্কে শোনা যায় —

"গিরিবর বলে প্রভু শুনহ বচন
কামের পুত্র জন্ম হইল ঠাকুর মদনকাম।"

কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার বারোকোদালী ও নাককাটি গাছ গ্রাম, মাথাভাঙ্গার শিকারপুর গ্রাম, জেলা সদরের বৈকুণ্ঠপুর গ্রাম ও মাঘপালা গ্রামে বাঁশপূজার বৈশিষ্ট্য হল এই পূজার জন্য নির্দিষ্ট কোন মন্দির নেই। নির্দিষ্ট কোন নীচু জমির নির্জন স্থানে এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় রাজবংশী সমাজের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী আদিম বৃক্ষ পূজার এই নিদর্শন কোচবিহারের লোক সংস্কৃতির এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ

তিস্তাবুড়ি পূজা ঃ নদীমাতৃক কোচবিহারে নদীকে মাতৃজ্ঞানে পূজা, উপাসনা এবং সেই উপলক্ষ্যে নদী প্রশস্তি রচনা, নদীকে নারী কল্পনা করে গান রচনার (বৈদরগান) পেছনে লোকায়ত বিশ্বাস ও আঞ্চলিক সংস্কার নীরবে অন্ত সলিলা ফল্গু ধারার মত প্রবাহিত। হলদিবাড়ী, মেখলীগঞ্জের লোকায়ত জীবনে তিস্তাবুড়ির পূজা, ব্রত উদ্‌যাপন একটি কৃষি কৃত্য এবং অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। এই উপলক্ষ্যে তিস্তাবুড়ির পূজা রাজবংশী সমাজের প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতি হলেও জেলার হলদিবাড়ী ও মেখলীগঞ্জ মহকুমা ব্যতীত অন্য কোথাও এই নদী - দেবতার পূজা ও ব্রতর প্রচলন নেই। ডুয়ার্স এলাকা এবং তিস্তানদীর অববাহিকা অঞ্চল এই পূজার উৎসভূমি হলেও একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় এই পূজার প্রচলন বেশী। প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারেই ব্রতিনীরা সমবেত নাচ ও গান করেন এই পূজা চলাকালীন। হলদিবাড়ীর প্রবীণা তিস্তাবুড়ি পূজার মারেয়ানী রেবতী বালা রায় এবং দেহরা যিনি এপূজায় ছাতা ধরেন তার মতে "তিস্তাবুড়ি এখানে সাত বইনির অন্যতম।" ডঃ চারু চন্দ্র

সান্যালের মতে "এই পূজা জেলার তিস্তা নদীর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই সৃষ্টি হয়েছে।" হলদিবাড়ী ও মেখলীগঞ্জের প্রচলিত জনশ্রুতি এই যে দেবাদিদেব শিব এবং পার্বতীকে কেন্দ্র করেই মেছেনী খেলা ও গানের প্রচলন হয়েছে। জেলার এই দুটি অঞ্চলে এই পূজার সঙ্গে দুটি উপলক্ষ্য দেখা যায়। প্রথমত - বর্ষাকালে তিস্তার বিধ্বংসী বন্যায় ঘর বাড়ি, মানুষ, গরুছাগল, ক্ষেতের ফসল প্রভৃতি ধ্বংস হয় এবং প্রাণহানীও ঘটে। দ্বিতীয়ত - নদীমাতৃক উত্তরবঙ্গের মানুষ নদীকে মাতৃরূপে শ্রদ্ধা করেন, নদী এখানে জননী স্বরূপা।

সারা বৈশাখ মাসই তিস্তাবুড়ি পূজার প্রশস্ত সময়। এই পূজার উপকরণের মধ্যে দেখা যায় আতপ চাল, চিড়া বাতাসা ও ধূপকাঠি। পাঁঠা ও পায়রা বলি হয় স্বাভাবিক ভাবেই। নৈবেদ্য বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বার খোল।

তিস্তাবুড়ি পূজার শুরুতে বৃদ্ধা মারেয়ানীর নেতৃত্বে যুবতী কিশোরী মেয়েরা বাড়ি বাড়ি এবং হাট - বাজার ঘুরে মেছেনী খেলার গান গেয়ে মাগন তোলেন। বৃদ্ধা মারেয়ানীর এক হাতে থাকে সুসজ্জিত ছাতা ও অন্য হাতে থাকে একটি ফুলের সাজিতে এক খন্ড পাথর, ফুল, সিঁদুর ও তিস্তা নদীর মাটি দিয়ে তৈরী বিমূর্ত তিস্তাবুড়ি দেবী। ব্রতিনীগণ মাগন তোলার সময় সমবেত কণ্ঠে গান গায় —

"মুঠি মুঠি মোর বথুয়া শাক
ছনে মুটি মোর তিতলি পাতে
ঐনা মোরকে হে টারির চ্যাংরা
রসিয়া খোচিয়া ধরিছে মোর
গায়ের পাছরা।" [৭৭]

হলদিবাড়ীর তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রতিনী ঝর্ণা রায় ও ভারতী রায়, মারেয়ানী রেবতী বালা রায় এক সাক্ষাৎকারে (১৫/৫/৯৮ ইং) বলেন — "এই পূজার মারেয়ানী কেউ হঠাৎ হতে পারেন না। সধবা বা বিধবা যিনিই হন না কেন তাকে বংশানুক্রমিক ভাবেই আসতে হয়।" মেখলীগঞ্জের নিজতরফ গ্রাম এবং হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ামারি, বোয়ালীমারী, ডাঙ্গাপাড়া, ফিরিঙ্গি পাড়া, হেমকুমারী গ্রামে এবং জলপাইগুড়ি জেলা সংলগ্ন বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মানিকগঞ্জ গ্রামে বৈশাখ মাসের ১৫ তারিখ থেকে ব্রতিনীরা এই পূজার ব্রত শুরু করেন। পূজার সকল প্রকরণ ও লোকাচার সধবা, বিধবা যুবতী, কিশোরী মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হয়। ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায় তাঁর উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের লৌকিক দেবদেবী ও পূজা পার্বণ গ্রন্থে বলেছেন -' মেচ সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই রাজবংশীগণ এই পূজার লোকাচার গ্রহণ করেছেন।'

তিস্তাবুড়ি পূজায় ও মেছেনী খেলায় পুরুষের কোন ভূমিকা নেই। বৈশাখের শেষ দিনে এটি অনুষ্ঠিত হয়, যে কোন নদীতে (তিস্তা, পাঙ্গা) স্নান ও জলখেলা, ভেলাভাসানো হয়। সুসজ্জিত ভেলায় দুধ, দৈ, কলা, ফলমূল, বাতাসা ও প্রদীপ প্রভৃতি নৈবেদ্য দিয়ে জলে ভাসানো হয় এবং হাঁটু জলে নেমে এই পূজার মারেয়ানীকে মাঝখানে রেখে যুবতী ব্রতিনীরা জলছিটিয়ে গান করে বৃত্তাকারে নাচেন। এটি মেছেনী খেলার অন্যতম অঙ্গ। এর পর ব্রতিনীরা স্নান করে মারেয়ানীর বাড়িতে খরের চালা করে বহির্বাড়ীর পূর্ব দিকে বিমূর্ত তিস্তা বুড়ির মূর্তি তৈরী করে অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক পূজা দেন ও মানত করেন। এখানে পূজারীকে মারেয়াও বলা হয়। এই পূজার সময় মারেয়া ভক্ত বাঞ্ছা পূরণের অনেক কথা বলেন। তিস্তাবুড়ির পূজা ও মেছেনী খেলা উপলক্ষ্যে স্থানীয় রাজবংশীভাষায় একাধিক গান প্রচলিত আছে উক্ত অঞ্চলে। বিজ্ঞান ও সভ্যতার রথচক্রে জেলার প্রাচীন ও লৌকিক অনেক কৃষ্টি বিলুপ্ত হলেও জেলার এই দুটি অঞ্চলে আজও লোকসংস্কৃতির এই নিদর্শন বর্তমান।

W.W. Hunter তাঁর Statistical Account of Bengal গ্রন্থের ২৬৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেছেন — "The chief deity of the villegers is Burithakurani, The goddes of the tista"[৭৮]

বুড়ির পাট , বুড়ির থান, বুড়ি পূজা জেলার অনেক গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলেও নদীর নামের সঙ্গে এই বুড়ির নাম

যোগ হয়ে পূজার প্রচলন জেলার এই দুটি অঞ্চলেই বেশী। তিস্তাবুড়ির পূজার প্রাচীনত্ব বিচারে হান্টার সাহবের দৃষ্টান্ত বাদ দিলেও দেখা যায় ১৮০৯ খ্রী: ডঃ বুকানন হ্যামিল্টন তাঁর Account of Rangpur গ্রন্থে লিখেছেন 'ফকিরগঞ্জ থানার গ্রামবাসীদের প্রধান দেবতাও তিস্তা।'

হনুমান - নিশান ঃ

কেচবিহারের রাজবংশী ও অন্যান্য উপজাতি সমাজে নিশান বা ধ্বজা পূজা একটি প্রাচীন ধর্মীয় সংস্কার। ''দেব - দেবীর মূর্তি পূজার সঙ্গে ধ্বজা বা নিশান পূজার প্রচলন সুপ্রাচীন। দেবদেবীর মন্দিরের স্তম্ভ বা চূড়ায় উড্ডীয়মান ধ্বজা বা কেতনের পূজা খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে যেমন গরুড়, তালধ্বজ, মকর, কেতন প্রভৃতির পূজা থেকে আরম্ভ করে বর্তমানের চড়কপূজা, ধর্মপূজা, অশ্বত্থ ও অন্যান্য বৃক্ষপূজা পর্যন্ত সর্বত্রই বর্তমান। সাঁওতাল, রাজবংশী, মুন্ডা, খাসিয়া, গারো প্রভৃতি আদিবাসী কোম এবং বাঙালীর তথাকথিত অন্ত্যজ বা নিম্নস্তরের জনগণের মধ্যে কোন ধর্ম কর্ম বা পবিত্র অনুষ্ঠান ধ্বজা পূজা ছাড়া অনুষ্ঠিত হয় না বলা যায়। সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত জুড়ে ধর্মস্থান বা থানের সঙ্গে ধ্বজা পূজার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য।''[৭৯] ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের উপরোক্ত মন্তব্যকে সমর্থন করে আমরা বলতে পারি কোচবিহারের রাজবংশী, আদিবাসী কোম ও অন্ত্যজ জনসাধারণের মধ্যে ধ্বজা বা নিশান পূজার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। জেলার প্রত্যেক রাজবংশী পরিবারের গৃহস্থবাড়ীর তুলসী মঞ্চের পাশে কালী, বিষহরি, বুড়া ঠাকুরের পাশাপাশি লাল কাপড়ের ত্রিকোণাকৃতি দন্ডায়মান ধ্বজা সর্বত্রই পূজিত হন। এরূপ ক্ষেত্রে ধ্বজা বা নিশান পূজার সময় হিসেবে উক্ত সম্প্রদায় বৈশাখ মাসের প্রথম দিনটিকে পবিত্র বলে মনে করেন। উক্ত প্রথম মাসের প্রথম দিনে স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের পৌরোহিত্যে বছরের অন্যান্য স্বাভাবিক পূজার ন্যায় দুধ, দই, চিড়া, আঠিয়াকলার নৈবেদ্যে অনেক পরিবারে বলরাম, সীতা, শিব কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হনুমান ও বৈদ্যনাথ প্রমুখ দেবতাগণও পূজা পেয়ে থাকেন।

জেলার পাঁচটি মহকুমার একাধিক গ্রামাঞ্চলে ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা দেখতে পাই প্রায় সকল গ্রামের সকল রকমের মাসান ও কালী ঠাকুরানীর পাশে যেমন তুফানগঞ্জ মহকুমার দরিয়া বলরাম মূর্তির পাশে, আবার দোল সোয়ারীর মদনমোহন, মদন কামের পূজায়, হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার তিস্তাবুড়ির পূজায়, নিশান পূজিত হয়। নিশান পূজার ব্যাপক প্রচলন ও আয়োজন দেখা যায় দিনহাটা মহকুমার গোসানীমারী অঞ্চলের আলোকঝারি গ্রামের গড়কাটা মাসানের পূজা উপলক্ষ্যে।

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ২ নং অঞ্চলের চারালজানি গ্রামের মাহুতপাড়ায় পাগলাপীর ও সত্যপীরের থানে নিশান উক্ত পীরের প্রতীক হিসেবে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ভক্তি শ্রদ্ধা পান। মহরমের দিন মুসলিম তোর্ষাপীর ধামের মাজারে হিন্দু - মুসমি সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণ খই, বাতাসা ও সাদা বুটি যুক্ত ত্রিকোণাকৃতি লাল নিশান নিবেদন করেন। কোচবিহার জেলায় তোর্ষাপীরকে ভক্তি নিবেদনের এটি একটি প্রাচীন প্রথা।

আবার চৈত্র, বৈশাখ মাসের মদন চুতুর্দশী তিথিতে মদনকাম বা বাঁশ পূজার সঙ্গে নিশানকেও পূজা করা হয়। তিস্তাবুড়ি পূজার ব্রতিনীগণ হাতে রঙ - বেরঙের নিশান নিয়ে মাগন সংগ্রহ করে থাকেন। নিশান পূজার অনুষঙ্গেই কোচবিহার জেলায় হনুমান পূজার প্রচলন। আমরা হলদিবাড়ী সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ গ্রামের তিস্তাবুড়ি পূজার দেওধা বা পূজারী রেবতীবালা রায়ের বাড়ীতে কালী, মহাকাল ও বুড়াঠাকুর দেবতার সঙ্গে নিশান ও হনুমান পূজাও প্রত্যক্ষ করি। কোচবিহারের বড়দেবীর গৃহারম্ভ ও দেওপই পূজার পর হনুমান দন্ড পূজার লোকাচার দীর্ঘদিনের। বেশীরভাগক্ষেত্রেই বৈশাখ মাস কিংবা বাৎসরিক পূজার দিন নিশান পাল্টানো হয়। নিশান বা ধ্বজার অবস্থান সকল ক্ষেত্রেই তুলসী মঞ্চের দক্ষিণ দিকে হয়। জেলার রাজবংশী সমাজের বিশ্বাস এই ধ্বজা বা নিশান হনুমান দেবতার প্রতীক। ''এই সম্প্রদায়ের আরও বিশ্বাস যে ধ্বজার বংশদন্ডটির উচ্চ প্রান্তে অবস্থান করে হনুমান ঠাকুর বাড়িতে যাতে কোন উপদেবতা বা অপদেবতা প্রবেশ করে ক্ষতিসাধন করতে না পারে তার জন্য প্রহরা দিয়ে থাকেন।''[৮০]

সিতাই থানার চামটা গ্রামের ধুমদাহপাড়ের অশোকাষ্টমী মেলার মূল অরাধ্য দেবতা ষড়ভুজ হনুমান। প্রতি বছর

রাধা অষ্টমী তিথিতে বড়দেবীর যূপকাষ্ঠ বা শিড়দাঁড়া মূলমন্দিরে আনয়নের পর উড়ুন কাঠের খুঁটি পুঁতে দেওপোয়া বা দেওপই পূজার পর সাড়ম্বরে মদন মোহন বাড়ী থেকে হনুমান দন্ড বহন করে আনা হয় এবং কোচবিহারের বড়দেবীর মন্দির অভ্যন্তরে বা পার্শ্বে এই হনুমান দন্ড আনয়ন ও প্রত্যাগমন করান বংশানুক্রমিক ভাবে ''হালুয়া সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি।''[৮১]

স্বপ্নাদিষ্ট মহারাজা বিশ্বসিংহকে এক বার মহাদেব প্রসন্ন হয়ে আদেশ দেন ''রজত দ্বারা এক বানর নির্ম্মাণ করিয়া মধ্যে বানরের মস্তক ও অস্থিসকল রাখিয়া তাহা দন্ডোপরি স্থাপন করিবে। তাহারই নাম 'হনুমান দন্ড' হইবে। ছত্র ও দন্ড ভিন্ন রাজা সিদ্ধ হন না।''[৮২] আজ পর্যন্ত রাজ আমলের ঐতিহ্য মেনে কোচবিহার মদনমোহন বাড়ীতে হনুমান দন্ড রক্ষিত আছে এবং বিভিন্ন পার্বণ, বিশেষ করে দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে হনুমান দন্ড পূজা হয়ে থাকে।

কোচবিহারের বড়দেবী পূজার পূর্বে হনুমান দন্ড পূজা রাজ আমলের একটি প্রাচীন প্রথা। আজও অব্যাহত এই পূজায় এক জোড়া পায়রা ও একঘটি চাল দিয়ে বড়দেবীর পূজা প্রার্থনা করে হালুয়া সম্প্রদায়ের পুরোহিত বলেন — ''মা দুর্গা আমি পূজা দিলাম তোমরা ন্যান।''[৮৩]

ক্ষেতি লক্ষ্মী ঃ

ধান ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা বাংলার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার মিল দেখতে পাই। বঙ্গোপসাগরের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে উৎপাদিত এই শস্যই বাংলার প্রধান খাদ্যবস্তু। আবার দেখা যায় ধান চাষের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মাতৃপূজার ইতিহাস। মাতৃপূজার পীঠস্থানও বাংলা। ঐতিহাসিকদের মতে বাংলায় নবপোলিও বিপ্লবের সূচনাও হয় ধান চাষের মাধ্যমে। বাংলায় লক্ষ্মীপূজার প্রচলন হয় এই ধানচাষের সূত্র ধরেই। তাই ধানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী। এই কথা মনে রেখেই লক্ষ্মী পূজাকে এখনও কোচবিহারের কৃষি নির্ভর সমাজে খন্দপূজা বলা হয়। 'খন্দ' শব্দের আভিধানিক অর্থ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই 'ফসল' শব্দটি। কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের ক্ষেতি লক্ষ্মী, ভূমিলক্ষ্মী, ডাকলক্ষ্মী, গুছিদেওয়া রাভা সম্প্রদায়ের থান সিড়ি পূজা সবই প্রাচীন মাতৃপূজার বা খন্দ পূজার অনুষঙ্গে উক্ত বিভিন্ন নামে পূজিত হন। লক্ষ্মীর অপর নাম 'শ্রী'। কোচবিহারের রাভা উপজাতি সম্প্রদায়ের থানসিড়ি 'থান শ্রী' থেকে উদ্ভূত এবং রাভা সমাজের থান শ্রী বা লক্ষ্মীও এক লোকায়ত গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ''সৎপথ ব্রাহ্মণে প্রথম এই দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় এবং অন্যঅর্থে লক্ষ্মীকে উর্বরতার দেবীও বলা হয়।''[৮৪] ক্ষেতিলক্ষ্মী নামের মধ্যেই স্পষ্ট বোঝা যায় এই দেবী ক্ষেতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কার্তিক মাসের পূর্ণিমায় কোজাগরী লক্ষ্মী পূর্ণিমা নামে যে পূজা অনুষ্ঠিত হয় তাতে পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে মৃন্ময় মূর্তি, মাটির সরা ও পাটের মূর্তিতে পূজার প্রচলন থাকলেও কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দিন অনেকে সোলার তৈরী লক্ষ্মীর মঞ্জুষাকেও পূজা করেন। কিন্তু ক্ষেতি লক্ষ্মী পূজার লোকচার, রীতি নীতি সার্বজনীন গৃহলক্ষ্মী পূজা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কারণ এখানে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ পুরোহিতের কোন ভূমিকা থাকে না। সমগ্র কোচবিহারের রাজবংশী সমাজের মানুষ ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজাকেই আদিম লক্ষ্মী পূজা বলে মনে করেন।

কোচবিহারের ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার প্রশস্ত সময় হিসেবে ধরা হয় আশ্বিন মাসের সংক্রান্তির দিনের বৃহস্পতিবার অথবা বৃহস্পতি বারে সংক্রান্তি না পড়লে কার্তিক মাসের প্রথম দিনটিতেই এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়।কোচবিহারের লোকধর্মের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও কৃষিভিত্তিক সভ্যতার আদিম নিদর্শন ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা। সংশ্লিষ্ট উৎসবের বেশীর ভাগ দায়িত্ব গ্রহন করেন গ্রামের সচ্ছল জোতদার ও জমির মালিকগণ। এতে সহযোগিতা করেন আধিয়ার বা বর্গাদারগণ যারা সারা বছর ভূস্বামীর কৃষিকর্মে নিযুক্ত থাকেন। মেখলিগঞ্জ মহকুমার ফুলকা ডাবরি, কাশিয়াবাড়ী গ্রামের কৃষক রবীন্দ্র দাস ও শান্ত বর্মন এক সাক্ষাৎকারে (৩/১০/৯৭ইং) বলেন 'পূজার অনেক কাজের সঙ্গে তারা যুক্ত থাকলেও আর্থিক দায়ভার তাদের বহন করতে হয় না।' পূজার নির্দিষ্ট দিনে সকাল থেকেই প্রস্তুতি পর্ব চলে বহির্বাড়ীর উঠোনে টিন বা খড় দিয়ে পশ্চিমমুখী একচালা ঘর তৈরী হয়। এটাই ক্ষেতিলক্ষ্মীর মূল মণ্ডপ। পৌরোহিত্য করেন স্থানীয় অধিকারী সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ। পূজার মূল উপকরণ আতপ চাল, দুধ, দই, কলা ও চিনি প্রভৃতি কলাগাছের ঢোঙলে (খোল) নৈবেদ্য হিসেবে নিবেদন করলেও এই পূজার প্রধান সামগ্রী হল আতপ চাল, চিড়া, চিনি, দুধ, দই, কলা, বাতাসা, বাতাবিলেবু, ধূপ - ধূনা।' ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজায় কোন মৃন্ময় বা শোলার মূর্তি থাকে না। এখানে মূর্তি হিসেবে মন্ডপে অবস্থান করেন আশ্বিন কার্তিক মাসের ধানের ফুল শুদ্ধ কয়েকটি থোপ।

এই থোপ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও একটি বিশেষ রীতি বা লোকাচার আছে। যেমন এই থোপ সর্বদা হবে বিজোড় সংখ্যক, নয়, এগারো, তের প্রভৃতি। "এই পূজা প্রসঙ্গে স্থানীয় সম্প্রদায়ের বিশ্বাস বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের ভূমির প্রকৃতি অনুসারে ক্ষেতিলক্ষ্মীর প্রকৃতি ও স্বভাবে ভিন্নতা দেখা যায়। কোন কোন অঞ্চলের ক্ষেতিলক্ষ্মী দেবী জীবের রক্ত গ্রহণের জন্য লালায়িত। এরূপ কোন জীব জন্তুর রক্তদান না করলে জমির মালিকের বিপর্যয় ঘটে থাকে।" [৮৫]

বলি প্রদত্ত ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজা প্রকৃত পক্ষে একটি কৃষি কৃত্য বিশেষ। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের বিশেষ করে বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার কৃষক সম্প্রদায়ের ধান ও ধানের ফুল সংক্রান্ত বিভিন্ন লোকাচারের সঙ্গে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি অঞ্চলের এই ক্ষেতিলক্ষ্মী পূজার সাদৃশ্য দেখা যায়। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলায় এই পূজার লোকাচারে দেখা যায় পূজার দিন রাত্রি বেলা ক্ষেতে জল ছিটানো হয় এবং পাটকাঠিতে কলার ঢোঙলের (খোল) প্রদীপ বানিয়ে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হয়। কিন্তু উক্ত অঞ্চলে (বীরভূম, বাঁকুড়া) এই কৃত্যটিতে দেখা যায় ভোরবেলা ক্ষেতে, সারের গাদায়, সর বা নল গাছ পুঁতে দিতে হয় এবং সঙ্গে একটি পুঁটলিতে থাকে কাঁচা হলুদ, ওল, শালুক ডাঁটা ইত্যাদি।

যাত্রা পূজা ঃ

বিজয়া দশমী তিথিতে সাধারণত এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নবমীর দিনও এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারে দুর্গা পূজাকেও যাত্রাপূজা বলে মনে করা হয়। যাত্রা পূজার উদ্ভব সম্পর্কে শোনা যায় এই দিনটিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের কৃষকগণ হৈমন্তিক ফসলের জন্য প্রথম হলকর্ষণের সূচনা করেন। শীতের মরশুমের অর্থকরী অথচ গুরুত্বপূর্ণ ফসলের জমি তৈরীর জন্য যে হাল চালনার যাত্রা শুরু হয় সেই সুবাদেই এই পূজার নাম যাত্রা পূজা হয়েছে বলে আমরা মনে করি। এটিও একটি কৃষিকৃত্য বিশেষ অথবা Ferilitycult এর নিদর্শন। বিজয়া দশমীর দিন এই যাত্রাপূজা উপলক্ষ্যে অনেক নূতন কাজের ও সূচনা হয় এখানে। প্রাচীন কালেও যুদ্ধযাত্রা, পশুশিকার ও হলকর্ষন শুরু হত এই দিনে। কোচবিহারের কৃষকগণ মূলপূজা পর্বের শেষে আড়াই পাক হল কর্ষণ করে কৃষি কর্মের সূচনা করেন। স্থানীয় ভাষায় একে বলা হয় 'হাল পাইত্রা'।

বিষুমা পার্বণ ঃ

সমগ্র উত্তরপূর্ব ভারতের বিশেষ করে কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, আসামের গোয়াল পাড়া এবং বর্তমান বাংলাদেশের রঙপুরের ক্ষত্রীয় রাজবংশীগণ চৈত্র সংক্রান্তির দিনটিকে 'বিষুমা' স্থান ভেদে বিষুয়া পার্বণ হিসেবে পালন করেন। বাংলার সর্বত্র এই দিনটিকে মহাবিষুব বা বিষুবসংক্রান্তি বলা হয়। বিষুব থেকেই বিষুম বা বিষুয়া শব্দের উৎপত্তি বলে অনুমান করা যায়। কোচবিহারে এই পার্বণের নাম 'বিষুমা' হলেও জলপাইগুড়ি ও আসামের গোয়ালপাড়া জেলায় এই পার্বণকে বলা হয় 'বিষুয়া'। প্রাচীন কাল থেকে স্থানীয় এই ক্ষত্রিয় সমাজে 'বিষুয়া' পার্বণ পালিত হয়ে আসছে।

চৈত্র সংক্রান্তির বিষুয়া বা বিষুমা পার্বণের দিন রাজবংশী সম্প্রদায়ের বাড়ীর মানুষ সকলেই প্রত্যুষে উঠে স্নান করেন। গৃহবধূগণ বাড়ির উঠোনে ও বহির্বাড়ী ঝাড় দিয়ে গোবর জল ছিটিয়েদেন। ঐদিন অধিকারী ব্রাহ্মণ কতৃক তুলসী মঞ্চে পূজা দেওয়া হয়। গৃহপালিত পশুদেরও পরিচর্যা করা হয়। এই পার্বণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল - চিড়া, তিল, সরিষা, মটর গম, ছোলা, চাল ইত্যাদি আট রকমের ভাজা খাওয়া। এই ভাজার সঙ্গে কাঁচা পেয়াজ, রসুন, আদা, কচি আম, লবন, সরষের তেল মেখে তা সুস্বাদু করা হয়। এছাড়াও পাটপাতা, নিমপাতা, কারিপাতা ভাজা এর সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। অনেকে কিছু ভাজা হাতে বা ছোটপাত্রে নিয়ে বাড়ীর উঠোনে, ঘরের চালে ও বহির্বাড়ীতে ছিটিয়ে দেন। এই ভাজা - ভুজি খাওয়া প্রসঙ্গে কোচবিহারে প্রচলিত লোকশ্রুতি হল 'প্রথমে খাবার মুখে দিয়ে একটু চিবিয়ে ফেলে দিতে হয়। এতে সারা বছরের বিষ উদ্গীরণ হয়।' 'বিষুমা' পার্বণের অনুষঙ্গ হিসেবে কোচবিহার জেলার প্রায় সকল গ্রামেই দেখা যায় গৃহপালিত পশুর পরিচর্যা। তাই বাড়ীর কিশোর যুবকরা এই দিন হালের গরু ও গাভী বাছুর প্রভৃতিকে নদী অথবা নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে নিয়ে গিয়ে স্নান করান। শুধু কোচবিহার নয় এই পার্বণের দিন উত্তরবঙ্গের সকল ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ই দুপুরে আহারের সময় বাড়ির উঠোনের প্রতিটি ঘরের প্রবেশ পথের উপরের চালে গুজে দেন আস্ত রসুন, পেঁয়াজ এবং বিভিন্ন তেতো ও বিষাক্ত পাতা। যার মূল উদ্দেশ্য যাতে কোন অপদেবতার কু - দৃষ্টি বাড়ীতে না পড়ে।

এই পার্বণের অপর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল শিকার পর্ব। এই সম্পর্কে স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রাচীন বিশ্বাস হল তারা ক্ষত্রিয় এবং রাজবংশোদ্ভূত। প্রাচীন রাজ-রাজাদের সেই শিকারের ঐতিহ্যকে স্মরণ করেই শিকারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়েন। এটি তাদের কাছে এই পার্বণের একটি ঐতিহ্যবাহী লোকাচার।

উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় এই পার্বণের দিন জীব জন্তু শিকারের পরিবর্তে মাছ ধরার প্রথা আছে। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলাতে এই প্রথা নেই। 'বিষুয়া' পার্বণে শুধু জাগতিক মানুষই নয় এর সঙ্গে জড়িত জীবজগতের সকল বস্তুই কম - বেশী সম্পর্কিত। পার্বণের দিন শিকার পর্বে জেলার সবকটি মহকুমারই গ্রামাঞ্চলের ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় বিষুয়ার দিন দুপুর বেলা ভাজা - ভুজি, দই - চিড়া, তেতো বস্তু খাওয়ার পরেই রাজবংশী তরুণ যুবকগণ দলবদ্ধ ভাবে লাঠি সোটা, তীর - ধনুক, বল্লম নিয়ে জঙ্গল থেকে জঙ্গলে শিকারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। যদিও এক্ষেত্রে কোন বাঘ - ভাল্লুক শিকারের উদ্দেশ্য তাদের নয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার শিকারপুর গ্রামের দেবী বর্মন বলেন যে, মূল লক্ষ্য খরগোশ যাকে স্থানীয় ভাষায় 'শেশা' বলা হয়। কোন ক্ষেত্রে সেই শশক শিকার করতে না পারলে অন্ততপক্ষে একটি শৃগালকে হত্যা করতেই হবে। মোটকথা কিছু একটা শিকার করে বাড়ী ফিরতেই হবে। এই শিকার পর্বে শুধু স্থানীয় সম্প্রদায়ের যুবকগণই নন অন্যান্য হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের যুবকগণও এতে অংশ গ্রহণ করেন। কবিরত্ন শ্যামাপদ বর্মনের মতে "এই শিকার অভিযানটি প্রাচীন ক্ষত্রিয় রাজাদের কৃষ্টি ও কীর্তি রক্ষার নিয়ম হিসেবেই রাজবংশী সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে।" [৮৬] কোচবিহারের এই পার্বণ উপলক্ষ্যে পশু শিকারের পাশাপাশি মৎস্য শিকারও করা হয়। সেদিন গ্রামের কোন এক প্রান্ত থেকে শিকারের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি 'শিঙ্গা' বাজান এবং শিঙ্গার শব্দ শুনেই সবাই বুঝতে পারেন যে এখন কোন নদী বা জলাশয়ে মৎস্য শিকারে বেরোতে হবে। এতদঞ্চলে মৎস্য শিকার পর্বকে 'বাহো' বলা হয়। এই শিঙ্গার শব্দ অনুসরণ করে দলবদ্ধভাবে মানুষ 'চাক', 'ঝোকা' ও 'জাল' নিয়ে নদী বা জলাশয়ে হাজির হন। এক সময় এই জাল দিয়েই শশক ও শূকরও শিকার করা হত।

বিষুয়াপার্বণের একটি বড় শর্ত হল সেদিন রাতে আমিষ আহার করতে হয়। তাই সন্ধ্যা বা রাত্রিতে পাঁঠা বা খাসি মেরে কোথাও পারিবারিকভাবে কোথাও প্রতিবেশীদের নিয়ে মাংস- ভাত খেয়ে থাকেন। কোচবিহারে এই পার্বণের অপর প্রথা হল সারা চৈত্রমাস পর্যন্ত বারোটি মাসের নামে বারোটি কচু গাছের পাতার আটি বেঁধে রাখা হয়। সেই কচু পাতায় জমানো জলের পরিমান অনুযায়ী কোন মাসে কি পরিমাণ বৃষ্টি হতে পারে তা অনুমান করা হয়। ডঃ চারু চন্দ্র সান্যালের মতে "মেছেনী খেলার মত বিষুয়া পার্বণের বিভিন্ন লোকাচার ও সংশ্লিষ্ট সংস্কারগুলি মেচ উপজাতি কর্তৃক প্রভাবিত।" এই পার্বণের অপর এক উপলক্ষ্য হল কৃষিকাজের সরঞ্জামের পরিচর্যা করা। এর মূল উদ্দেশ্য যার সহযোগিতায় এই ক্ষত্রিয় সমাজ জীবন ও জীবিকার সংস্থান করেন তার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা। এই আচারটির সঙ্গে বিশ্বকর্মা পূজার একটি মৌলিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যক্ষ ক্ষেত্রসমীক্ষায় একটি জিনিস আমরা উপলব্ধি করতে পারি রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের কৃষি নির্ভর প্রাচীন কৃষ্টি ও সংস্কৃতির এই ঐতিহ্য আজ বিলুপ্তির পথে।

পুষনা ঃ

জেলার বার মাসে তের পার্বণের অন্যতম 'পুষনা' পার্বণ। পূর্ববঙ্গীয় হিন্দুগণ এই অনুষ্ঠানকে পৌষপার্বণ হিসেবে পালন করেন। পৌষ মাসের সংক্রান্তির দিন এই পার্বণের মূল সময়। কোচবিহারের রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজের উল্লেখযোগ্য পার্বণ হল 'পুষনা'। পূর্ববঙ্গীয় বিশেষকরে ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ফরিদপুর অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই পার্বণ উপলক্ষ্যে পিঠে ও দই - চিড়া খান। অপর পক্ষে পুষুনা পার্বণের দিন রাজবংশী রমণীগণ বিশেষ করে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা বাড়ীর উঠোন ও বহির্বাড়ী ঝাড় দিয়ে গোবরজল দিয়ে লেপামোছা করেন। সেই দিন প্রত্যুষে স্নান করে বাড়ীর দক্ষিণ - পূর্ব কোণে অবস্থিত শিব, দুর্গা, কালী, রাধাকৃষ্ণ, বলরাম, বুড়া ঠাকুর সহ তুলসী মঞ্চে পূজা দেন। সেই সময় পূজার উপকরণ হিসেবে থাকে নতুন ধানের আতপচাল, দুধ, দই, কলা ও চিনি। স্থানভেদে অনেকে নতুন ধানের তৈরী পিঠে পুলি দিয়ে গৃহ দেবতা এবং পিতৃমাতৃ কুলকে পূজা দেন। এরপর বাড়ীর সবাই, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া - প্রতিবেশী সবাইকে আমন্ত্রণ করে পিঠে খাওয়ান এবং রাত্রে কেউ ভাত খান না। পুষুনা পার্বণের সূচনা হয় নির্দিষ্ট দিনে প্রত্যুষে স্নানের মাধ্যমে। কোচবিহার ও আসামের সর্বত্রই ঐ দিন গরু বাছুরকে গা ধুইয়ে দেওয়া হয় এবং চালের গুড়ো দিয়ে কল্কির মাধ্যমে গরুর গায়ে ছাপ দিয়ে তিনটি সিঁদুরের টিপ দেওয়া হয়। গরুর গলায় ফুলের মালা পরানো হয়। শিঙ্গে মাখানো হয় তেল। তারপর ধানের পিঠে ও ধাপনা পিঠে গরুকে খাইয়ে প্রণাম করা হয়। এ সময় গোধন রক্ষাকল্পে সমগ্র উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের লোকজীবনে আর

এক লোকদেবতা সোনা রায় পূজিত হন। যিনি এতদঞ্চলের গো রক্ষক দেবতা হিসেবে মান্য। এই দেবতার পূজার মূল উদ্দেশ্যই হল যাতে বাঘ গরু বাছুর বা গৃহপালিত কোন পশুর ক্ষতি করতে না পারে। কোচবিহার ও গোয়াল পাড়া জেলায় এই প্রসঙ্গে সোনা রায়ের একটি গানে আছে — 'বাঘ না মিললে চিতিয়া পাকড়া।' কোচবিহারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকবিশ্বাস পুষুনাপার্বণ অতিক্রান্ত না হলে গোলার ধান বের করা যায় না। "পুষুনার পর ধানের মাচাতে ফুল দিয়ে নূতন কাপড় পরে ভক্তি নিবেদন সহ গোলা থেকে ধান পাড়া হয়।" [৮৭]

এই পার্বণ উপলক্ষ্যে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি অঞ্চলে দেখা যায় "পৌষ সংক্রান্তির পূর্বেই সাধারণত ধান কাটা শেষ হয়ে যায়। এই কাটাধানের আটিগুলি স্তূপিকৃত করে বাড়ীর উঠোনে রেখে দেওয়া হয়। মাঘ মাসের মধ্যেই ধান মাড়াই শেষ হয়ে যায়। এই স্তূপগুলির নাম পুঞ্জি বা পোলাই। পিঠে খাওয়ার পূর্বে স্থানীয় সম্প্রদায় প্রথম পিঠে তেল মাখানো কলাপাতা দিয়ে আবৃত করে এই পুঞ্জিতে রেখে দেন। এর অন্তর্নিহিত অর্থ পরবর্তী বছরে অধিক ফসল প্রাপ্তির কামনা।" [৮৮] কৃষি ভিত্তিক সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে আদিম যাদুবিদ্যা নির্ভর এই পার্বণ অনুষ্ঠান পুষুনা কোচবিহারের লোকধর্ম, লোক জীবন ও লোকসংস্কৃতিকে বয়ে নিয়ে চলেছে আজও। তাই এই পার্বণ শুধু কোচবিহারের নয় বাংলার লোকসংস্কৃতিরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

অম্বুবাচি / আমাতি ঃ

Fertility cult অনুযায়ী নারী ও প্রকৃতিকে অভিন্ন কল্পনার যে সংস্কার রাজবংশী ও পূর্ববঙ্গীয় হিন্দু - বিধবাদের মধ্যে আজও মজ্জাগত, অম্বুবাচি ও আমাতি এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রত -পার্বণ। ঋতুচক্রের আবর্তনে বর্ষার বারিধারায় পৃথিবী যখন বর্ষণসিক্ত হয়ে ওঠে তখন তাকে প্রথম ঋতুময়ী নারী কল্পনার আদিম সংস্কার থেকে সৃষ্টি হয়েছে অম্বুবাচি নামক ধর্মীয় কৃত্য । ঋতু কাল রজঃস্বলা নারীর জীবনে যেমন সন্তান ধারণের পক্ষে উপযুক্ত সময় ঠিক তেমনি অম্বুবাচির ঠিক পরবর্তী সময় প্রকৃতির কোলে ফসল ফলানোর পক্ষে শ্রেষ্ঠ সময় বলে মনে করা হয়। অম্বুবাচির তিনদিনের সময় কালে যে প্রচলিত বিশ্বাস দেখা যায় অর্থাৎ জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, মাটিকাটা বা গাছের কোন ফল ছেড়া কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে ট্যাবু বলে মানা হয়।

সূর্যের দক্ষিণায়নের শুরু থেকে তিনদিন এই পার্বণ জেলার সর্বত্রই পালিত হয়। বিধবাদের একাদশী পালনের উদ্ভবও এই কারণে। আসাম ও উড়িষ্যায় এই ব্রত- পার্বণের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে।

অম্বুবাচি প্রকৃতপক্ষে দেবী কামাখ্যার পূজা। এই দেবীর রজঃপ্রাপ্তির সঙ্গে এই পূজা বা পার্বণের যোগ আছে। আবার কোচবিহার রাজবংশের প্রতি কামাখ্যা দেবীর অভিশাপের কথা এতদঞ্চলে বহুশ্রুত লোকশ্রুতি। প্রাচীন এই লোকশ্রুতি শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারতের জনমানসে প্রতিষ্ঠিত। ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই বর্ষাকালীন ঋতুতে হিন্দু বিধবাগণ এই পার্বণটি পালনে অভ্যস্ত। এই অম্বুবাচি পার্বণই কোচবিহার তথা সমগ্র উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কাছে আমাতি বলে পালিত এবং পরিচিত।

জেলার হলদিবাড়ী ব্লকে জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ অভিমুখী পাকারাস্তায় মুসলমান সম্প্রদায়ের বালক বালিকাদেরও আমাতি ঠাকুরের এক লৌকিক অনুষ্ঠান করতে দেখা যায়। "হিন্দু বালক বালিকাদের মত এরাও হাটবাজার ফেরত পথচারীদের কাছ থেকে ফল, সব্জী ও পয়সা সংগ্রহ করে এবং তাদের নির্মিত মন্ডপে হিন্দুদেব - দেবীর ছবির পরিবর্তে হজরত মহম্মদ বা কোন মসজিদ বা মহরমের কোন দৃশ্য মুদ্রিত ফটো টাঙিয়ে দেয়। ব্যতিক্রম হিন্দু বালকদের মত এরা কোন পূজার আনুষ্ঠানিকতা পালন করেন না। সংগৃহীত অর্থ, সব্জী ও ফলমূল নিজেরা খেয়ে ফেলে।"[৮৯]

দুটি ভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি বসবাস করার ফলে একে অপরের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এরূপ লৌকিক অনুষ্ঠানের সৃষ্টি হয়েছে। জেলার এক মাত্র হলদিবাড়ী ব্লকেই লোকায়ত শিশুমন এরূপ অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। উত্তরবঙ্গের মালদা ও পশ্চিমদিনাজপুর জেলার রাজবংশী এবং অন্যান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে এরূপ অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকলেও

সেখানে আমাতি পার্বণের নাম 'আমৈৎ'। উক্ত দুটি জেলায় আমাতি পার্বণের দিন ঘরের বাইরের দেওয়াল গোবরের দাগ দিয়ে সাপের অনুকরণে চিত্রিত করা হয়। অনেকে এই চিত্রিত সাপের মাথায় একটি পেঁয়াজ ঝুলিয়ে দেন। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় বিধবা নারীগণ অম্বুবাচির সময় সর্পভীতি দূর করার জন্য যেমন দুধ পান করেন এখানে তেমনি গোবর দিয়ে সাপের অনুকরণে চিত্রিত করার প্রথা প্রচলিত আছে। ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের মতে অম্বুবাচি একটি প্রজননী শক্তির পূজা আর সাপ প্রজননের বিশিষ্ট প্রতীক।

কলের মাগন ঃ

কোচবিহারের বসবাসকারী ঢাকার গ্রামীন পরিবারের যুবক ও কোচবিহারের স্থানীয় যুবকগণ দলবেঁধে গ্রামে গ্রামে নগদ পয়সা, চাল, সব্জি সংগ্রহ করেন। এভাবে ৫ - ৭ দিন সংগ্রহের পর রাত্রিবেলা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বনভোজন করেন। এতে গ্রামবাসীদেরও নিমন্ত্রন করে খাওয়ান হয়। এই ব্রতমূলক অনুষ্ঠানটি হয় সাধারণত পৌষমাসে যখন অন্যান্য গ্রামে চলে চোরচুরনীর পালা। মূল অনুষ্ঠানটি হয় পৌষ সংক্রান্তির দিন। অনুষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য মাগনের দলের প্রত্যেক যুবকের হাতে থাকবে লাঠি। বাড়ির উঠোনে হাজির হয়ে মাটিতে তাল ঠুকে ঠুকে যুবকগণ গান করবে। গানের কথাগুলি অনেকটা ছড়ার মত। যেমন —

"রাম ডেকে বলে গুনের ভাইরে
লক্ষ্মণ এসো আমার কোলে
পিতা মরলে পিতা পাবো
গুনের ভাই লক্ষ্মণ মরিলে
ভাই বলিব কারে রে।" [৯০]

মেখলীগঞ্জ মহকুমার হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামে আমরা এরূপ ব্রত সদৃশ অনুষ্ঠানের সাক্ষাৎ পাই।

ব্রত অনুষ্ঠান ঃ

ভূমিকা ঃ

ব্রাত্য জনের পালিত লোকাচার মূলক অনুষ্ঠানই হল ব্রত। ব্রত - এই কথাটির মধ্যেই অনার্য সৃষ্ট একটি লোকাচারের কথা মনে হয়। একদিন এই ব্রতধারীগণ আর্যভাষিক বৈদিক সভ্যতার দ্বারা নিন্দিত হয়েছেন।

উত্তরবঙ্গের প্রান্তিক এই জেলার রাজবংশী রাভা ও পূর্ববঙ্গীয় উদ্বাস্তু অধ্যুষিত কোচবিহারের লোক জীবনের নিত্যসঙ্গী হচ্ছে এতদঞ্চলের হিন্দু বাঙালী কর্তৃক পালিত বিভিন্ন লোকাচার মূলক অনুষ্ঠান ব্রত ও পার্বণ। এই প্রসঙ্গে আমরা কোচবিহারে প্রচলিত প্রাচীন কিছু ব্রতের উল্লেখ পাই হরেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরীর লিখিত 'Cooch Behar State and its Land Revenue Settlement' গ্রন্থে।

বাংলার অন্যান্য জেলার মত কোচবিহারেও আমরা ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখতে পাই ব্রত অনুষ্ঠানের ব্রতিনীরা মূলত নারী। কোথাও যুবতী, কুমারী, বিবাহিতা নারী ও বিধবা। পিতৃ পুরুষদের কাছ থেকে পাওয়া বংশানুক্রমিকভাবে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে ব্রত অনুষ্ঠানমূলক লোকাচার। আশা ও আকাঙ্ক্ষার বা প্রত্যাশা পূরণের নিমিত্তেই বিশেষ লোকাচার ও লোক বিশ্বাস নির্ভর কিছু কৃত্য বেশ কিছু সময় ধরে পালন করার মধ্যেই নিহিত আছে এতদঞ্চলের ব্রত অনুষ্ঠানের মূল কথাটি। এছাড়াও এর ভিতর প্রকাশ পায় আদিম যাদুবিদ্যার অনেক সংস্কার। বাংলার অন্যান্য অঞ্চলের মত এখানেও মেয়েলী ব্রতের প্রাধান্য দেখা যায় বেশী। আদিম মানুষের লৌকিক ধর্মবোধকে কেন্দ্র করেই হাজার বছরের বিবর্তনে যে ব্রতের উদ্ভব ঘটেছিল তার কিছু নিদর্শন আছে এতদঞ্চলে।

লৌকিক ধর্মীয় চেতনার যে বিষয়গুলি এতদঞ্চলে ব্রত অনুষ্ঠানকে সজীব রেখেছে সেগুলি হল ব্রতের কথায় ও মন্ত্রে লোকদেবতার মূর্তি ও উপাচারে এবং আল্পনায়। প্রায় সকল ব্রতের মধ্যেই নিহিত আছে আদিম যাদু বিশ্বাস।

আধুনিক জীবন ধারার স্পর্শ জেলার কৃষি কেন্দ্রিক জনজীবনে প্রভাব বিস্তার করলেও যাইটল, কাতি, হুদুম, মাটিয়া ব্রত, মঙ্গলচন্ডী ব্রত, আমাতী ব্রত, কাত্যায়নী ব্রতের মত লোকাচার, লোকবিশ্বাস এখনও এখানে সমানভাবে প্রচলিত। কোচবিহারের প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের বিভিন্ন বয়সের রমণীগণ পালন করেন একাধিক ব্রত অনুষ্ঠান। বেশীরভাগ ব্রত অনুষ্ঠানের অবিচ্ছিন্ন অঙ্গ বা প্রধানশর্ত হল ব্রতের কথা বা কাহিনী। যদিও সব ব্রতের ক্ষেত্রে কাহিনী সমানভাবে প্রচলিত নয়।

স্থানীয় রমণীগণের জাগতিক আকাঙ্ক্ষা পুরণে কায়মনোবাক্যে পালিত ব্রত কাহিনী গুলি তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কোচবিহারের সুবচনী, যাইটল ও কাতিপূজায় রাজবংশী রমণীগণের প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা জীবনাচরণের রূপ, ভাগ্যের বিড়ম্বনা, সাফল্য ও ব্যর্থতা প্রভৃতি ব্রতের মাধ্যমে অভিব্যক্ত হয়।

কোচবিহারে প্রচলিত ব্রতগুলিকে আমরা দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি — শাস্ত্রীয় এবং অশাস্ত্রীয় বা লৌকিক। বক্ষ্যমান আলোচনায় শুধু লৌকিক ব্রত গুলিই প্রাধান্য পেয়েছে। এই লৌকিক ব্রত আবার দু রকমের। পুরুষ এবং নারী কর্তৃক পালিত ব্রত। নারী ব্রত আবার তিন রকমের কুমারী, সধবা ও বিধবা। শাস্ত্রীয় ব্রতের মধ্যে কোচবিহারে সর্বাধিক প্রচলিত শিবরাত্রির ব্রত, জন্মাষ্টমীর ব্রত, আর লৌকিক ব্রতের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কুমারী ব্রত হল কাত্যায়নী ব্রত। অপরপক্ষে সধবা মেয়েদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত সুবচনী ব্রত। সুবচনী একমাত্র ব্রত যা জেলার স্থানীয় মানুষ প্রায় সর্বত্র সমান ভাবে পালন করেন। অপরপক্ষে কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কার, বিশ্বাস ও যাদুবিদ্যার প্রতীক ধর্মী ব্রত হল হুদুম পূজার ব্রত। মেখলীগঞ্জ মহকুমার হুদুম পূজার ব্রতিনী সরোবালা, মাঘপালা গ্রামের হুদুমের ব্রতিনী নেন্দা বর্মন ও তুফানগঞ্জের মহকুমার বিলসী গ্রামের সুবচনী ব্রতের মারয়ানী ও হুদুমের ব্রতিনী পবনেশ্বরী বর্মন এক সাক্ষাৎকারে জানান "খরা ও অনাবৃষ্টির সময় বৃষ্টি কামনায় তারা এই ব্রত পালন করেন।" লোক সংস্কৃতিবিদ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে "মেয়েলী ব্রত গুলি ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ারই লৌকিক রূপ।"

সধবা রমণীগণ পালিত অপর ব্রত হল মঙ্গলচন্ডী ব্রত। অনেক অঞ্চলে হুদুম দেও পূজার ব্রতে কুমারীদের কোন অধিকার নেই। কুমারী, সধবা, বিধবা একত্রিত হয়ে জেলার মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ী অঞ্চলে বৈশাখমাসে তিস্তা বুড়ি পূজার ব্রত পালন করেন। জেলার অপর এক উল্লেখযোগ্য ব্রত হল গার্সী ব্রত। কোচবিহারে মেয়েলী ব্রতের মধ্যে একমাত্র তিস্তাবুড়ি ব্রতের মধ্যেই দেখা যায় ব্রতের শেষদিন স্নানযাত্রার যোগ। প্রসঙ্গত বলা যায় "পুণ্যলাভ, ইষ্টলাভ, পাপক্ষয় প্রভৃতির জন্য অনুষ্ঠিত ধর্ম কর্ম ধর্মানুষ্ঠান তপস্যা সংযমই হল ব্রত।" [৯১] এতদঞ্চলে বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও মাঘ মাসেই বেশীর ভাগ ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। অনেক আনুষ্ঠানিক ব্রতে নৃত্য একটি অপরিহার্য অঙ্গ। যেমন - যাইটল কাতি। কৃষির সঙ্গে সম্পর্কিত প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ব্রত হল হুদুম। গোষ্ঠীবদ্ধ আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে লৌকিক ব্রতানুষ্ঠানের অনেকগুলি আঙ্গিক দেখা যায়। যেগুলি আদিম বৃক্ষপূজারই সামিল এমন কিছু ব্রত এতদঞ্চলে প্রচলিত আছে। "গাছ পূজা আদিম সমাজের একটি অন্যতম উত্তরাধিকার।"[৯২] এর মধ্যে এমন কতকগুলি বৃক্ষ দেবতায় উন্নীত হয়েছে যাদের অন্যতম কোচবিহারের বাঁশ গাছ। মদনকামের মূল আরাধ্য দেবতাই হল এখানে বাঁশ। কোচবিহারের পাঁচটি মহকুমার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে নারী ও পুরুষ কর্তৃক পালিত ব্রতের উদ্দেশ্য গুলির মধ্যে আদিম সমাজের প্রভাব ও স্থানীয় সহজ সরল মানুষের যে কামনা বাসনাগুলি ব্যক্ত হয় যে ব্রতগুলির মধ্যে সেগুলি হল —

হুদুম দেও ব্রত ঃ কোচবিহারে বৃষ্টির দেবতা এই হুদুম দেও। কোচবিহারে পূজিত প্রাচীন এই লৌকিক দেবতাকে নগ্ন বা বিবস্ত্র দেহধারী রূপে কল্পনা করা হয়। 'নগ্ন' অর্থে 'উদাম' বা 'উহুম' হন্দে 'হ' ধ্বনি যুক্ত হয়ে হুদুম শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। আর কোচবিহারে স্থানীয় ভাষায় দেবতাকে দেও বলা হয়। এভাবে ধ্বনিগত বিবর্তনেরর ফলে সমগ্র উত্তরবঙ্গের মত কোচবিহারেও এই দেবতা 'হুদুম দেও' নামে পরিচিত।

অবিভক্ত বাংলার রঙপুর, দার্জিলিং, কোচবিহার, আসাম সীমান্তবর্তী বর্তমান গোয়াল পাড়া, ধুবড়ি জেলায় অনাবৃষ্টি ও খরার সময় রমণীগণ বিবস্ত্র অবস্থায় নৃত্যগীতের মাধমে এই ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন। রাজবংশী অধ্যুষিত বিহারের পূর্ণিয়া জেলাতেও এই পূজার প্রচলন আছে। এই ব্রত যে আদিম ও প্রাচীন তা পৃথিবীর সর্বত্র বিভিন্ন গবেষণাধর্মী গ্রন্থে লোক

সংস্কৃতিবিদ্‌গণ উল্লেখ করেছেন। "হুদুম দেও পূজা মূলত স্ত্রীলোকের অনুষ্ঠান হলেও রঙপুর জেলায় হাতে 'পেন্টি বা পেনাচি' (গরু খেদাবার লাঠি) নিয়ে বৃত্তাকারে দাঁড়িয়ে পুরুষ ব্রতীগণ গান গায় এবং সেই লাঠি দিয়ে ভূমিতে খোঁচা দেয়। একে বলা হয় পেনাচি বা পেন্টি খেলা। এটা প্রকৃতই যৌবন লীলার খেলা।" [৯৩]

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী রমণীগণের এই অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ পুরুষবর্জিত এবং গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে এই ব্রত পূজা অনুষ্ঠিত হয়। রাত্রির অন্ধকারে নির্জন স্থানে অনুষ্ঠিত এই পূজায় ঢাকিও দূর থেকে ঢাক বাজান। আদিম এই লোকায়ত সংস্কৃতির ধারা কোচবিহারে কতটা পালিত হত তা উল্লেখ করেছেন - W. W. Hunter সাহেব "A Singular relice of old superstition is the worship of the God Hundumdeo. The women of village asemble together in some distant and solitary place, no male being allowed to be present at rite." [৯৪]

দেবতার সঙ্গে ধরিত্রীর কল্পিত মিলনই হল ধরিত্রীর তৃষ্ণার্ত বুকে বৃষ্টির আবির্ভাবের পূর্ব সংকেতবাহী যাদুবিদ্যা মূলক এই অনুষ্ঠান। এই আত্মবিশ্বাসেই জেলার বিভিন্ন নির্জন প্রান্তরে বিশেষ করে মেখলীগঞ্জ মহকুমার খর খরিয়া, হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ারমারী, দিনহাটার বামনহাট ও বড় শাকদল, তুফানগঞ্জ-এর নাটাবাড়ী এবং হরিরহাট গ্রামে আজও ফাল্গুন চৈত্র মাসে রুক্ষ্ম পৃথিবীর বুকে বৃষ্টি নামানোর জন্য রাজবংশী কৃষক রমণীগণ গ্রামের নির্জন প্রান্তরে কৃষির কল্যানে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে এই ব্রত অনুষ্ঠানে মেতে ওঠেন। আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা বা শিক্ষিত কোন সংস্কারই লোকায়ত এই বিশ্বাসকে টলাতে পারেনি। পৃথিবীর অনেক দেশেই আদিম উপজাতি সমাজের নারীগণ বৃষ্টি কামনায় এরূপ অনুষ্ঠান করেন।

J. G. ফ্রেজার সাহেবও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে এরূপ বৃষ্টি কামনায় নগ্ন নৃত্যের কথা উল্লেখ করেছেন তাঁর Golden bough নামক বিখ্যাত গ্রন্থে - "A similar rain charm is resorted to some parts of India. Naked women drag plough across a field by night, while the men keep carefully out of the way, for their presence would break the spell." [৯৫]

জেলার মেখলীগঞ্জ মহকুমার কোন কোন গ্রামে মেয়েদের পরিবর্তে পুরুষরা পেন্টি খেলার অয়োজন করেন বৃষ্টি কামনায়।

বৃষ্টি কামনায় পূজা দেওয়ার রীতি পৃথিবীর বহু দেশেই প্রচলিত আছে। সূর্য কিংবা ধরিত্রীর প্রতীককে স্নান করালে পৃথিবী থেকে অনাবৃষ্টি দূর হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে লোকয়ত জীবনে এই আদিম বিশ্বাস আজও পরিদৃষ্ট হয়।

কোচবিহার জেলার দিনহাটা, মেখলীগঞ্জ, হলদিবাড়ীতে হুদুমদেও পূজায় ব্রতীদের দলে ৭/৮ জন মহিলা অংশগ্রহণ করেন। মাঝরাত্রি বিশেষ করে অমাবস্যার রাত্রি এই পূজার প্রশস্ত সময়। পূজার দিন কোন ব্রতীর বা মারোয়ানীর বাড়ীতে সবাই একত্রিত হন। পূজার স্থানটি হবে নির্জন ধানক্ষেত বা ডাবরী অর্থাৎ সম্পূর্ণ জনবসতিহীন। কোথাও কলাগাছের পাতা, আবার কোথাও গোবর দিয়ে হুদুম দেও এর মূর্তি তৈরী করে মূর্তিটি মাটিতে গেড়ে দেওয়া হয়। মাথাভাঙার শিকারপুর গ্রামে মাটি বা গোবরের বদলে একটি কলাগাছকে গেড়ে হুদুদেও কল্পনা করা হয়। এই পূজার প্রথম লোকাচার হিসেবে ব্রতিনীগণ দেহের বস্ত্র খুলে মাথারচুল এলোমেলো করে নেন। এই ভাবে এলোচুলের বিবস্ত্র রমণীগণ অভীষ্ট দেবতাকে অশ্লীল ভাষায় গাল দিতে দিতে দলবেঁধে ধানের জমি ও গৃহস্থের বাড়ীতে ঘুরে ঘুরে নৃত্যগীত পরিবেশন করেন। এই অবস্থায় ব্রতিণীগণ কখনও প্রকাশ্য রাস্তার উপর দিয়ে হেঁটে যান না। ধান ক্ষেতের আল দিয়ে চলাফেরা করেন। এই সময় একবাড়ি থেকে আর এক বাড়ি যাবার সময় যৌন আবেদন মূলক অঙ্গভঙ্গি প্রকাশ করেন আর মুখে ও - ও - ও - শব্দ করেন। ব্রতীগণ কোন বাড়ীতে প্রবেশ করার পূর্বে তাদের এই উচ্চারণের ফলে বাড়ীর পুরুষগণ বাইরে চলে যান এবং সে সময় বাড়ীতে কোন আলো জ্বলেনা। ব্রতীগণ কোন বাড়ীতে প্রবেশের মুখে যে কথাটি অবশ্যই বলেন সেটি হল — "ব্যাটা ছাওয়া লোকগুলা তোমরা পালাও পালাও"। [৯৬] এই ব্রত পূজার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল - এখানে পুরুষের প্রবেশ সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। ডঃ চারু

চন্দ্র সান্যালের মতে 'যদি কোন পুরুষ লুকিয়ে বা অন্যকোন ভাবে এই অনুষ্ঠান দেখার চেষ্টা করেন তবে একদিকে যেমন এই পূজার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে তেমনি সেই ব্যক্তিকে খুন করা হলেও তা স্বাভাবিক ঘটনা বলে বিবেচিত হবে'। এই পূজার প্রধান উপকরণ হল - একটি কলা গাছ, কোন অঞ্চলে গোবরের হুদুম মূর্তি, ফুল, মাটিরঘট, মনুয়াকলা, কাচাদই, চিড়া, স্থান ভেদে ফিঙে ও ঘুঘু পাখীর বাসা। হুদুম পূজার নৃত্য ও গীতের সময় এতদঞ্চলে বহুল প্রচলিত গানটি হল —

"হিলহিলাছে কমোরটা মোর
শির শিরাছে গাও
কোনঠে কোনা গেলে এলা
হুদুমার দেখা পাও
পাটানি খান পইড়ছে খসিয়া
আউল হইচে মোর খোপাটা
হুদুম দেখা দেও গো আসিয়া।"

জেলার কোন কোন গ্রামে, বিশেষ করে তুফানগঞ্জ মহকুমার শোলাডাঙ্গা, ভান্ডিজেলাস, নাটাবাড়ী গ্রামে "ছাম ও গাইন দিয়ে কোটা তুষ জল দিয়ে মাখা হয়। সাতবাড়ী থেকে জল নিয়ে ঐ তুষের পিঠা তৈরী করে হুদুম দেবতার প্রতীক হিসেবে কলাগাছকে উৎসর্গ করা হয়। এই পিঠা কেবলমাত্র কুমারী মেয়েরাই তৈরী করতে পারেন। মায়ের একমাত্র সন্তানই কেবলমাত্র কলাগাছটি রোপন করতে পারেন।" [৯৭]

উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির বাহক স্থানীয় রাজবংশী রমণীগণ কৃষিকর্মের মঙ্গল কামনায় হুদুম দেওএর ব্রত পূজা করে এক সামাজিক লোকয়ত, সাংস্কৃতিক ওনৈতিক কর্তব্য পালন করেন। কোন ক্ষেত্রেই তাদের ব্যক্তিগত কামনা বাসনা এখানে চরিতার্থ হয়না। অনুষ্ঠানটি পুরুষবর্জিত হলেও সমগ্র গ্রামবাসী ও লোকায়ত সমাজের মঙ্গল কামনাই এই পূজার মূল উদ্দেশ্য। এই পূজার আর একটি আঙ্গিক হল কর্ষণের অভিনয়। এতদঞ্চলে হুদুম সম্পর্কে প্রচলিত একটি ব্রতকথা হল - 'দেবরাজ ইন্দ্রের কৃপায় বসুমতী অন্তঃসত্ত্বা হলে বসুমতীকে ঘৃণাভরে বিতারিত করেন সকল দেবতাগণ। এরূপ অবস্থায় বসুমতী কারোকাছে আশ্রয় না পেয়ে আটিয়া কলা (বিচি কলা) গাছের আশ্রয়ে জন্ম হয় বসুমতীর সন্তান হুদুমের।'

হুদুম দেও পূজার আনুষঙ্গিক রূপে ব্যাঙ বিয়া নামক একটি ব্রত অনুষ্ঠিত হয় এখানে। জেলার সর্বত্রই বরুন দেবতার তুষ্টি বিধানে হুদুম পূজার সঙ্গেই প্রসঙ্গ এসে যায়।

তিস্তাবুড়ির পূজা ব্রত বা মেছেনী ব্রত ঃ সমগ্র উত্তবঙ্গের মধ্যে একমাত্র জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত থাকলেও কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ীর রাজবংশী রমণীদের মধ্যে এই ব্রতের প্রচলন দেখা যায়। নদী কেন্দ্রিক এই ব্রতের প্রশস্ত সময় সমগ্র বৈশাখ মাস। ১লা জ্যৈষ্ঠ এই ব্রত পূজার সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এই ব্রতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল একক ভাবে এই ব্রত পালিত হয় না। দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ ভাবে সব বয়সের মেয়েরাই এই ব্রতে অংশগ্রহণ করেন। তিস্তাকে দেবী কল্পনা করে মেছেনী বলা হয়, তাই তিস্তা বুড়ির ব্রত মেছেনী ব্রত নামে পরিচিত।

এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় মেখলিগঞ্জ মহকুমার নালারটারী, খরখরিয়া, বাগডোকরা, এবং হলদিবাড়ী ব্লকের পয়ামারী, হুদুমডামা, দেওয়ানগঞ্জ ও সীমান্তবর্তী মানিকগঞ্জ গ্রামে প্রায় সারা বৈশাখ মাস ধরে কুমারী, সধবা ও বিধবা রমণীগণ দলবেঁধে এই ব্রত পালন করে থাকেন। বছরের প্রথম মাস বৈশাখ থেকেই কৃষকগণ আউস ও আমন ধান রোপনের জন্য প্রস্তুতি নেয়। ধানের প্রাণই হল জল। আর সেই জলের আধার হল নদী। কোচবিহার, জলপাইগুড়ির প্রধান নদী তিস্তা তাই দুই জেলার কৃষি নির্ভর সমাজের রমণীগণ অধিকশস্য পাবার আসায় তিস্তাদেবীকে আরাধনা করেন এই ব্রতের মাধ্যমে। যাতে তিনি ধান ক্ষেতকে সোনালী ফসলে ভরে রাখেন। এই ব্রতের অপর বৈশিষ্ট্য হল - এর ব্রত কথা গানের মাধ্যমেই ব্যক্ত হয়। হলদিবাড়ীর পয়ামারী গ্রামে মেছেনী ব্রতের দেওধা রেবতীবালা রায় কর্তৃকগীত এই ব্রতের একটি বন্দনা গীতে দেখা যায় —

" তিস্তাবুড়ীর নামান গেহচে
বড়য় হাউসালি;
আলন্দে বড়িয়া নেহ গে
হুমার পাঞ্চ বহিনী।।"

ব্রতীগণ ব্রত চলাকালীন মারেয়ানীর নেতৃত্বে হাট - বাজার ও বাড়ী ঘুরে ঘুরে গান করতে করতে মাগন তোলেন। এ সময় মারেয়ানীর হাতে থাকে ফুল ও লাল কাপড় দিয়ে সজ্জিত একটি ডালা এবং ডালার মধ্যে থাকে তিস্তা নদীর মাটি দিয়ে তৈরী তিস্তা বুড়ির প্রতীক। প্রতীকটির উপর সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে তার উপর দই মাখানো চাল ও ফুল ছড়িয়ে দেওয়া হয়। মারেয়ানীর অপর হাতে থাকে নানা রঙের সজ্জিত ফুল ও কাগজে কারুকার্য মন্ডিত ছাতা। অনেক সময় তিস্তাবুড়ির প্রতীকসহ ডালাটিকে ছাতার বাটের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয়। এসময় সঙ্গী ব্রতিনীদের প্রত্যেকের হাতে থাকে লাল নীল কাগজের নিশান। কতদিন ধরে এই ব্রত চলবে তার কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই, তবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এই ব্রত শুরু হয়। বৈশাখ সংক্রান্তির দিন অথবা ১লা জ্যৈষ্ঠ এই ব্রতের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হয়। ঐদিন দেওধার বাড়ীতে পুরুষ মারেয়া কর্তৃক তিস্তাবুড়ীর পূজা হয়। ঐদিন ফুল, বেল, দই চিড়া ইত্যাদি পূজার নৈবেদ্য সহ লাল নীল কাগজে সজ্জিত একটি ভেলা ভাসানো হয় নিকটবর্তী নদীতে।

হলদিবাড়ী ব্লকের মারেয়ানী ও তিস্তাবুড়ি বা মেছেনী ব্রতরে প্রবীণা ব্রতিণী রেবতীবালা রায় ও পবনেশ্বরী বর্মন-এর মতে এই ব্রতের উদ্দেশ্য হল 'তিস্তার ভয়ঙ্করী ও বিধ্বংসী বন্যার হাত থেকে বাড়িঘর মানুষ, গবাদি পশু ও ক্ষেতের ফসলকে রক্ষা করা।' তার মতে দ্বিতীয় কারণ হল -' নদী হচ্ছে স্নেহময়ী জননীর মত। তিস্তা নদীর বন্যা ধ্বংসের পাশাপাশি তার উর্বর পলিদিয়ে কৃষি জমিকেও সমৃদ্ধ করে তোলে।' ডঃ শীলা বসাক তাঁর ' বাংলার ব্রত পার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন — সন্তানলাভই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের এই ব্রত হল Fertility cult এর নিদর্শন।

ষাইটল ব্রত ঃ কোচবিহারের অন্যতম ব্রত ষাইটল ব্রত। ষাইটোল বা ষষ্ঠী শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে আমরা পাই ষষ্ঠী - সটবী - সাটি - সাইট + অব+ অন + সাইটর, সাইটোল। ষষ্ঠী থেকে সাইটোল শব্দের উৎপত্তি। কাগজ ও শোলার মঞ্জুষা মূর্তিতে সাধারণত এই দেবীর পূজা হয়। ঢাকের বাজনা এই পূজার অপরিহার্য অঙ্গ। কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না, বাড়ীর কত্রী নিজেই এই পূজা করেন। ফল, মূল, বাতাসা, খই, কলা, দই , চিনি, ইত্যাদি উপকরণ সহ ব্রতকথার মাধ্যমে এই অনুষ্ঠান পালিত হয়।

সাধারণত পৌষ - মাঘ মাসে নিঃসন্তান রাজবংশী রমণীগণ সন্তান কামনায় এই ব্রত পূজার অনুষ্ঠান করেন। যার বাড়ীতে এই পূজা হয় তাকে স্থানীয় ভাষায় মারেয়া বলে। মেয়েরাই এই পূজার মূল ব্রতী, দুজন বৈরাতী ও থাকেন। সাইটোল পূজায় বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই একজন গিদালী থাকেন, যার পরিচালনায় সাইটোল পূজার গীত ও নৃত্য পরিবেশিত হয়। গিদালী দলে পাঁচ -ছয়জন দোহারও থাকেন। পূজা ও নৃত্যের সময় চাইলন বাতি বৈরাতি বা মারেয়ার স্ত্রীর হাতে থাকে। দক্ষিণবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গের ষষ্ঠীদেবী উত্তরবঙ্গ তথা কোচবিহারের সাইটোল মূলত প্রজননের দেবী। কোচহিারে সাইটোল দেবী শোলার মূর্তিতে পূজিত হলেও পূর্ববঙ্গীয়রা পিটুলীর তৈরী মূর্তি, মাটির ঘট, বট ও কাঁঠাল গাছের ডাল পুঁতে পূজা করেন। পূজান্তে গিদালীর নেতৃত্বে লোকগীতি পরিবেশনের রেওয়াজ আছে। এই পূজায় পূজার দিন স্থির করার পরেই মারেয়া ঢাকের বায়না দেন, যার দৃষ্টান্ত এই ব্রতের গানে দেখা যায় — "আমার বাড়ী সাইটোল পূজা, ঢাকের বায়না দে"

তুফানগঞ্জ মহকুমার নাটাবাড়ী ১নং অঞ্চলের মাছুয়াটারী গ্রামের সাইটোল ব্রতের গীদালী খুকি নমদাস ও নীলেশ্বরী নমদাস সাইটোল ব্রত পূজার ঘটবসানী গানে সন্তান কামনার আর্তি ফুটিয়ে তোলেন —

"সাইটোল মাও সাইটোল মাও
তুই আসিনু আমার ঘরে

তোরে বরে মা পুত্র পাইলাম কোলে
তোক বানেয়া আইনলোং মা মালাকারের ঘরে
পূজা খাবার বইসেক মা তুই আমার ঘরে।" [৯৮]

কোচবিহারে সাইটোল ব্রতপূজার প্রধান আঙ্গিক হল এর গান। ব্রত কথাই এখানে গানের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়। সন্তান কামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। তাই এর নির্দিষ্ট সময় বা তিথির ধার ধারেন না অনেকে। নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণে সাইটোল পূজার লোকাচার জেলার কোন কোন গ্রামে মুসলিম সমাজে ও প্রচলিত আছে।

কোচবিহারের সাইটোল, রঙপুর এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন গ্রামে সাইটোর নামেও পরিচিত। আঞ্চলিক লোকভাষায় ষষ্ঠী দেবীকেই ষাইটোর এবং সাইটোল বলা হয়।

কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে বিষহরি পূজার অনুষঙ্গে ও সাইটোল দেবীর প্রসঙ্গের কথা শোনা যায়। মাথাভাঙ্গার শিকারপুর ও তুফানগঞ্জের নাটাবাড়ী গ্রামে অনেক সম্পন্ন গৃহস্থ বাড়ীতে বিয়ের পূর্বে বিষহরির প্রচলিত গানের ষাইটোল বিষহরির গান করে থাকে। উক্ত গ্রামে প্রচলিত কিংবদন্তী হল - "সাইটোল দেবী বিষহরির কৃপায় সন্তানবতী হয়েছিলেন। সেই সন্তানের বিয়ের সময় দেবী বিষহরির পূজা দিতে ভুলে গিয়েছিলেন বলে অধিবাস কালে তাদের মৃত্যু হয়। পরে বিষহরির আশীর্বাদেই তারা পুনর্জন্ম লাভ করে।"[৯৯] এই সাইটোল বা সাইটোন জেলার অন্যতম প্রভাবশালী লৌকিক গৃহদেবী। জেলার দিনহাটা মহকুমার কিসমতদশ গ্রামের রাজবংশী সমাজে সাইটোল দেবীর শোলার মঞ্জুষা পূজার সময় গিদালীগণ শেলার জন্মাবৃত্তান্ত ব্যক্ত করে ষাইটোল মায়ের বন্দনা করেন। যেমন —

এক হাঁটু জলোতে তোক শোলা কাটুনু
তোক শোলক মুই রইদোতে শুকানু রে - এ।

কাতি বা কার্তিক পূজা ব্রত ঃ কার্তিক মাসের শেষদিনে ফসল কাটার পূর্বে এই পূজা ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। কোচবিহারের রাজবংশী সম্প্রদায়ের রমণীগণ ব্রতউদ্‌যাপনের মাধ্যমে এই পূজা করেন। শুধু কোচবিহার জেলাই নয় উত্তরবঙ্গ, আসামের ধুবরী, গোয়ালপাড়ায় রাজবংশী রমণীগণের সবচেয়ে ঘরোয়া ধর্মীয় ব্রত উৎসব অনুষ্ঠান এই কাতি পূজা ও সংশ্লিষ্ট নাচ যাকে এতদঞ্চলে বলা হয় কাতি নাচ। এই লোক দেবতার পূজা ব্রতের বিশেষত্ব হল এর নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। যদি কোন ব্যক্তি কোন কারণে কার্তিক মাসের সংক্রান্তির দিন এই পূজা দিতে না পারেন তবে তারা অগ্রহায়ণ মাস বা মাঘ মাসেও এই পূজা দেন। এতদঞ্চলে বিলম্বিত এই পূজাকে বলা হয় নমলা কাতি ব্রত পূজা।

গৃহস্থ বাড়ির উঠোনে দক্ষিণ মুখ করে উঁচু মাটির বেদীর উপর এই দেবতাকে বসানো হয়। মূর্তি মাটি বা শোলা দুই রকমের হতে পারে। পূর্বে পোয়ালের বা খড়ের ভূতি দিয়ে মূর্তি তৈরী হত। কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলায় কাতি ঠাকুরের বাহন ময়ূর কিন্তু আসামের ধুবরী ও গোয়াল পাড়া জেলার বহু গ্রামে হাতির উপর ময়ূর তার উপর উপবিষ্ট কাতি ঠাকুর পূজিত হন। তবে সব ক্ষেত্রেই কার্তিকের হাতে থাকে তীর ও ধনুক।

মূলবেদীর চারদিকে কলাগাছ পুঁতে গাছগুলির তিনটি দিক দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয় এবং দড়ির সঙ্গে শোলার ফুল, আটিয়া কলা ও মনুয়া কলা দুটো করে বেঁধে দেওয়া হয়। মূর্তির পেছনে একটি ময়না গাছের ফলশুদ্ধ ডাল ও একটি শেওড়া গাছের ডাল গেড়ে দেওয়া হয়। মূর্তির বেদী সংলগ্ন কলাগাছ চারটির গোড়ায় চারটি ঘট, একটি করে ধনুক রাখা হয়। এক আটি শিস শুদ্ধ ধানগাছ গোড়া থেকে তুলে এনে মূর্তির বাঁদিকে লাগিয়ে দেওয়া হয়। চালের গুড়োর পিটুলি দিয়ে ঘট নৈবেদ্য দিয়ে পূজার উপকরণ সাজানো হয়। আনুষ্ঠানিক এই ব্রত পূজার লোকাচার ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সুবচনী ব্রত পূজার আনুষ্ঠানিকতার মিল রয়েছে। স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ পূজার পৌরোহিত্য করলেও মাটির মূর্তি দিয়ে পূজার সময় অনেকে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ দিয়ে পূজা করান।

এই ব্রত পূজার আনুষঙ্গিক নৃত্যগীতের সময় সেখানে কোন পুরুষ মানুষ থাকেন না। কারণ অনেক সময় গানের ভাষা ও নৃত্যের অঙ্গভঙ্গি শালীনতা ছাড়িয়ে যায়। পুত্র সন্তান কামনাই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। অনেক কুমারী মেয়ে সুন্দর বর লাভের জন্যও এই ব্রত করেন। কাতি ঠাকুরের কৃপাদৃষ্টি লাভ করলে বংশবৃদ্ধি হয় ও শস্য বৃদ্ধি হয়। এটা শুধু কোচবিহার নয় সমগ্র উত্তরবঙ্গের লোকায়ত বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের উপর ভর করে কাতিনাচের গিদালীর দল যে গান ধরেন তা হল —

"হাটুয়া মানষে পোছে রসিক বামনারে
কি ও বাসনা কি করেন আগল কলার ঝুঁকি।
কাতিঠাকুরের বরে পুত্র পাইছোং কোলে
কাতি ঠাকুরের বরে শষ্য আসিচে ঘরে
কাতিঠাকুরের বরে ধন আসিচে ঘরে
তারে না করিমু স্যাবা পূজা।" [১০০]

কাতিপূজার প্রথম পর্বে রাজবংশী রমণীগণ পান, সুপারী, ধূপ- ধুনা দিয়ে ঠাকুর বরণ করেন। পূজার আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর 'কাতিসিজ্জন' (সৃজন) কাহিনীটি সঙ্গীতের মাধ্যমে সমবেত শ্রোতৃবৃন্দের সামনে ব্যক্ত করেন গীদালীর দল।

উত্তরবঙ্গ ও নিম্ন আসামের আদিবাসী সম্প্রদায় পূজিত ব্রত মূলক এই পূজা অনুষ্ঠান সন্তান কামনায় অনুষ্ঠিত হলেও একে উর্বরতা কেন্দ্রিক শস্য উৎসবও বলা যায়। শস্য উৎসব পালনের যে ঐতিহ্য বাংলার বিভিন্ন জেলায় দেখা যায় কোচবিহারের কাতিপূজা তারই দৃষ্টান্ত।

সুবচনী ব্রত ঃ

সুবচন বা সুমিষ্ট কণ্ঠস্বরের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবীর নাম সুবচনী। বিশুদ্ধ উচ্চারণে কখনও কখনও শুভচনী ও বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয় এবং স্থানীয় সধবা হিন্দু নারী কর্তৃক পূজিত হন এই দেবী। অরণ্য ষষ্ঠী, নাগ পঞ্চমী, সুবচনী এরা সবাই আদিম সমাজেরই দেবী।

পুত্র ও পুত্রবধূদের মঙ্গলকামনায় অবিভক্ত বাংলাদেশে যেমন, তেমনি বর্তমান কোচবিহারের লোকজীবনে ক্ষীণ অস্তিত্ব নিয়ে টিকে আছে এইদেবীর পূজা ও ব্রত অনুষ্ঠান। এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময় হচ্ছে প্রতি সপ্তাহের সোম ও বুধবার। প্রকৃত পক্ষে সুবচনী ব্রত আদিম সমাজের স্ত্রী শক্তিকে তুষ্ট করার প্রচেষ্টা থেকেই উদ্ভূত। সুবচনী, শুভচনী, শুভচণ্ডী, সুবচনী দুর্গা, প্রভৃতি নামেও দেবীকে আরাধনা করা হয়। এই দেবী হংস বাহনা এবং দেবী চণ্ডীকারই লৌকিক রূপ মাত্র। কোচবিহার জেলার কয়েকটি গ্রামে বিশেষ করে তুফানগঞ্জ মহকুমার চিলাখানা, জেলা সদরের মাঘপালা, দিনহাটার গোঁসানীমারী গ্রামের পূজা পদ্ধতি, আচার রীতি দেখে একথা মনে হয় যে আদিম লোক সমাজের চিন্তাভাবনার সঙ্গে শাস্ত্রীয় ব্রাহ্মণ্য ভাবনা যুক্ত হয়ে বর্তমান রূপ পরিগ্রহ করেছেন এই দেবী।

পূর্বে মূর্তিহীন সুবচনী পূজিত হলেও বর্তমানে হংসবাহনা সুবচনী মাটির মূর্তিতে পূজিত হন। ১২/৬/৯৮ ইং তারিখে তু ফানগঞ্জ মহকুমার জায়গীর চিলাখানার কামিনীকুমার অধিকারীর বাড়ীতে সুবচনী ব্রত পূজার এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সুবচনী পূজার মূলানী বা গীদালী বৃদ্ধা পবনেশ্বরী বর্মনের সাক্ষাৎকারে জান যায় 'পূর্বে এই পূজা স্থানীয় অধিকারী ব্রাহ্মণ কর্তৃক হলেও বর্তমানে এর পৌরোহিত্য করেন অসমিয়া ব্রাহ্মণগণ'। পূজা শুরু হয় ভোরবেলায় এবং মূলানী ও তার সম্প্রদায় কর্তৃক নৃত্যগীত ও অভিনয়ের মাধ্যমে দিনের শেষে পূজা শেষ হয়। এখানে সুবচনী দেবীর ব্রতপূজার মূল উপকরণে দেখা যায় ঘট, চাইলনবাতি, আস্ত কাঁচা সুপারী ও পান, কলা চার পাঁচ ঝুকি ইত্যাদি। তবে এই পূজার মূল প্রসাদ হচ্ছে পান ও সুপারী। দেবীর ডান দিকে সাজানো থাকে মাছধরার জাকই, চঙ্গাই, দাও কুড়াল, কাস্তে, ডোল, কুলা, ধুয়ে মুছে সিঁদুর দিয়ে এগুলিকেও দেবীর সঙ্গে পূজা করা হয়। পূজার উপকরণ হিসেবে দুটি সাটিমাছ চালুনে রাখা হয়। সাতটি কলার কাদি, পানসুপারী এবং দই, চিড়া, আঁটিয়াকলা সহ দশখোল নৈবেদ্য দেওয়া হয়। এই পূজায় একটি বা দুটি হাঁসের ডিম দিতেই হয়।

এই ডিম সুবচনীর বাহন হাঁসের প্রতীক। জেলার প্রায় প্রত্যেক গ্রামাঞ্চলে শুধু মাত্র পুত্র ও পুত্রবধূদের মঙ্গল কামনাতেই এই পূজা হয় না। এর বাইরে বিভিন্ন ব্যাপারে যেমন - বিবাহ, পরীক্ষার ফল, মামলা-মোকদ্দমা, ব্যাধিমুক্তি, বিবাদ বিসম্বাদ, সন্তান কামনা ইত্যাদি ব্যাপারেও অনেকে এই পূজায় মানত করেন। কোচবিহার জেলায় সুবচনী ব্রতের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে এখানে পূজার অব্যবহিত পরেই প্রবীণ রাজবংশী বিধবা রমণীদের মধ্যে যারা মূলানী বা গিদালী নামে পরিচিত তাঁর নেতৃত্বে মণ্ডপের চারদিকে এই ব্রত কথা ঘিরে গান ও অভিনয়ের প্রদর্শন।

কাত্যায়নী ব্রত ঃ

বছরের বিভিন্ন মাসে বিভিন্ন দিনে ধর্মীয় লোকাচারের অনুষঙ্গে কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের রমণীগণ ব্রতিনী হয়ে যে ব্রত অনুষ্ঠান পালন করেন তাদেরই অন্যতম 'কাত্যায়নীব্রত'। এই মেয়েলী ব্রতটি আজ বিলুপ্তির পথে। এই ব্রত অনুষ্ঠানের মূল সময় হল রাসপূর্ণিমা। 'শুকর' তৈরী করা এই ব্রতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বিসলং অথবা ময়না গাছের ডাল কেটে ১১- ১/৪ ১-১/৪ হাত পিড়ামিড আকারের মঞ্জুষা বানানো হয়। মঞ্জুষার মাথায় মোচার চূড়া এবং থাক থাক কারুকার্য করা কলার খোলের আচ্ছাদন থাকে। মঞ্জুষার ভেতরে বসানো থাকে একটি মাটির প্রদীপ। যে জায়গায় এই ব্রতটি অনুষ্ঠিত হয় সেখানে শোলার পাখী, ফুল, ঝাড় ইত্যাদি দিয়ে সাজানো থাকে। সহজ সরল এই ব্রত অনুষ্ঠানে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সবাই নিমন্ত্রিত হন। এই ব্রতে নৈবেদ্য হিসেবে থাকে মিষ্টি আলু, কমলা, বাতাসা। সাত বছর হলে বাড়ীর মেয়েরা ভাল স্বামী লাভের আশায় এই ব্রত করেন। সেই হিসেবে একে কুমারী ব্রত বলা হয়। তবে এই ব্রতের পেছনে বাড়ীর মা কাকীমাদের উৎসাহই বেশী। এই ব্রত একবার শুরু করলে হয় তিন বছর নাহয় পাঁচ বছর ধরে করতে হয়। ব্রতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর লোকসঙ্গীত। ব্রতিনী মেয়েরা এই সঙ্গীত গেয়ে থাকেন। ব্রতিনীরা সন্ধ্যায় গৌরীর ঘট নিয়ে নদীতে বা কোন জলাশয়ে জল আনতে যাওয়ার সময় সমবেতভাবে এই গানটি গেয়ে থাকেন।

"উঠ উঠ বাস্কুম পানি তুলিবার যাই
বেলা নাই আবো পানি তুলিবার যাই।

কাত্যায়নী ব্রত কোচবিহারের প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্যে সর্ব প্রাচীন। কারণ কোচবিহার রাজ্যের সৃষ্টিতে কোচবিহারকে শিব ভূমি বলা হয় এবং শিব এখানে জামাতা জ্ঞানে স্নেহ-যত্ন ও হাসি-ঠাট্টার যোগ্য হয়ে উঠেন। কোচবিহারে প্রথম শৈব ও শাক্তধর্মের প্রচলন ছিল, তাই এই ব্রতকথায় কেবল শিব-পার্বতীর পূজা ও বিবাহের কথা আছে।" [১০১]

তুলসী ব্রত ঃ কোচবিহারে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈত্র সংক্রান্তির দিন থেকে তুলসীমঞ্চে ঝড়াদানের মাধ্যমে এই ব্রত পালন করা হয়। এই ব্রতের মূল উপকরণ তুলসী গাছ ও ছিদ্র যুক্ত একটি ঘট। প্রত্যেক রাজবংশী সধবা, বিধবা, রমণীগণ স্নান করে ভিজে কাপড়ে জল এনে ঐ ফুটো ঘটের মধ্যে ঢেলে দেন। যাতে তুলসী গাছের মাথায় অনবরত জল পড়ে। এবং সেই সময় ব্রতীগণ একটি ছড়াও বলেন। বাস্তুঠাকুর তুলসী ঠাকুরের যাতে কোন ক্ষতি না হয় সেই জন্য এই ব্রত প্রচলিত হতে পারে। আবার অনেকের মতে তুলসীগাছ মরে গেলে রাজবংশীগণ অমঙ্গলজনক বলে মনে করেন। তাই খরার সময় গাছটি যাতে মরে না যায় সে জন্য এই ব্রত প্রচলিত আছে। বৈশাখ মাসের শেষ দিনটি অতিক্রান্ত হলে যে কোন একটি শুভদিন দেখে ঝড়া নামানো হয়। অধিকারী সম্প্রদায়ের পুরোহিতরা এই ঝড়া নামানো অনুষ্ঠানের পৌরোহিত্য করে থাকেন।

অথাই - পথাই ব্রত ঃ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি জেলার স্থানীয় সম্প্রদায়ের রমণীদের মধ্যে এই ব্রতের প্রচলন আছে। প্রতি বছর শ্রাবণ সংক্রান্তির দিন এই ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। মূল উদ্দেশ্য পরিবারের সবার দীর্ঘ জীবন ও সুস্থ শরীর কামনা। সন্ধ্যাবেলায় যে কোন মেঠো পথের উপর এই ব্রতের অনুষ্ঠান হয়। রমণীগণ এই ব্রতের ব্রতিনী হলেও সংশ্লীষ্ট গ্রামের রাখাল বালকগণ এই পূজায় পৌরোহিত্য করেন। বিপদ সঙ্কুল গ্রাম্য পথে যাতে সবাই নির্ভয়ে নিরাপদে পথ চলতে পারে সেজন্য এই ব্রত করা হয়। হলদিবাড়ী ও মেখলিগঞ্জ মহকুমার অনেক গ্রামে দেখা যায় পথের মাঝখানে একটি বিন্নাগাছের ঝোপ বা থোপ স্থাপন করা হয় এবং তার পাশেই একটি গরু চরানোর লাঠি বা পেন্টি রেখে ফুল বেলপাতার মত কিছু উপকরণ সহ পূজা করা হয়। বিন্নার ঝোপের উপর একটি ছাতাও মেলে দেওয়া হয়। এই উপলক্ষ্যে জলপাইগুড়ি ও

হলদিবাড়ী অঞ্চলে ব্রত কথাও প্রচলিত আছে। প্রধান ব্রতী রাখাল বালক ও ব্রতের সংশ্লিষ্ট সবাইকে সুখিনী ও দুখিনী নামক দুই বোনের কাহিনীও শোনান।

গার্সী ব্রত ঃ কোচবিহার জেলার একটি অন্যতম মাইগ্রেটেড ব্রত হল গার্সী ব্রত। এই ব্রত অনুষ্ঠানটিও মূলত পূর্ববঙ্গীয় দের মধ্যে প্রচলিত বেশি। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়। বিবাহিত রমণীগণই সাধারনত এই ব্রত পালন করেন এবং ব্রতের দিন তারা নিরামিষ আহার করেন। পূর্ববঙ্গীয় ঢাকা অঞ্চলের হিন্দুগণ এদিনটি বিভিন্ন লোকাচারে গারু সংক্রান্তি হিসেবে পালন করেন। এদিন বিশেষ করে শালুকের গুড়ি, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচাহলুদ ইত্যাদি দিয়ে তৈরী ডাল ও তেতো খাওয়ার নিয়ম আছে। রাতভর একবালতি জল, তেঁতুল, কাচাহলুদ, শুকনো পাটপাতা, সরষা, কলার পাতার তৈরী কাজল উঠোনে বা ঘরের চালের মাথায় কুয়াশায় রেখে দেওয়া হয়। পর দিন ঘুম থেকে উঠে ঐ তেঁতুল দাঁতে মেখে মুখ ধোয়া এবং কাচা হলুদ গায়ে মেখে স্নান করার নিয়ম আছে। মূলত খোস পাচরা জাতীয় রোগ নিরাময়ই এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্য অনেকে পাট কাঠির মাথায় আগুন নিয়ে সিগারেটের মত ধোঁয়া ছাড়ে। এতে সর্দি কাশি নিরাময় হয়। যাদের জমি আছে তারা ক্ষেতের সামনে ভোরবেলা তেলসিঁদুর ও একটি আমের পল্লব দিয়ে ঘট বসিয়ে পূজা করেন।

এতদঞ্চলে বসবাসকারী ঢাকা জেলার বারুজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে গার্সী ব্রত উপলক্ষ্যে গারু সংক্রান্তির দিন তেঁতুল পুড়ে পাট কাঠির মাথায় আগুন দিয়ে বাড়ির চারদিকে ঘোরানোর নিয়ম আছে। গার্সী ব্রতে এই সম্প্রদায়ের মানুষ ধানকে সাধ খাওয়ান যাকে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলা হয় ধানকে হোন্দা খাওয়ানো। এসময় তারা একটি ছড়াও বলেন।

এতদঞ্চলে গার্সী ব্রতে আর একটি লোকাচারও দেখা যায়। আশ্বিন সংক্রান্তির দিন বাড়ির উঠোনে একটি কুলগাছ গেড়ে একটি প্রতীকধর্মী পুকুর কাটা হয়। পুকুরের ধারে বসে থাকা একটি শিশুর কোলে বৃদ্ধার মূর্তি থাকে। একটি বড় পাত্রে আট রকমের সব্জী অড়হর বা খেসারীর ডাল সম্ভার না দিয়ে বানিয়ে দিতে হবে এবং ফুল, বেল পাতা, ধূপ - ধুনা জ্বালিয়ে দিয়ে ব্রত কথা শুরু করতে হবে। এই রূপ ডালকে বলা হয় গারুর ডাল। এই ডালের মূল সব্জীর উপকরণ হল - সাপলার শেকড়,, কাঁচা তেঁতুল, কাঁচা হলুদ, সাদা পুরনো চালকুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, শোলাকচু, গাটি কচু, মুখি কচু মুখি আলু, কলমি শাক প্রভৃতি। এই ডাল আশ্বিন সংক্রান্তিতে রান্না করে পরের দিন খাওয়ার রেওয়াজ আছে। গার্সী ব্রতকে এতদঞ্চলে লক্ষ্মী ব্রতও বলা হয়। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় এখানে একটি ছড়াও প্রচলিত আছে। যেমন — 'আশ্বিনে রাইন্দা যে কার্তিকে খায় সেজন ভাইগ্যবতী হয়।'

নিস্কলঙ্ক ব্রত ঃ কোচবিহারের প্রায় সকল সম্প্রদায়ের রমণীরা এই ব্রত পালন করেন। পৌষ মাসের অমাবস্যার সময়ই এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়। এ সময় নতুন ধান, দই, চিড়া, চালের গুড়ো ও বিভিন্ন ফল দিয়ে লক্ষ্মী বাসুদেব ও বৈদ্যনাথ ঠাকুরের ব্রত পালন করেন মেয়েরা। এই ব্রতে কোন গান নেই তবে ব্রত কথা আছে। এতদঞ্চলে লোকায়ত বিশ্বাস এই ব্রত পালন করলে বিবাহিত নারীদের জীবনে কোন দিন কলঙ্কের ছোঁয়া লাগবে না। তাই নিষ্কলঙ্ক জীবনযাপনের উদ্দেশ্যে সধবা রমণীগণ কায়মনোবাক্যে সংযমের সঙ্গে এই ব্রত পালন করেন।

মঙ্গলচণ্ডী ব্রত ঃ কোচবিহার জেলায় পূর্ববঙ্গীয় সকল হিন্দু সম্প্রদায়ের রমণীগণ এই ব্রত পালন করেন জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রতি মঙ্গলবার । অনেক সময় বছরের যে কোন মঙ্গলবার ও এই ব্রত উদ্‌যাপিত হয়। বিবাহিতা রমণীরা সন্তানের মঙ্গল চিন্তাতেই মঙ্গলচণ্ডী ব্রত পালন করেন। এখানে মঙ্গলচণ্ডীর অপর নাম জয় মা মঙ্গলচণ্ডী। প্রকৃতপক্ষে দেবী চণ্ডী, দেবী দুর্গার প্রতিরূপকে অবলম্বন করে এই ব্রতের সৃষ্টি হয়েছে। এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য রোগভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যেমন তেমন পারিবারিক সুখ শান্তি কামনা। কুমারী, সধবা সবাই এই ব্রত পালন করেন। ব্রত পালনের প্রধান শর্ত নির্জলা উপবাস এবং অর্ঘ্য প্রদান। ধান থেকে খুটে আটটি অখণ্ড আতপচাল বের করতে হয়, তার সঙ্গে থাকে আটগাছা দূর্বা, কলাপাতা দিয়ে জড়িয়ে ব্রতিনীর সংখ্যা অনুযায়ী 'শেখর' বা 'গুজি'তৈরী করতে হয়। আবার অনেকে সতেরটি কাঁঠাল পাতা, আমপাতা, বেলপাতা, তুলসী পাতা, ধান, যব, চাপাকলা ও অন্যান্য ফলদিয়ে অর্ঘ্য নিবেদন করেন।

এতদঞ্চলে বসবাসকারী পূর্ববঙ্গীয় ঢাকার হিন্দুগণ এই ব্রতপূজার শেষে ব্রতিনীগণ কলা, তুলসী ও যব দিয়ে প্রসাদ তৈরী করে নদী বা পুকুর ঘাটে গিয়ে খান। ডঃ শীলা বসাক তাঁর 'বাংলার ব্রত পার্বণ' গ্রন্থে বলেছেন - "এই ব্রতের ফলে নির্ধনের ধন হয়, রোগী নিরোগ হয়, বন্ধ্যার সন্তান হয় এবং সর্প ভয় থাকে না। সধবা নারীগণ ব্রত অনুষ্ঠান চলাকালীন দেবী চন্ডীর কাছে অর্ঘ্য নিবেদন করেন এবং ব্রত কথা শোনেন। ব্রতিনী ব্রত কথা বলার সময় অন্যান্য ব্রতিনীরা একটি সুপারি হাতে নিয়ে একটি ছড়াও বলেন।"[১০২]

নিরাকলি ব্রত ঃ এই ব্রত যে কোন মাসের রবি ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়। এটি সম্পূর্ণ নারী ব্রত। এতদঞ্চলের ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল অঞ্চলের গৃহস্থ সধবা রমণীগণ স্বামী, পুত্র, কন্যা ও সংসারের মঙ্গল কামনায় এই ব্রত করেন। ব্রতের দিন দুই থেকে আড়াই ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট দুটো পাট কাঠি বা খোলা বাড়ির উঠোনে প্রোথিত করা হয়। পাট কাঠির গোড়ায় সিঁদুর লিপ্ত একটি পাথর স্থাপন করা হয়। কলার ফাত্রা দিয়ে ফুলের মালা গেঁথে শোলার গায়ে পরানো হয়। একটি ঘটে সিঁদুরের ফোঁটা দিয়ে আম্র পল্লবসহ বসানো হয়। দিনের শেষে গোধূলি লগ্ন এই পূজার মূল সময়। মঙ্গলঘটের সামনে একটি ছোট গর্ত করে পুকুর তৈরী করা হয়। এরপর মঙ্গলঘট ও পুকুরের সামনে কলার মাইচপাতায় নিরাকলি দেবীর ব্রত পূজায় মূল উকরণ হিসেবে দেওয়া হয় কাচা দুধ, ফলমূল ইত্যাদি। এটি সম্পূর্ণ নারী ব্রত। এর পর শুরু হয় ব্রত কথা।

নাটাই চন্ডী ব্রত ঃ এই ব্রতের সময়কাল অগ্রহায়ণ মাস। এটি অন্যতম সধবা ব্রত। এই ব্রতটিও জেলার অন্যতম পূর্ববঙ্গীয় ব্রত। তাই এর প্রচলন বেশী ঢাকা ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে। যে-ই ব্রত শুরু করুক তাকে অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম বুধবার শুরু করতে হয় এবং একবার শুরু করলে চারবার পালন করতে হয়। এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত। এই ব্রতের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভুরি ভোজনের রীতি আছে। নাটাই চন্ডী ব্রতের উপকরণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আতপ চালের গুড়ো দিয়ে তৈরী এক ধরনের পিঠে। এই পিঠের মধ্যে থাকবে নুন ছাড়া ও নুন দিয়ে তৈরী পিঠে। যাকে বলা হয় লুনা ও আলুনা। মাথাভাঙ্গা নিবাসী এক ব্রতিনী নির্মলা পালের মতে এই পিঠে ভেরেন্ডা গাছের পাতায় দিতে হয় সঙ্গে থাকে একুশ গাছি দূর্বা ও একশটি ধান। এই ব্রতের সময় কাল সন্ধ্যা। ব্রতিনীগণ সারাদিন উপবাস থেকে বাড়ির উঠোনে পুকুর কেটে ঘট বসিয়ে ফলমূলের মত যাবতীয় উপকরণ দিয়ে এই পূজা করেন। এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য হল গৃহস্থ বাড়ির পারিবারিক সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি।

ষষ্ঠী বা ষাট ব্রত ঃ শুধু উত্তরবঙ্গেই নয় সমগ্র বঙ্গেই ষষ্ঠী দেবী সন্তান পালনের দেবী হিসেবে পূজিত হন। স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহিতা বা সন্তানবতী রমণীগণই এই ব্রতের প্রধান ব্রতিনী। জ্যৈষ্ঠমাস এই ব্রতের শ্রেষ্ঠ সময়। অনেক স্থানে সোম ও শনিবার ষষ্ঠী পূজা করায় মানা আছে। কোচবিহারের বেশীরভাগ গ্রামে পূর্ববঙ্গীয়দের মধ্যে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠী তিথিতেই এই পূজার প্রচলন বেশী। এই পূজার মূল উপকরণ তিনকুড়ি তিনটি দূর্বা, ছয়কুড়ি ছয়টি করঞ্চা এবং আমের পল্লব। এই তিনটি বস্তুকে একত্রে কলার ফাত্রা দিয়ে পেচিয়ে গুছি বা শেকড় তৈরী হয়। প্রত্যেক ব্রতিনী ব্রতকথা শোনার সময় এই গুছি হাতে নিয়ে বসে ব্রত কথা শোনেন। ব্রতিনীগণ পূজার দিন সকালবেলা আম, কলা ও গুছি সহকারে নূতন শীতলপাখাতে সিঁদুরের ফোটা দিয়ে নদীতে বা পুকুরে স্নান করে এসে বাড়ীর ছোট বড় সবাইকে ষাট বা আশীর্বাদ দেন। স্নান করে এসে ব্রতিনীগণ বাড়ির বড় ঘরে ঘট বসিয়ে কলার মাইচ পাতায় ফলমূল ও বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে পুরোহিতের মাধ্যমে পূজা করেন। অনেকে আবার ঘরে কাঁঠালগাছের ডাল পুঁতে পিটুলী ষষ্ঠী মূর্তি তৈরী করেও পূজা দেন। ব্রত পূজার সমাপ্তে ব্রত কথা শোনার রীতি আছে।

নিয়মসেবা ব্রত ঃ কোচবিহার জেলার স্থানীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রায় সকলেই সমগ্র কার্তিক মাস ব্যাপী এই ব্রত পালন করেন। এই ব্রতের নিয়ম অনুযায়ী ব্রতীগণ সমগ্র কার্তিক মাসব্যাপী নিরামিষ আহার করেন এবং প্রতিদিন তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালান। নারীপুরুষ উভয়েই এই ব্রত পালন করেন অর্থাৎ এটি একটি যৌথ ব্রত। ব্রতীগণ সূর্য ওঠার পূর্বে স্নান সেরে প্রভাতে তুলসীমঞ্চে এবং বাড়ী সংলগ্ন পথে নগর কীর্তনে অংশগ্রহণ করেন। ঐ মাসের প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ভাগবত পাঠ করা হয়। সন্ধ্যায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং কীর্তন হয়। এই সময় তুলসীমঞ্চে লম্বা বাঁশের সাহায্যে উঁচুতে প্রদীপ জ্বালিয়ে দেওয়া হয় একে বলে আকাশ বাতি। এই ব্রতের সময়কাল অনেকসময় আশ্বিনের একাদশী থেকে কার্তিকের একাদশী পর্যন্ত। পূর্বে এটি শুধু মাত্র বিধবাদের একাদশী ব্রত হিসেবে পালিত হলেও বর্তমানে সধবা - বিধবা, নারী - পুরুষ সকলেই এই ব্রত পালন করেন।

জন্মাষ্টমী ব্রত ঃ কোচবিহারে সর্বাধিক পালিত ও উদ্‌যাপিত, বৈষ্ণব ভাবাপন্ন স্থানীয় ও পূর্ববঙ্গীয় সবার মধ্যেই সর্বাধিক প্রচলিত ব্রত হল জন্মাষ্টমী ব্রত। শঙ্করদেব প্রভাবিত বৈষ্ণবীয় ধারায় পুষ্ট হয়ে তুফানগঞ্জ মহকুমার শালবাড়ী গ্রামে, কেষ্টপুর, দিনহাটায় অনুষ্ঠিত জন্মাষ্টমীর ব্রত অনুষ্ঠানের ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় জন্মাষ্টমীর আগের দিন পুরুষ ব্রতীগণ প্রভাতে স্নান সেরে স্থানীয় হরিমন্দির প্রাঙ্গণে স্বস্তিবাচন করে জন্মাষ্টমীর সারাদিনরাত শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য মূলক কীর্তনের মাধ্যমে রাত ভোর করার পর বিকেলে মেতে ওঠেন মথন বা নারকেল খেলায়। এটাই জন্মাষ্টমী ব্রতের মূল কৃত্য।

মদনকামের ব্রত ঃ বাঁশ পূজার মদনকামের ভক্তগণও নিয়মসিদ্ধ ও সাত্ত্বিক ভাবে জীবন যাপন করার পর মদন চতুর্দশীর প্রায় সাত - আটদিন পূর্ব থেকে বাঁশ পূজার ব্রত পালন করেন। এসময় ব্রতীগণ নিরামিষ আহার করেন ও মারেয়ার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করেন। এটি জেলার অন্যতম পুরুষ ব্রত।

আমাতি ব্রত ঃ জেলার অন্যতম কৃষি সম্পর্কিত ব্রত হল আমাতি ব্রত। সকল সম্প্রদায়ের বিধবা রমণীগণ এই ব্রত পালন করেন। অধিক ফল বা শস্য কামনা এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে শস্যকে রক্ষা করা এই ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচি তিথি এই ব্রত পালনের প্রশস্ত সময়।

কুলো নামানো ব্রত ঃ এটি সম্পূর্ণ মেয়েলী ব্রত। খরা বা অনাবৃষ্টির সময় প্রকৃতির রুদ্ররোষ থেকে মুক্তি পেতে স্থানীয় কৃষক পরিবারের রমণীগণ এই ব্রত করেন। গান এই ব্রতের অঙ্গ। লোকায়ত বিশ্বাস এই ব্রতের মাধ্যমে কুলা নামালে বৃষ্টি হয়। এই ব্রতের সময়কাল হল ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাস।

কোচবিহার জেলার গ্রামাঞ্চলের কৃষিজীবী মানুষের লৌকিক ধ্যান ধারণার মধ্যেই জেলার ব্রত গুলি বেঁচে আছে। আদিম ধ্যানধারণার অনেকগুলি বৈশিষ্ট্যই এই ব্রতগুলির মধ্যে দেখা যায়। কোন ব্রতের লোকদেবতার মূর্তি কল্পনা বা উপাচার, কোথাও মূর্তি না থাকলেও আল্পনার মত শিল্পকলার প্রভাব, লোকায়ত ছড়ার মন্ত্র, আদিম যাদুবিদ্যার প্রতি বিশ্বাসও ফুটে ওঠে বিভিন্ন ব্রত কথা ও অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। জেলার কৃষিকেন্দ্রিক যাদুবিদ্যা নির্ভর প্রাচীন ব্রতগুলির মধ্যে অন্যতম হল হুদুমপূজার ব্রত। আবার ব্রতের ক্ষেত্রে লৌকিক দেবদেবীর মধ্যে নারী দেবতার প্রাধ্যান্য দেখা যায় বেশী। যেমন সাইটল, হুদুম, তিস্তাবুড়ি, কাত্যায়নী, মঙ্গলচন্ডী, সুবচনী।

দেবদেবীর কল্পনার আদিম যুগের স্তর থেকে বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন পশুপাখি এসকল দেবদেবীর বাহন রূপে পূজিত হয়। যার মূলে আছে জেলার কিরাত সংস্কৃতি উদ্ভুত টোটেম ও কুলপ্রতীক সম্পর্কিত আদিম যুগের চিন্তা ভাবনা। তাই এতদঞ্চলের প্রচলিত কাতিপূজায় দেখা যায় ময়ূর, ষাইটল বা ষষ্ঠী যার বাহন বিড়াল ও সুবচনীর হাঁস। ব্রতগুলির মধ্যে যেমন হুদুমপূজা ব্রতে কলাগাছ, ষষ্ঠী ব্রতে বটের ডাল, সুবচনীর কলাগাছ ব্যবহারের মধ্যে আমরা দেখতে পাই উর্বরতা কেন্দ্রিক প্রতীক পূজা ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃক্ষপূজার ধারা। কোচবিহারের প্রচলিত ব্রত গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত মন্ত্র ও কথার বিশ্লেষণ করলেও আদিম যুগের জীবন ধারার আভাস পাই।

কোচবিহারের প্রচলিত কয়েকটি ব্রতের মন্ত্রে ও লোকাচারে প্রতীক ব্যবহারের চেয়ে নৃত্যই প্রাধান্য পায় বেশী। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্রত ষাইটল ও কাতি পূজার ব্রত।

উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলার মত এদঞ্চলেও নদীভিত্তিক কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই ব্রতগুলির প্রচলন বেশী। সেই দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনের অভিব্যক্তি দেখা যায় এই ব্রতগুলির মধ্যে। সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে বিচার করলে এই ব্রতগুলিকে একাধারে যাদুবিদ্যাও বলা যায়।

কোচবিহারের প্রায় সকল গ্রামেই পালিত ব্রতগুলির উদ্দেশ্য, প্রকৃতি ও আঙ্গিক বিচার করলে দুটি ভাগ দেখতে পাই। প্রথমত কতগুলি ব্রত ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য আশা - আকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার জন্য পালন করা হয়। এর মধ্যে কাত্যায়নী

ব্রতের মত কুমারী ব্রতগুলি পড়ে। দ্বিতীয়ত এমন কতকগুলি ব্রত ও লোকাচার আছে যেগুলির মূল উদ্দেশ্য হল পারিবারিক সুখ শান্তিকে সমৃদ্ধ করা। আবার কতকগুলি ব্রত আছে শুধুমাত্র অশুভ শক্তি থেকে নিজেদের মুক্ত রাখার জন্য পালন করা হয়। এর বাইরেও এমন কতকগুলি ব্রত আছে যেগুলি প্রলোভন, ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বর্তমান ভোগসর্বস্ব জীবনে মানুষকে ত্যাগ ও কঠোর সংযমের শিক্ষায় অভিষিক্ত করে। সেই অর্থে বিচার করলে বলা যায় কোচবিহারের পালিত নারী ব্রতগুলির মূল উদ্দেশ্যই হল সামাজিক পারিবারিক , প্রতিবেশী ও বিশেষ গোষ্ঠী সম্প্রদায়ের সার্বিক কল্যানের আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তবায়িত করা। আবার অনেক সময় শুধুমাত্র স্বামী পুত্র - কন্যার ও পরিবার পরিজনের মঙ্গল কামানই শুধু নয় এই নশ্বর জীবনের ও জগতের এবং প্রকৃতির প্রতি আকুল আবেদনও কতকগুলি ব্রতের মূল উদ্দেশ্য। যেমন - কোচবিহারে পালিত হুদুমদেও পূজার ব্রত। এই ব্রতের মধ্য দিয়ে রাজবংশী রমণীগণ একটি বিরাট সামাজিক দায়িত্ব পালন করেন। এখানে তাদের নিজস্ব কোন কামনা বাসনা নয় সমগ্র সমাজের মঙ্গলকামনাই একমাত্র লক্ষ্য।

কোচবিহারের ব্রত পার্বণ ও অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে দুটি বিষয় লক্ষ্য করতে পারি — লোকধর্মের অধিষ্ঠাত্রী লৌকিক দেবদেবীর প্রতি ভয় ভীতির পাশাপাশি তাদের প্রতি অখন্ড বিশ্বাস । শিক্ষা ও সংস্কৃতির অগ্রগতিতে মানুষের যুক্তিবাদী বিজ্ঞানমনস্ক মন প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ব্রত অনুষ্ঠানগুলিকে শারীরিক কৃচ্ছ্রসাধন বলে মনে করেন এবং এই যুক্তির বলেই সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী এই ব্রতগুলিকে উপেক্ষা করেন । কিন্তু সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে আমরা দেখতে পাই ব্রতকথা ও অনুষ্ঠানগুলির পেছনে রয়েছে এতদঞ্চলের নারী জীবনের লোকায়ত বিশ্বাসের দীর্ঘ ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস। কোচবিহারে প্রচলিত ব্রত কথা গুলির মধ্যে এতদঞ্চলের শিক্ষা, সংস্কৃতি, লোকধর্ম ও ঐতিহ্যের পরিচয় সুস্পষ্ট।

ব্রত ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক লোকনৃত্য

ভূমিকা ঃ

লোকনৃত্যই প্রাচীন কালে সৃষ্ট ক্ল্যাসিক্যাল নৃত্যের ভিত্তি । লোকনৃত্যের দীর্ঘ অনুশীলনের ফলেই কতগুলো সুনির্দিষ্ট রীতিনীতির মাধ্যমে নূতন কিছু আঙ্গিকে ভরে ওঠার ফলেই জন্ম লাভ করে উচ্চাঙ্গের নৃত্যশৈলী । লোকনৃত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এই নৃত্য কোন রীতিকেই সুনির্দিষ্ট ভাবে আঁকড়ে ধরে থকে না । যে কারণে এই নৃত্যের কোন ধরা বাধা নিয়ম নেই । যেখানে যেমন আনুষ্ঠানিক আঙ্গিক সেখানে তেমন সামঞ্জস্য রেখে পোষাক ব্যবহার করা হয় । আসামের বিহু নাচের পোষাক ও কোচবিহারের কাতি নাচের পোষাকের মধ্যে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য কারা যায় । লোকনৃত্যের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিতে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত কোচবিহারেও আদিবাসী সমাজের প্রভাব সবচেয়ে বেশী । কোচবিহারের রাজবংশী , রাভা ও মেচ সমাজের আচার সর্বস্ব জীবনে এক শ্রেণীর নৃত্য আছে । যেগুলিকে আমরা আচার নৃত্য বা Ritual Dance বলতে পারি । যেমন — কোচবিহারের ষইটল, ষাইটোর, কাতিনাচ, হুদুম নাচ, বাঁশ পূজার নাচ এবং মেছেনী খেলার নাচ মুসলিম মহরমের লাঠিখেলার নাচ, দুল দুল বা ঘোড়া নাচ। জেলার পূর্ববঙ্গীয়দের কালীনাচ, এতদঞ্চলের রাভা জনজাতিগণের বাইখোর নাচ, বছর পিদান, মাছ ধরার নাচ এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। "আসামের কলাগুরু বিষ্ণুরাভার সযত্ন প্রয়াসে রাভা সম্প্রদায়ের লোকনৃত্য বাংলার সংস্কৃতির আঙ্গিনায় আজ উচ্চ প্রশংসিত । মাছধরা, শিকার, কৃষিকর্ম, তাঁতবোনা ,দৈনন্দিন বহু কর্মের সঙ্গেই লোকগীতি ও লোকনৃত্য অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত । এই জনগোষ্ঠীর সমবেত নৃত্যে মোঙ্গলীয় বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে ।" [১০৩]

কোচবিহারের চৈত্র সংক্রান্তিতে হরপার্বতীর ভূমিকায় যে গাজন নৃত্য এবং স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের চড়ক বা গমীরা খেলার নাচ প্রচলিত তা একদিন আচার সর্বস্ব নৃত্য হিসেবে পরিচিত হলেও সময়ের পরিবর্তনে আজ এগুলি আচার নিরপেক্ষ আনন্দানুষ্ঠান ।

লোক নৃত্যের আচার বৈশিষ্ট্য বিচার করলে দেখা যায় এতে পুরুষের চেয়ে নারীর ভূমিকাই বেশী কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার হল হিন্দুর উচ্চতম সংস্কারে নৃত্যের অধিষ্ঠাতা দেবতা স্বয়ং পুরুষ অর্থাৎ নটরাজ শিব । তবে শিকারজীবী আদিবাসী সমাজের নৃত্যে পুরুষের প্রধান্যই বেশী।

নৃত্যের ক্ষেত্রে বিশেষ করে লোকনৃত্যের ক্ষেত্রে জেলায় সারাবছর পালিত বিভিন্ন ব্রত অনুষ্ঠানগুলি একটি বড় উপলক্ষ্য। জেলায় প্রচলিত এরূপ বহু ব্রত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বহু লোকনৃত্যের চর্চা এখনও বহমান এবং ব্রত অনুষ্ঠানের

দেবদেবীগণ এখানে শাস্ত্রীয় দেবদেবী নন। এরা সবাই লৌকিক দেবদেবী। এদের পূজার প্রকৃতি ও লোকাচার সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করে ঢাকা ময়মন সিংহ অঞ্চলের কালীকাচ নাচের ঐতিহ্য কোচবিহারে দীর্ঘদিনের হলেও এখন আর তেমন দেখা যায় না। অবিভক্ত বাংলার লোক সংস্কৃতির অমূল্য এই নিদর্শন আজ বিলুপ্তির পথে।

"মালদায় গম্ভীরা পূজার চতুর্থ দিনে মাসান নাচ হয়ে থাকে। ভোরবেলা ঢাকের বাজনার তালে তালে বিকটবদনা বিচিত্রবেশে নারীরূপে সজ্জিত বিচিত্র অঙ্গভঙ্গির নৃত্য এটি।" [১০৪]

জেলায় প্রচলিত এমন অনেক নৃত্য আছে যেখানে কেবল পুরুষরাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। এতে মেয়েরা অংশগ্রহণ করে না। যেমন — বাঁশপূজার নাচ, মাটিয়া খেলার নাচ, মহরমের লাঠিখেলার নাচ, দুলদুল বা ঘোড়া নাচ, গোষ্ঠের লাঠি খেলার নাচ। মেয়েদের অংশগ্রহণ না করার কারণ অপটুত্ব ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ বা ট্যাবু। যেমন বাঁশ পূজার নাচ। আবার হুদুমদেও পূজার নাচে শুধু মেয়েরাই অংশগ্রহণ করেন। এই দুটি বিধিনিষেধকে জেলার উল্লেখযোগ্য ধর্মীয় ট্যাবু বলা যায়। সাইটল বা কাতিপূজার নাচে শুধু মেয়েদেরই অংশগ্রহণের অধিকার আছে। জেলায় প্রায় সকল গ্রামেই ধর্মীয় ব্রতানুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মূলানী বা মারেয়ানীর নির্দেশে এই নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

জেলায় প্রচলিত বহু লোকনৃত্যে দেখাযায় শুধু লোক বাদ্যের প্রাধান্য অর্থাৎ যেখানে কোন সঙ্গীতের ভূমিকা গৌণ। এটা অবশ্যই ঐন্দ্রজালিক নৃত্যের প্রভাব। হলদিবাড়ী ব্লকের লাঠি খেলায় যে নৃত্যের প্রদর্শন দেখা যায় সেখানে আমরা দেখি লোকবাদ্যই প্রধান, সঙ্গীত গৌণ।এটাও এক ধরনের ঐন্দ্রজালিক প্রভাব। অথচ লোকনৃত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল সঙ্গীত নির্ভরতা। তবে লোকনৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ হল ঢাক। জেলার লোকায়ত জীবনের বিশেষ করে রাজবংশী রমনীগণ ফাল্গুণ, চৈত্র মাসে বা জ্যৈষ্ঠ মাসে অনাবৃষ্টির জন্য বৃষ্টি আহ্বান করে যে নৃত্য করেন তাকে বলা হয় হুদুমদেও নৃত্য। জেলার ঝালো মালো ও নমঃশূদ্র সমাজের মধ্যে গাজনের সময় থেকে বৈশাখ মাস পর্যন্ত সং-এর নৃত্য নামে এক রকম নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। "পূর্ববঙ্গের ঢাকা অঞ্চলের হিন্দুগণ জন্মাষ্টমীর শোভাযাত্রায় সং - এর নৃত্য প্রদর্শন করেন।" [১০৫]

তুফানগঞ্জ মহকুমার রাধাচক্রের মেলা উপলক্ষ্যে সারারাত ব্যাপী সং-এর নৃত্য ও অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। মাথাভাঙ্গা মহকুমার চেঙ্গারখাতা খাগরিবাড়ী ও গিলাডাঙ্গা গ্রামে এবং মেখলিগঞ্জ মহকুমার নিজতরফ, বানিয়াটারী গ্রামে চরকের পর দিন মাটিয়া খেলা বাইশাল নৃত্যে পশুপাখির রূপধরে নৃত্যের প্রচলন আছে। যেমন - বাঘের সাজে বাঘ নৃত্যের প্রচলন আছে। একে বলা হয় বাঘ বাইশাল। হনুমানরূপী হনুমান নাচ, গমীরা খেলায় দেওবংশী বা দোয়ারীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয় এই নৃত্য। কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অমূল্য সম্পদ এই নৃত্যগুলি পশুনৃত্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঘোড়ানাচ যা একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লকেই দেখা যায়। উক্তব্লকের ফিরিঙ্গিডাঙ্গার মহম্মদ বুধুয়া ও বক্সিগঞ্জের সামিরুল মিঞা হলদিবাড়ীর মহরমের লাঠিখেলায় দীর্ঘদিন ধরে এই দুলদুল বা ঘোড়া নাচের সঙ্গে যুক্ত। এখানে মুসলিম সম্প্রদায় কারবালার যুদ্ধের ঐতিহাসিক ঘটনা স্মরণ করে ঘোড়ানাচ না বলে দুলদুল নাচ বলেন। এখানে ঘোড়াকে বলা হয় দুলদুল। এই নাচে দেখা যায় অশ্বারূঢ় ব্যক্তিটি তার কোমর থেকে মাথা পর্যন্ত এমনভাবে আচ্ছাদিত করে যাতে মনে হয় তিনি প্রকৃতই ঘোড়ায় চড়ে অভিনয় করছেন। এই অবস্থায় সেই ব্যক্তিটি নিজের পায়ে নাচতে থাকলেও দেখে মনে হয় যে ঘোড়াটি নাচছে। এরূপ ঘোড়া নাচ একসময় তুফানগঞ্জ মহকুমার দরিয়া বলাই ও পানিশালার অষ্টমী স্নান মেলায় দেখা যেত।

কোচবিহারের বৈচিত্র্যময় লোকসংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন জেলার লোকনৃত্য। প্রতিদিনের কর্মময় জীবনেই উদ্ভূত এই লোকনৃত্যগুলি একে অন্যের পরিপূরক। মুক্তাঙ্গন নাট্যকলার মত জেলার শিল্পীদের প্রাণের আবেগ অনুযায়ী উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ বা লোকালয়ের অঙ্গনে মেলা, উৎসব প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে এই নৃত্যানুষ্ঠানগুলি। শাস্ত্রীয় নৃত্যের কঠোর অনুশাসন এখানে দেখা যায় না। এখানে সহজ সরল গ্রামের মানুষের মুখজ অভিনয় অপটুদেহ সঞ্চালনই বেশী প্রাধান্য পায়। "যে অর্থে শাস্ত্রীয় নৃত্যে শিল্পীরা পেশাদারী সেই অর্থে লোকনৃত্যের শিল্পীরা পেশাদারী নয়।" [১০৬]

লোকনৃত্যের আবেদন লোকমনের সার্বজনীন আবেগ - অনুভূতি পুষ্ট। এরূপ নৃত্যের অপর একটি বৈশিষ্ট্য হল

এতে ছেলেদের প্রাধান্য। তাই ছেলেদেরই মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়। মেয়েলী নৃত্যাভিনয় দীর্ঘ দিনের অনুশীলনে, অভ্যস্ত জীবনযাত্রায়, চলনে বলনে চরিত্রাভিনয়ের নামে জনমনে পরিচিত হয়ে ওঠে। অবিভক্ত বাংলায় যে লোকনৃত্যের ধারা বহমান ছিল আজ খন্ডিত লোকসংস্কৃতির এই ধারা ম্রিয়মান।

রসবোধের দৃষ্টিভঙ্গি ও আঙ্গিক প্রয়োগের কৌশলের পার্থক্য হেতু ব্রত, পার্বণ ও উৎসব উপলক্ষ্যে কোচবিহারে প্রচলিত ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্যে নিম্নলিখিত বিভাগগুলি দেখা যায় —

১। ধর্মীয় অনুষঙ্গে বিভিন্ন তিথিতে ব্রত ও পূজাপার্বণ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠিত নৃত্যশৈলী (মদনকাম, সাইটোল / সাইটোর, হুদুম, কাতি, সুবচনী, বিষহরি, মেছেনী খেলার নাচ)
২। সামাজিক অনুষঙ্গে (উৎসবে) অনুষ্ঠিত লোকনৃত্য (মহরমের লাঠিখেলা ও দুলদুলের নাচ, চড়ক বা গমীরা খেলা উপলক্ষ্যে মাটিয়া খেলার নাচ, জলভাঙ্গানাচ, সং - এর নাচ, গোষ্ঠ ও কালীকাচ নাচ)।
৩। যুদ্ধ বা সমর নৃত্য (রাভা আদিবাসী সমাজের খান্ডাবারু নৃত্য, মাছধরা, যুদ্ধের নাচ ও ক্ষেতে বীজ বপনের নাচ, হাঙ্গা রামানী, নাক চেংবেনী এবং মেচ সম্প্রদায়ের খরাই রণনৃত্য।
৪। লোকনাটকের লোকনৃত্য (কুষাণ, দোতরা ও বিষহরি পালার ছুকরী নাচ)।

১। (ক) সাইটোল নাচ ঃ এই নাচের প্রধান সঙ্গী ঢাকী। ঢাকী ব্রতীদের সঙ্গে নিজেও নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। অনেকে এই সাইটোল নাচকে 'ঢাকুয়া নাচও' বলেন। এখানে মহিলা নৃত্যশিল্পী বা ব্রতীগণ ঢাকীকে ঘিরে নাচেন। অনেক অঞ্চলে এই ব্রতী বা বৈরাতীগণ এ সময় ধুতী পরেন। ঢাকের বোলের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পায়ে ঘুঙ্গুর বেঁধে ব্রতিনীগণ ঢাকের বোলের তাল, লয়, ছন্দ মিলিয়ে নাচেন। এই ব্রত নাচে মেয়েদেরই প্রধান্য দেখা যায়।

(খ) কাতি নাচ ঃ কাতিঠাকুরের সামনে ঢাকুয়া আসর বন্দনা করতেই আসর জমে ওঠে, নাচনির দল আঁচল কোমরে বেঁধে নাচের প্রস্তুতি নেয়। কাতি নাচের ঢাকী স্বতন্ত্র ভাবেই ঢাক বাজায়। দিনহাটা মহকুমার কিসমৎদশ গ্রামের পওহারি ভুঁইমালি ও তার স্ত্রী মজভুঁইমালি কাতি নাচের দক্ষ ঢাকি ও নৃত্যশিল্পী। কাতিনাচে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই চুক্তিবদ্ধ ভাবে গিদালীর নেতৃত্বে ব্রতীরা নৃত্যকরেন। আসর বা কাতি দেবতাকে বন্দনা ও প্রণাম করেই এই নৃত্যের শুরু। কাতিনাচের বৈশিষ্ট্য হল এ নাচ কখনও ঢাকের সঙ্গে, কখনও গানের সঙ্গে হয়। সারারাত ধরে বিরামহীন ভাবে চলে নৃত্যের অনুষ্ঠান। একই আসরে পালা করে একাধিক দল নাচেন। কাতি নাচের দক্ষ শিল্পীদের কোচবিহারের গ্রামাঞ্চলে "নাচনী" নামে খ্যাতি আছে। গিদালী ও নাচনীরাই কাতি নাচের প্রধান ব্যক্তি।

বাঁশ পূজার নাচ ঃ আদিম বৃক্ষ উপাসনা, যৌন প্রতীক পূজা, অশুভ অলৌকিক শক্তিকে প্রতিরোধ ও রোগব্যাধি দূর করার জন্য স্থানীয় রাজবংশী যুবকগণ প্রতিবছর বৈশাখ মাসের মদন চতুর্দশী তিথিতে মদনকামের ভক্ত বা কামদেবের ব্রতী সেজে বাঁশ পূজার নৃত্য করেন। এটি নারী বর্জিত পুরুষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নাচ। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই নাচ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

হুদুমদেও নাচ ঃ কোচবিহারের রাজবংশী রমণীগণ খরা ও অনাবৃষ্টির সময় কৃষি কার্যের অপরিহার্য উপাদান বৃষ্টির বা জলের প্রার্থনা করে হুদুম দেও পূজা করেন। মেয়েরা নির্জন কোন স্থানে একটি কলাগাছ ও বাঁশগাছ মাটিতে পুঁতে হুদুম দেও কল্পনা করে মধ্যরাতে এলোচুলে বিবস্ত্র অবস্থায় উক্তদেবতার চারদিকে ঘুরে ঘুরে নৃত্য করেন এবং নৃত্যের তালে তালে গান করেন। এই নৃত্য ব্রত উদ্‌যাপন মূলক ঐন্দ্রালিক নৃত্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এই নৃত্য সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে।

(ঙ) সুবচনী পূজার নাচ ঃ পারিবারিক বা ব্যক্তিগত মঙ্গল কামনায় বা কোন মনস্কামনা পূর্ণ হলেই গিদালীর নেতৃত্বে কোচবিহারের রাজবংশী সমাজে সুবচনীর পূজা অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে কালী নাচের আয়োজন করেন। এই কালী নাচে কোন

মুখোশ ব্যবহার হয় না।

(চ) বিষহরি পূজার নাচ ঃ কোচবিহারে প্রায় সকল গ্রামে সর্প দেবী মনসার পূজা অনুষ্ঠিত হয় বিভিন্ন নামে। যেমন বিষহরি, পদ্মকুমারী, কানী বিষহরি, সাইটোর বিষহরি, সাইটোল বিষহরি ইত্যাদি। এই পূজায় বিষহরি পালায় গিদালীর দল লক্ষীন্দর বেহুলা, চাঁদ সদাগর প্রভৃতি ভূমিকায় বিভিন্ন পালার মাধ্যমে লৌকিক অভিনয় ও নৃত্যানুষ্ঠান করেন। এক্ষেত্রে গৃহস্থ বাড়ীর যিনি পৃষ্ঠপোষকতা করেন তাকে মারেয়া বলা হয়।

(ছ) ধান ভাঙ্গা ও বৈরাতি নাচ ঃ কৃষি নির্ভর কোচবিহার জেলার গ্রাম জীবনের আর একটি কাহিনী নির্ভর অনুষ্ঠান হল 'ধানভাঙ্গা' অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের পালায় দেখা যায় মেয়েরা জোড় বেঁধে নৃত্যের তালে তালে ঢেঁকিতে ধানভাঙ্গার প্রতিরূপে অভিনয় করে দেখান এবং এসময় নৃত্যের তালে তালে গানও করেন। এরূপ একটি প্রচলিত গান হল —

"আমি নারদের নাতি
গৃহস্থ ধান ভাঙে আমার পিঠে
আমার পিঠে মারে লাথি।"

"এতদঞ্চলের অপর একটি উল্লেখযোগ্য নৃত্যানুষ্ঠান হল 'বৈরাতি নাচ'। বিয়ের সময় রাজবংশী রমণীগণ বর ও কনেকে বরণ করার জন্য যে নৃত্যশৈলী প্রদর্শন করেন তাকেই বলা হয় বৈরাতি নাচ।[১০৭]

(জ) মেছেনী খেলার নাচ ঃ মেছেনী খেলার নাচ মূলত উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলায় প্রচলিত হলেও কোচবিহার জেলায় একমাত্র মেখলীগঞ্জ মহকুমা ও হলদিবাড়ী ব্লকে এর প্রচলন আছে। বৈশাখ মাসে প্রচলিত তিস্তাবুড়ি পূজায় মেছেনী খেলার নাচ ও গান একটি ব্রত অনুষ্ঠান। তিস্তাবুড়ি দেবীকে ঘিরে বৃত্তাকারে ব্রতিনীরা নাচ ও গান করেন। এই নাচে যুবতী মেয়েরাই অংশগ্রহণ করে এবং নাচের সময় এদের হাতে থাকে লাল - নীল কাগজের পতাকা। তিস্তাবুড়ি পূজার সমাপ্তি দিনে নিকটবর্তী নদীর হাঁটুজলে সমবেত ভাবে ছত্র ধারী দেওধাকে ঘিরে নাচ হয়। তিস্তাবুড়ি পূজার মূল অনুষঙ্গই হল মেছেনী খেলার নাচ।

২। (ক) মহরমের লাঠিখেলার নাচ ঃ এটি সম্পূর্ণ পুরুষ প্রাধান্যের নাচ। প্রতি বছর মহরমের দিন শিশু যুবক মধ্যবয়স্ক প্রত্যেকে সমান উচ্চতার দৈর্ঘ্যে লাঠি ঘুরিয়ে বিভিন্ন কসরত দেখিয়ে নৃত্যানুষ্ঠান করেন। হলদিবাড়ীতে এই অনুষ্ঠানে একজন নির্দেশক মুখে বাঁশি নিয়ে নাচের ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ সময় তাদের পরনে থাকে হাফপান্ট ও ফুটবলের জার্সির অনুকরণে জামা ও গেঞ্জী।

(খ) গমীরা খেলার নাচ ঃ চড়ক বা গমীরা খেলার নাচে শুধু পুরুষরাই অংশগ্রহণ করেন। প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তির গমীরা খেলার পরদিন ১লা বৈশাখ স্থানীয় রাজবংশী যুবক এবং মধ্য বয়স্ক যারা চড়কের ভক্তা হিসেবে ব্রত পালন করেন তারাই এই রূপ নৃত্যে অংশগ্রহণ করেন। মাটিয়া খেলার নৃত্যের দলে দশ থেকে পনেরো জন থাকেন। স্বতন্ত্র অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। প্রসঙ্গত বলা যায় পশ্চিম দিনাজপুরেও গমীরা খেলার নাচ প্রচলিত আছে।

(গ) জলভাঙ্গা নাচ ঃ কোচবিহারের রাজবংশী রমণীগণ একটি নৃত্য প্রধান ব্রতানুষ্ঠান পালন করেন। যাকে বলা হয় 'জলভাঙ্গা নাচ'। জলের প্রত্যাশায় নানা আচার ও প্রতীকী ক্রিয়ার মাধ্যমে মেয়েরা এই নৃত্য পরিবেশন করেন।

(ঘ) সং - এর নাচ ঃ জেলার সর্বত্রই চৈত্র সংক্রান্তির দিন শিব পার্বতীর ভূমিকায় সং - এর নৃত্য পরিবেশন করেন জেলার জেলে, কৈবর্ত্য, ঝালো মালো সম্প্রদায়। চড়কের পর বৈশাখমাস ধরে বিভিন্ন উপলক্ষে বিভিন্ন সামাজিক কাহিনীকে ব্যঙ্গ করে অঙ্গভঙ্গি পদক্ষেপ ও মুখোশ দ্বারা সং - এর নৃত্য পরিবেশন করন। এই নৃত্যের মাধ্যমে তারা অনেক সময় পাড়া

প্রতিবেশী ও পারিপার্শ্বিক কেচ্ছা কাহিনীকে হাস্য রসের মাধ্যমে ব্যক্ত করেন। সং - এর নৃত্য মূলত যুদ্ধ নৃত্য। এখানে মেয়েদের কোন ভূমিকা নেই। আধুনিক গানের সুর প্যারোডির মাধ্যমে লোকায়ত কাহিনীর দ্বারা ব্যক্ত করেন সং - এর নৃত্য শিল্পীগণ।

(ঙ) ভান্ডাভান্ডি নাচ ঃ প্রতিবছর অগ্রহায়ণ পৌষ মাসে রাজবংশী সম্প্রদায়এর শিশু, যুকগণ মুখোশ পরে বাড়ি বাড়ি রাতের বেলা ঘুরে ঘুরে গান করে মাগন সংগ্রহ করেন। এসময় তাদের হাতে থাকে একটি করে লাঠি। অঙ্গসজ্জায় থাকে কচুরী পানা, মুখে থাকে কলার খোলের মুখোশ. এই নৃত্যানুষ্ঠান জেলায় ভান্ডাভান্ডি নামে পরিচিত। জেলার হলদিবাড়ী ব্লক ও মেখলীগঞ্জ মহকুমাতেই এরূপ নাচের প্রচলন আছে। হলদিবাড়ী ব্লকের কাশিয়াবাড়ী গ্রামের ভান্ডিনাচের একটি গানে আমরা দেখতে পাই —

"নাচ ভান্ডি নাচ ঘুরে ফিরে নাচ
হাটেরও চুরি করি মাছ, বাড়িও বাইগন
তাক খায়া আমার ভান্ডি ধরিছে নাচন।"[১০৮]

(চ) গোষ্ঠের নাচন ঃ জেলার বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাজবংশী সম্প্রদায়ের কিশোর ও যুবকগণ জগদ্ধাত্রী পূজার অষ্টমী তিথিতে রাখাল বালকের ভূমিকায় হাতে লাঠি মাথায় গামছার পাগড়ি পরে এরূপ নৃত্য পরিবেশন করেন। কোচবিহার জেলায় এই নাচকে গোষ্ঠের লাঠি খেলার নাচ বলে।

(ছ) কালী নাচ ঃ কাঠ বা শোলার কালীর মুখোশ পরে গ্রামীণ মেলার মত বিভিন্ন লোক উৎসবে অনেক ব্যক্তি চামুন্ডা কালীর মানত স্বরূপ কালী নাচ করেন। হাতে দা, মুখে মুখোশ, গায়ে কালো রং মেখে ঘাগরার মত করে কাপড় পরে ঢাকের বাজনার তালে তালে এই কালী নাচ অনুষ্ঠিত হয়। অনেক সময় বিভিন্ন সংক্রান্তিতে মাগন তোলার জন্য এরূপ নৃত্য পরিবেশন করেন।

(জ) কালী কাচ নাচ ঃ চৈত্র সংক্রান্তির গাজনের সময় সর্বাঙ্গ কালিতে লেপে নকল জিব, কারুকার্যমন্ডিত মুকুট পরে, হাতে ঢাল তরোয়াল নিয়ে পূর্ববঙ্গীয় বিশেষকরে ঢাকা অঞ্চলের অধিবাসীগণ কালী বা কাচ নাচের পরিবেশন করেন। কোচবিহারে এই ধরনের কালী কাচনাচে সূত্রধর ও নমশূদ্র সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ বেশী দেখা যায়।

৩। ক) যুদ্ধসমর নৃত্য ঃ উত্তর বাংলার প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ মহকুমার ভাড়েয়া, বাঁশরাজা, ছাটরামপুর, হরিপুর, রসিকবিল গ্রামের বনবাসী ও কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায় তাদের দৈনন্দিন জীবনের ঘরকন্না ও কৃষিকর্মের সঙ্গে সঙ্গে বহু নৃত্যানুষ্ঠানের সঙ্গেও অভ্যস্ত। দেহচর্চা তথা যুদ্ধমহরায় জেলার এই আদিবাসী রাভা রমণীগণ হান্ডাবারু, মাছধরা, নববর্ষ উপলক্ষ্যে বছর পিদান, হাঙ্গারমানি, হাপাড়ি, চিকাবারায় প্রভৃতি নৃত্য পরিশেন করেন। শত্রু নিধনের কৌশল ও প্রক্রিয়াকে নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে রাভা রমণীগণ তাদের কোমল হাতে তুলে নেন ঢাল ও তরোয়াল। নিজেদের মধ্যে আত্মরক্ষণ ও আক্রমনাত্মক কলা বিভিন্ন ছন্দের মাধ্যমে পরিবেশন করেন। এরূপ একটি নৃত্য হল 'হাঙ্গ ইপানি'।

জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে জোড়াই, বোচামারী, আটিয়ামোচরের বনবাসী রাভা ও মেচ রমণীগণ বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে "ঢাল থুংমী গেলে নায়" নামক এক সমর নৃত্যের আয়োজন করেন। জেলার এই রাভা সম্প্রদায়ের গীতিমূলক সব অনুষ্ঠানই সমবেত বা গোষ্ঠীবদ্ধভাবে হয়ে থাকে। লোকায়ত এই সমাজের নৃত্যে পদক্ষেপণ, অঙ্গের অবনয়ন ও উন্নয়নের কাজ বেশী। এরূপ নৃত্যে গ্রীবা, মুখ ও চোখের কাজ কম। রাভা রমণীগণ নাচের সময় রঙীন নক্সী, নকুন, কামরাং, ফাকচেক নামক নিজস্ব পোষাক পরেন। কোমরে থাকে কোমর বন্ধনী, গলায় থাকে খুচরো পয়সার মালা। নৃত্য পরিবেশনায় রাভাসমাজের পুরুষগণ পরেন রঙীন উত্তরীয়। এক ক্ষেত্র সমীক্ষায় তুফানগঞ্জ মহকুমার ভাড়েয়া গ্রামের রাভা

মুক্তাঙ্গন, সামনে পেছনে ডাইনে বায়ে চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে নিজস্ব সম্প্রদায়ের হেম, বাঁক ডিং ডিং কালবাঁশি, চিলিঙ্গির তালে তালে সবাই নাচেন।" [১০৯]

রাভা সম্প্রদায় ধানের বীজ রোপন করার সময় 'হাঙ্গারমানী' নৃত্য পরিবেশন করেন। এই সম্প্রদায়ের গভীর বিশ্বাস নৃত্যের সময় যত উঁচুতে লাথ দেওয়া যাবে ধানগাছ গুলি তত উঁচু হবে এবং ফসল ভাল হবে । এই সম্প্রদায়ের চিংড়ি মাছধরা নাচকে বলা হয় 'নাক চেঙরেনি'। এই রূপ নৃত্য দেখা যায় নদী বা খালবিলের ধারে মাছধরার সময়। পুরুষ ও মেয়েরা কোমরে খালই বেঁধে জলে নেমে এই নৃত্য করেন। এসময় তারা যে গানটি করেন সেটি হল —

"ফালা কাটাঙি পালাউ আনাও
ফালা কাটাঙি পালাউ
শিঙি মারিঙি দুকু আনাও
শিঙি মারিঙি ঢুকু।" [১১০]

হলকর্ষণ বা প্রথম জমি চাষ করার সময় এরা যে নৃত্য করে তাকে বলা হয় 'হাপাড়ি' নৃত্য। কৃষিজীবী রাভা সমাজে স্থানীয় রাজবংশীদের মত মেয়েরাও কৃষিকাজে সহযোগিতা করেন। এই উপলক্ষ্যেনৃত্য গীতে সবাই অংশগ্রহণ করে।

প্রতিবছর বৈশাখ মাসে বিশেষ করে ১লা বৈশখে নববর্ষকে স্বাগত জানিয়ে স্থানীয় রাভা সমাজে নৃত্যগীতের আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাকে বলা হয় 'বছর পিদান'। কালীপূজার আগে প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভালুকের মুখোশ পরে এই সম্প্রদায় যে নৃত্য করে তাকে বলা হয় 'মাক্ পর বসিনি'। রাভা সমাজে মৃতদেহ সৎকার করার সময়ও নৃত্যানুষ্ঠানের প্রথা আছে। এটি এই সম্প্রদায়ের শোকের নৃত্য। জেলার আদিম এই জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস মৃতব্যক্তি পরলোকে গিয়েও সংসার জীবন নির্বাহ করেন। তাই তারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন পরলোকে গিয়েও মৃতব্যক্তি যেন সুখেই থাকেন। ফাল্গুণ মাসে রাভা সমাজের লৌকিক পূজা অনুষ্ঠিত হয়, যাকে বলা হয় 'হুর পূজা'। এই উপলক্ষ্যে তারা নৃত্য গীতের আয়োজন করে। কৃষিজীবী রাভা সম্প্রদায়ের সকল নৃত্যগীতের উদ্দেশ্যই হল সৃষ্টি। আর এই সৃষ্টির আনন্দেই এই সম্প্রদায় সারা বছরেই দৈনন্দিন কৃষিকর্মের মাঝে মাঝে আনন্দ ও উৎসবে মেতে ওঠেন।

লোকনাটকের নৃত্য ঃ

আদিম যুগে ঐন্দ্রজালিক বিশ্বাস থেকে জীবন ধারণের প্রয়োজনে যেমন সৃষ্টি হয়েছিল তেমনি সৃষ্টি হয়েছিল আদিম নৃত্যানুষ্ঠান বা ঐন্দ্রজালিক অভিনয়। কুষাণ উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতির অনুরূপ একটি নিদর্শন । রামায়ণ কাহিনী ও লোকবিশ্বাস নির্ভর নাটকীয়তা নিয়েই এই কুষাণ পালার অনুষ্ঠান। কোচবিহারের পালাগানের অন্যতম আকর্ষণ এর নৃত্যশৈলী। এতদঞ্চলে প্রচলিত পালাগুলিতে দেখা যায় নৃত্যের মাধ্যমে সংলাপ, সঙ্গীত, দেহজ অভিনয় দর্শকমনকে আপ্লুত করে তোলে এমনই এক প্রাচীন অভিনয় নির্ভর পালা হল কুষাণ। লোকসংস্কৃতির বিরল এই নিদর্শনটি জেলায় রামকথায়, লোকশিক্ষা এবং নৃত্য ও গীত প্রধান আঙ্গিকটি কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির অন্যতম বাহন।

লোকনাটকের অন্যতম শর্তই হল এর নৃত্য শৈলী। যার অপর নিদর্শন আমরা দেখতে পাই সামাজিক ও কাহিনী নির্ভর চোর চুরণীর পালায়। লোকনাটকের এই মাধ্যমটির চর্চা জলপাইগুড়ি জেলাতে বেশী হলেও কোচবিহার জেলার একমাত্র হলদিবাড়ী ব্লক ও মেখলীগঞ্জ মহকুমার একাধিক গ্রামে এর চর্চা অব্যহত। উপরিউক্ত দুটি পালায় ছুকরী নাচ অন্যতম আঙ্গিক। পূর্বে ছেলেরাই মেয়ে সেজে এই নৃত্যের অভিনয় করত। উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট কুষাণপালার 'মূল' ললিতকুষাণির মতে এখন মেয়েরাই ছুকরী নাচে অংশগ্রহণ করে।

কাঁচ নাচ / কালী কাঁচ নাচ ঃ

কোচবিহারের লোকসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট নিদর্শন হল কাঁচনাচ। বিলুপ্ত প্রায় এই নিদর্শনটি মূলত চড়কের অনুষ্ঠানের

সঙ্গে যুক্ত। এই রূপ নৃত্যানুষ্ঠানের মূল উপজীব্য ছিল দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ প্রভৃতির কাঠাম নাচ, এক কথায় সপরিবারে দুর্গার আবির্ভাব ঘটে এরূপ নৃত্যশৈলীর অনুষ্ঠানে। এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই দেখা যায় লোক বাদ্যের শিল্পীগণ তাদের নিজস্ব বাদ্য - ভান্ড নিয়ে নৃত্যাঙ্গনে প্রবেশ করেই উচ্চগ্রামে বাজাতে শুরু করেন। এরূপ অনুষ্ঠানের মূল স্থান হল গৃহস্থের বাড়ির উঠোন। চড়ক পূজার দিন দশের আগে থেকে চড়কের সঙ্গে যুক্ত ভক্তাগণই বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাতে কালি কাঁচ, কৃষ্ণকাচ নাচ দেখিয়ে বেড়ান। এরা কেউই পেশাদারী নৃত্যশিল্পী নন। বর্তমান কাঁচনাচ বা কালিকাঁচ নাচের অনুষ্ঠান পরিবর্তিত হয়ে সঙ্গে নৃত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। পূর্বে কালিকাঁচ নাচের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যও ছিল। পূর্ববঙ্গাগত নমঃশূদ্র ও কৈবর্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদঞ্চলে কালিকাঁচ নাচ ও সঙের নাচের প্রচলন বেশী। ছিন্নমূল এই মানুষগুলি এপার বাংলায় এলেও তাদের নিজের সম্প্রদায়গত কৃষ্টিকে সঙ্গে করে এনেছেন। সেই অর্থে এই কালিকাঁচ নাচকে আমরা এতদঞ্চলে মাইগ্রেটেড কালচার বলতে পারি। সারা চৈত্রমাসধরে গৃহস্থের বাড়িতে বাড়িতে এই অনুষ্ঠান হয়। কাঁচনাচের শুরুতে আবির্ভূত হন দশ প্রহরণ ধারিনী দেবী দুর্গা। দশভুজা সিংহবাহিনী মহিষাসুর মর্দিনীর সপরিবারে নৃত্যের পর গগনভেদী গর্জন করতে করতে বাড়ির উঠোনের মুক্তাঙ্গনে প্রবেশ করে দেবীর বাহন সিংহ। বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রে সঙ্গীত মূর্ছনায় বিভিন্ন রূপ অর্থাৎ দেবীর দশমহাবিদ্যার পর কালী, তারা, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, মাতঙ্গী এবং বংশীধারী কৃষ্ণরূপ ধারণ করেন। এতদঞ্চলে এই নৃত্যানুষ্ঠানের নাম কালিকাঁচ নাচ বা কাঁচনাচ হলেও মহাশক্তি ধারিণী দেবী দুর্গা কর্তৃক অসুর নিধন এই নাচের প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান। অসুর নিধনের মধ্যেই উপস্থিত দর্শক শ্রোতাগণ আনন্দে আপ্লুত হয়ে পড়েন। অশুভ শক্তির পরাজয় এবং শুভ শক্তির জয় সাময়িকভাবে মানুষের নীতি বোধকে উদ্বেলিত করে তোলে। লোকবাদ্য ঢাক এরূপ নৃত্যের মূল বাদ্যযন্ত্র। এভাবে পর্যায়ক্রমে বংশীধারী কৃষ্ণের পর মুক্ত মঞ্চে আবির্ভূত হন মুন্ডমালিনী মহাকালী। কালীরূপী নৃত্যশিল্পী তার তাল ও ছন্দে শুধুমাত্র সবাইকে মাতিয়ে তোলেন যা শিশু - কিশোর, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সবাইকে শিহরিত করে তোলেন। কারণ মৃন্ময়ী কালীকে দেখে অভ্যস্ত মানুষ ভ্রান্ত কালী মনে করে শিহরিত হয়ে ওঠেন।

কোচবিহারের লোকায়ত সংস্কৃতির বিলুপ্তপ্রায় এই নিদর্শন বিভিন্ন তিথি বিশেষ করে পৌষ সংক্রান্তি, চৈত্র সংক্রান্তি ও বিভিন্ন গ্রামীণ মেলায় কালীর মুখোশ লাগিয়ে ঘাঘরা পোশাকে মুখে কৃত্রিম জিহ্বা লাগিয়ে হাতে খাড়া ও মালসা নিয়ে হাটে বাজারে এখনও মাগন তুলতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে কালীর সঙ্গী একমাত্র ঢাকী। কালীর ভূমিকায় শুধু পুরুষরাই এই নৃত্যে অংশগ্রহণ করে থাকেন।

কোচবিহারের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মধ্যেও কালীকাঁচ, মুখোশ পরে পুরুষদের দলবেঁধে ঢাকের বাজনার সঙ্গে এরূপ নাচের প্রচলন আছে। হাতে তরোয়াল নিয়ে এরূপ কালীবেশে নাচে সঙ্গে একসময় যুদ্ধের ভঙ্গিতে নাচের প্রচলন ছিল এতদঞ্চলে। কোচবিহারের রাভা সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রাচীন কৃষ্টি ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধনাচের প্রদর্শন এখনও দেখা যায় মহকুমার বারকোদালী, বাঁশরাজা, হরিরহাট অঞ্চলের রাভা সম্প্রদায়ের মধ্যে। এতদঞ্চলের বৈষ্ণবীয় প্রভাবের ফলেই এই যুদ্ধ নৃত্যের আঙ্গিক পরিবর্তিত হয়ে ভক্তিধর্মী গীতিনাট্যে রূপান্তরিত হচ্ছে। এতদঞ্চলে এরূপ নাচের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহামারী নামক দৈত্যকে বধকরার প্রতীকী অভিনয়। এছাড়াও এর পেছনে আছে প্রচ্ছন্ন ঐন্দ্রজালিক প্রভাব।

লৌকিক দেবদেবীর অনেক কিছুই পৌরাণিক বা শাস্ত্রীয় দেবতাদের থেকে ভিন্ন। তার প্রমাণ এর পূজা পদ্ধতি; লোকাচার ও বৈশিষ্ট্যগুলি। সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এগুলিকে অষ্ট্রিক দ্রাবিড় এবং মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর বিশ্বাস ও সংস্কার থেকে উদ্ভব বলে মনে করা হয়। লৌকিক দেবদেবীর মূর্তির রূপ এককথায় আঙ্গিকের বিবর্তন থেকে মনে করা হয় কালের বিবর্তনে লৌকিক দেবতারা আজ অনেক সুসংস্কৃত। তাই যে মাসান দেবতার প্রসাদ খেতে ভয় পেতেন একদিন মানুষ সেই লোকদেবতার প্রতি ভয় মিশ্রিত ভক্তি ও শ্রদ্ধায় নত হন আজ শহুরে শিক্ষিত প্রায় সকল সম্প্রদায়ের মানুষ। অনেক ক্ষেত্রেই মাসান আজ আর শুধুমাত্র নিম্নবর্ণীয় অন্ত্যজদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নন। কোচবিহারের পরাক্রমশালী এই লোকদেবতাগণ আজ অনেক ক্ষেত্রেই সার্বজনীন।

নারী উর্বরতার প্রতীক মেঘ ও বৃষ্টি ফসলের প্রতিশ্রুতি বহন করে আনে। এই বিশ্বাসে রাজবংশী রমণীগণের পূজিতা হুদুম দেবতার সম্পর্ক কল্পনাই এই সমাজের একটি প্রাচীন ঐতিহ্য। ফসলের জন্য বৃষ্টিকামনায় জেলার এই উৎসব লোকায়ত

সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যকেই স্মরণ করে চলেছে।

জেলার প্রত্যেকটি গ্রামেই লৌকিক দেবদেবীর প্রতি সবাই শ্রদ্ধাবনত। আবার হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতিতে সমন্বিতহয়ে বহু লোকদেবতা পূজিত হন এখানে। সত্যপীর, পাগলাপীর, তোর্ষাপীর, হুজুর সাহেব এদেরই প্রতিনিধি। ধর্মীয় সহনশীলতার নিদর্শন হিসাবে এখানে দেখা যায় মাসান, কালী, বুড়াঠাকুরের পাশাপাশিপূজিত হন পাগলাপীর, সত্যপীর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এতদঞ্চলের স্থানীয় রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ শাক্ত - শৈব উভয় ধারার অনুসারী। গ্রাম গ্রামান্তরে অসংখ্য দেবদেবীর অবস্থান দেখে মনে হয় তারা তেত্রিশকোটি দেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাসী এবং তারা কোন কালেই সাম্প্রদায়িক ছিলেন না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় তাদের অনেকের গৃহাঙ্গনের দক্ষিণপূর্বকোণে ঠাকুর পাটে অতিদীর্ঘ একটি বাঁশের মাথায় একগোছা পাটের চামর বাঁধা দেখা যায় এবং এটি তাদের পাগলাপীরের থান। আবার অনেক গ্রামে একদিন স্থানীয় ভক্তপ্রাণ রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ খোয়াজ পীরের দেবতাকে তুষ্ট করার জন্য প্রতিবছর ভাদ্র মাসের বৃহস্পতিবার অনেক ক্ষেত্রে শেষ দিকে পুকুর বা নদীতে সুসজ্জিত ভেলা ভাসাতেন। বলাবাহুল্য এই দুই দেবতা পাগলাপীর ও খোয়াজপীর হচ্ছেন মুসলিম সম্প্রদায়ের দেবতা। এ থেকে আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি যে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষ হিন্দু মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল প্রতীক।

জেলার প্রত্যেকটি লোকদেবতাকেই একাধারে কোন বিশেষ জনগোষ্ঠীর রক্ষক ও আধার বলে মনে করা হয়। লৌকিক দেবদেবীগণ এখানে সামগ্রিকভাবে গ্রামের মানুষের সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা, মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য দায়বদ্ধ। এক কথায় বলা যায় বিশেষ বিশেষ গ্রামে বিশেষ বিশেষ লোকদেবতা জেলার লোক জীবনের নিয়ন্ত্রক। লৌকিক দেবদেবীগণের এসকল বৈশিষ্ট্য থেকেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে লোক দেবতার এই পরিকল্পনা এমন একটি সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল যখন বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ বিভিন্ন গ্রামে গ্রামীণ কৃষিকর্মের মাধ্যমে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন।

সভ্যতা, সংস্কৃতির বিবর্তন ও বৈজ্ঞানিক ধ্যান ধারণার প্রসারের ফলে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবন আজ বিচ্ছিন্ন হলেও গ্রামীণ লোকদেবতার পূজা পার্বণ ও উৎসব এখনও জেলার ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক সাম্প্রদায়িক সংহতি সৃষ্টির প্রধান মাধ্যম।

নদীর ভাঙন থেকে মহামারী, অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির মত প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও সংকট মুহূর্তে সমগ্র গ্রামবাসীই গ্রামের সবার মঙ্গল কামনায় লোকদেবতার আশীর্বাদ ও কৃপাদৃষ্টি কামনা করেন এখানে। জেলার লোকদেবতার আরাধনার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তিনি কারও ব্যক্তিগত মনস্কামনা পূর্ণ করেন না। প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বন্যা বা প্লাবন যার অনিবার্য ফলশ্রুতিতে শুধু মানুষের জীবন ও ঘরবাড়ীই বিনষ্ট হয় না, গবাদি পশু কুলও রক্ষা পায় না। যদিও এর ফলে জমির উর্বরতা বাড়ে। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষের উপরিউক্ত দুর্যোগ থেকে মুক্তি লাভের আশাই নদী পূজার দৃষ্টান্ত। যার উপলক্ষ্য তিস্তাবুড়ি ও গঙ্গাপূজা। তিস্তাবুড়ি পূজার সংশ্লিষ্ট ব্রতীগণের নৃত্যগীত গুলিও কৃষিকৃত্যের নিদর্শন বলা যায়। আবার কৃষি কর্মের সূচনায় ও শেষে সর্বত্রই বিভিন্ন গ্রাম দেবতা নির্দিষ্ট স্থানে পূজিত হয়ে আসছেন। কোচবিহারের গ্রামজীবনেও এর ব্যতিক্রম নেই। জেলার গ্রামাঞ্চলে পূজিত গেরামঠাকুর, গোছরপানা, আগনেওয়া, কাতিগছা ও গোষ্ঠ উৎসব প্রভৃতি এর দৃষ্টান্ত। রাজবংশী সমাজের গেরাম ঠাকুরের পূজা লৌকিক শিবেরই পূজা। জেলার বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের অর্থাৎ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ধর্মবিশ্বাসে কিছুটা পার্থক্য থাকলেও লোকধর্ম, লোকবিশ্বাস ও লোক ঐতিহ্যের মধ্যে একটি ঐক্য বা মিল ও সম্প্রীতি চোখে পড়ে বিভিন্ন পুণ্য তিথিতে বিভিন্ন উৎসব এবং গ্রাম দেবতার থান ও পাটে। সর্বপ্রাণবাদী বিশ্বাস থেকে এরূপ ঐক্য ও সংহতির সৃষ্টি হয়েছে। এতদঞ্চলে তাই জেলার বৈচিত্র্যময় লোকজীবনের মধ্যেও লোকদেবতার প্রতি মানুষের চেতন অবচেতন মন আজও আদিম বিশ্বাসের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত। হিন্দু ধর্মাশ্রিত বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও জনসমাজ কাল্পনিক ভাবে এখানে দেবদেবীর মূর্তি পূজায় অর্ঘ্য নিবেদন করেন। আবার যাদু বিদ্যার প্রতি বিশ্বাসের ফলেই বিভিন্ন ধর্মের নরনারীগণ আজও এখানে গ্রাম দেবতার থানে হত্যে দেন এবং বিশ্বাস করেন গ্রামীণ লৌকিক দেবদেবীগণই হলেন সর্বশক্তির আধার।

তথ্য সূত্র ঃ

১। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৫৫ (১৯৩৬)

২।পূজা পার্বনের উৎস কথা - পল্লব সেনগুপ্ত, পৃ - ১২২ (১৯৮৪)

৩। জাগগান - সুখবিলাস বর্মন, পৃ - ২৯ (১৯৯৭)

৪। রাজবংশী সমাজে শিবের স্থান - শ্রী গোপাল চন্দ্র রায় সরকার, পৃ - ১৪৯, কোচ রাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষ্টি সম্মিলনীয় মুখপত্র, ১৯৯৩, সম্পাদক - উপেন্দ্র নাথ সরকার, গৌরীপুর ধুবরী, আসাম।

৫। উত্তরবঙ্গের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে কামতা কোচরাজবংশ - ডঃ প্রণবকুমার ভট্টাচার্য , দৈনিক বসুমতী, ২৭ মার্চ (১৯৯৬)

৬। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৬০ (১৯৩৬)

৭। ব্যাঘ্র বাহন দেবতা সোনারায় - ডঃ ফনী পাল, পৃ - ১২, বাঘ ও সংস্কৃতি - সনৎ কুমার মিত্র সম্পাদিত, পৃ - ১৩ (১৯৮০)

৮। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - শশীমোহন বর্মন, শিকার পুর, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১৩;৪;৯৮ ইং।

৯। প্রান্তবাসীর ঝুলি - নীহারবালা বড়ুয়া, দেশ - ১২ই পৌষ, ১৩৫৯, পৃ - ৫৪০, বিশবর্ষ এবং লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে সংগৃহীত, তাং - ২৫/৪/৯৯ ইং।

১০। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - শশীমোহন বর্মন, শিকারপুর, মাথাভাঙ্গা, তাং - ১৩/৪/৯৮ ইং

১১। প্রসঙ্গ গোরক্ষনাথ - অমল কুমার চক্রবর্তী, 'কোবিদ' - সম্পাদক - অমরেন্দ্র বসাক, পৃ - শারদীয়া ১৩৯৭।

১২। পশ্চিমবঙ্গের পূজা পার্বণ ও মেলা (১ম খন্ড), সম্পাদক - অশোক মিত্র, পৃ - ১৫০ (১৯৬৯)

১৩। বাংলার লোকসংস্কৃতি - ওয়াকিল আহমেদ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, পৃ - ৩৩১ (১৯৭৪)

১৪। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ২৪, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)

১৫। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্র সমীক্ষা - পূর্ণ চন্দ্র রাভা, গ্রাম - শালবাড়ি, বোচামারী, তাং - ৩/৯/৯৭ ইং

১৬। গারাম ঠাকুরের গান - চিত্তরঞ্জন দেব, লোকসংস্কৃতি কোষ - ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পৃ - ১০৪

১৭। বাংলার লৌকিক দেবতা - গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু, পৃ - ৯৪ (১৩৯৪)

১৮। সাক্ষাৎকার ও ক্ষেত্রসমীক্ষা - দীনেশ দাস, গ্রাম - থেটারপাট, বক্সিরহাট, তাং - ২৫/৪/৯৮ ইং,

১৯। কোচবিহারের ইতিহাস - খানচৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৫৯, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)

২০। বাংলার লোকসংস্কৃতি - ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ২৬৪, বাংলা একাডেমী ঢাকা, সন - ১৯৭৪

২১। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - বিনন্দ বর্মন, পেশা - কৃষিকাজ, গ্রাম - বালাঘাট, তাং - ২৮/৬/২০০ ইং, তুফানগঞ্জ

২২। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - কমলেশ সরকার, কদমতলা, নাটাবাড়ী, তুফাগঞ্জ, তাং - ২৪/১১/৯৯ ইং

২৩। Rajbanshis of North Bengal - Dr. Charu chandra Sanyal, P. - 162 (1965)

২৪। Rajbanshis of North Bengal - Dr. Charu chandra Sanyal, P. - 162 (1965)

২৫। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ফুলেশ্বরী রায়, মাসানের ওঝা, বড়শাকদল অুচল, পরানের ছড়া, দিনহাটা, তাং - ১০/৫/৯৮ ইং

২৬। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - জ্যোতিষ চন্দ্র রাভা, অঞ্জলি রাভা, গ্রাম বাঁশরাজা, শালবাড়ি ১ নং অঞ্চল, তুফানগঞ্জ, তাং - ৮/৪/৯৮ ইং

২৭। লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা - প্রদ্যোত ঘোষ, পৃ - ২০ (১৯৮২)

২৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - কালীচরণ বর্মন, ভোংরিয়া - কালারায়ের ধাম, ছাট গেন্দুগুড়ি, ছাটরামপুর, তুফানগঞ্জ, তাং - ৭/১২/১৯৯৯

২৯। উত্তরবঙ্গের লৌকিক দেবদেবী - নির্মল চৌধুরী, চারুচন্দ্র সান্যাল - স্মারকগ্রন্থ, পৃ - ২২০ (১৯৯২)

৩০। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ভোংরিয়া নরেন বর্মন, জায়গীর চিলাখানা, তুফানগঞ্জ, তাং -

৩১। পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা - ডঃ আশোক কুমার মিত্র, পৃ - ১৬৮ (১৯৬৯)

৩২। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার -শরৎচন্দ্র বর্মন (বর্তমান পূজা কমিটির সম্পাদক) ভবেন্দ্র নাথ বর্মন (গ্রামবাসী), ধীরেন্দ্র নাথ বর্মন (পূজা কমিটির সভাপতি), গ্রাম - পাথরশোন, বামনহাট, দিনহাটা, তাং - ৩/৪/৯৯ ইং

৩৩। A Statistical Account of Bengal - W.W. Hunter, P. 378 , Reprint (1974) V,X

৩৪। আসামের লোকসংস্কৃতি - যোগেশ দাস, পৃ - ৩৩ (১৯৮৩)

৩৫। প্রান্ত উত্তরবঙ্গের লোক সঙ্গীত - ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ - ২৬ (১৯৭৭)
৩৬। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - দীনেশ চন্দ্র দাস, বর্তমান পূজারী, গ্রাম - ভানুকুমারী, থ্যাটারপাট, তাং - ১১/১/১৪০৫, পূজারদিন
৩৭। রাজোপাখ্যান (দশম খন্ড) জয়নাথ মুন্সী, পৃ - ৭(১৯৮৪)
৩৮। বাংলার লোকসংস্কৃতি - ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ৩৩৯, বাংলা একাডেমি, ঢাকা (১৯৭৪)
৩৯। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - উপেন্দ্র নাথ শর্মা, পিতা - চন্ডীচরণ শর্মা, নিজতরফ গ্রামের ভান্ডানী পূজার তিনপুরুষের পূজারী, তাং - ১৪/১০/৯৭ ইং (ভান্ডানী পূজার অষ্টমী তিথি) নিজতরফ গ্রাম, মেখলিগঞ্জ।
৪০। বাংলার লোকসংস্কৃতি - ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ২৭১, বাংলা একাডেমি - ঢাকা (১৯৭৪)
৪১। বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস - ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য, ৪র্থ সংস্করণ, পৃ - ৩১ (১৯৭০)
৪২। বাংলার লোক সংস্কৃতি - ডঃ ওয়াকিল আহমেদ, পৃ - ২৮২, বাংলা একাডেমি - ঢাকা (১৯৭৪)
৪৩। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজাপার্বণ - ডঃ গিরিজাশঙ্কর রায়, পৃ - ১৩৫ গবেষণা গ্রন্থ (১৯৭২)
৪৪। কোচবিহারের ইতিহাস - খানচৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৬৮, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৪৫। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - মহম্মদ মহীউদ্দীন মিঞা, সয়দোর মিঞা, গ্রাম - মাহুতপাড়া, চারালজানি, ২ নং নাটাবাড়ী অঞ্চল, তাং ৫/১১/৯৯ ইং
৪৬। কোচবিহারের ইতিহাস - খানচৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট পৃ -৬৭, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৪৭। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - গাটুমিঞা (ঘুঘুমারী), আকবর মিঞা, ডাকুমিঞা (গুদামমহারণীগঞ্জ) তাং - ৭/৪/৯৮ ইং মহরম
৪৮। উত্তরবঙ্গের লোকসংস্কৃতি - ডঃ শিবতপন বসু, গবেষণা গ্রন্থ, পৃ - ৩৯
৪৯। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ফজলুল হক, হলদিবাড়ী পৌরএলাকা, তাং - ২৭/২/৯৮ ইং
৫০। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৭৩, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৫১। ইসলামী বাংলা সাহিত্য - সুকুমার সেন, পৃ - ৮১ (১৩৮০)
৫২। সাক্ষাৎকার - আকবর মিঞা ও ডাকুমিঞা, ঘুঘুমারী ও গুদাম মহারাণীগঞ্জ, তাং - ৭/৪/৯৮ ইং মহরম।
৫৩। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৭০, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৫৪। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, পৃ - ৭০, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৫৫। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - খোন্দকর আব্দুল হামিদ একরামূলহকের মেয়ের ঘরের নাতি, বয়স - ৬৭, স্থানীয় জনমানসে খোকা হুজুর নামে পরিচিত (আব্দুল হামিদ সাহেবের বক্তব্য টেপ রেকর্ডে সংরক্ষিত) হলদিবাড়ী, হুজুরের মেলা, তাং - ৬/৩/৯৮ ইং (বর্তমানে প্রয়াত)
৫৬। সম্প্রীতির মূর্তপ্রতীক হুজুর সাহেব - ফজলুল হক, (হলদিবাড়ী), মিতালী ১৪০৩, প্রিন্স ভিক্টর নিত্যেন্দ্র নারায়ণ লাইব্রেরীর সাহিত্য সাংস্কৃতিক মুখপত্র, হলদিবাড়ী (১৪০৩)
৫৭। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট পৃ - ৬৭, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৫৮। Cooch Behar State and its land Revenue settlement, Harendra narayan Choudhury, P - 676 (1902)
৫৯। রাজোপাখ্যান জয়নাথ মুন্সী - সম্পাদনা - বিশ্বনাথ দাস, পৃ - ৪১ (১৯৮৫)
৬০। Cooch Behar State and its land Revenue settlement Harendra Narayan Choudhury, P-
৬১। কোচবিহার পরিক্রমা, সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু দে, কোচবিহার গ্রন্থ প্রকাশনা সমিতি, ১৯৮৪
৬২। মধুপর্ণী, বিশেষ কোচবিহার জেলা সংখ্যা, পৃ - ৮১, সম্পাদক - অজিতেশ ভট্টাচার্য (১৩৯৬)
৬৩। কোচবিহারের ইতিহাস - খান চৌধুরী আমানতুল্লা, কোচবিহার স্টেট পৃ - ১২৮, পুনর্মুদ্রণ (১৯৯০)
৬৪। Gazetteer of India, Cooch Behar, by D.D. Majumdar, P - 208 (1977)
৬৫। কথাগুরু চরিত - সম্পাদনা - উপেন্দ্র চন্দ্র লেখারু, পৃ - ১৯৮
৬৬। কোচবিহার রাজ্যে শঙ্করদেব ও তাঁর সত্র - (দিলীপ কুমার দে, কোবিদ সাহিত্য পত্রিকা, শারদীয়া, ১৪০০, ২৫ অগ্রহায়ণ, সম্পাদক- অমরেন্দ্র বসাক।)
৬৭। বাঙালীর ইতিহাস - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃ - ২৯৭ - ৯৮, ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ।
৬৮। A Statistical Account of Bengal -W.W. Hunter., V - X, P - 378, Reprint (1974)

৬৯। The Golden Bough - J.G. Frazer, P - 155, 1967.
৭০। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - রঞ্জিতেশ চক্রবর্তী, হীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, পুরোহিত - কাঠোম পূজা, স্থান - ডাঙরআই ঠাকুর বাড়ী, তাং - ১৫ই শ্রাবণ ১৪০৫, প্রাঃত - ৭টা।
৭১। বৃক্ষ পূজা - আশিস পাল, লোকসংস্কৃতি কোষ, সম্পাদক - বরুণ চক্রবর্তী, পৃ - ২৮৯ - ১৪০২।
৭২। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ, গবেষণা গ্রন্থ - ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়, পৃ - ১১৮ (১৯৭২)
৭৩। Rajbanshis of North Bengal - Dr. Charuchandra Sanyal, The Asiatic society culcutta
৭৪। Tree Symbol worship in India - Shankar Sengupta, P - 144
৭৫। The Golden Bough - J.G. Frazer, P - 24, V - 2, Part - I (1967)
৭৬। সাক্ষাৎকার - শশীমোহন বর্মন, শিবপুর গ্রাম, অঞ্চল - মাথাভাঙ্গা, হরিনাথ বর্মন (পানিয়া), ভারেয়া গ্রাম, বারকোদালী ১ নং অঞ্চল, তুফানগঞ্জ।
৭৭। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - রেবতী বালা রায় (দোহারী), ঝর্ণা ও ভারতী রায়, ব্রতিনী, হলদিবাড়ী, মেখলিগঞ্জ, তাং - ১৫/৫/৯৯ইং
৭৮। A Statistical Account of Bengal - W.W. Hunter, P - 265, Reprint (1974)
৭৯। বাঙালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) - ডঃ নীহার রঞ্জন রায়, পৃ - ৪৮২ (১৪০০)
৮০। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের দেবদেবী ও পূজা পার্বণ - ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়, পৃ - ১০৮ (১৯৭২)
৮১। সূত্র কোচবিহারে রাজ আমল থেকে রাজবাড়ী ও বড়দেবী পূজার ফুলবেল পাতা, ফলমূল, যাবতীয় পূজার উপকরণ সংগ্রহ কারীকে স্থানীয় ভাষায় বলা হয় 'হালুয়া'। বড়দেবী পূজার বহু লোকাচারের সঙ্গে এখনও দশমীর দিন এই সম্প্রদায়ের বংশধরেরা ঘাট পাড়ের 'চালিয়া বাড়িয়া' পূজার পৌরোহিত্য করেন।
সাক্ষাৎকার - শচীন চন্দ্র দাস, হালুয়া সম্প্রদায়ের প্রবীণ চালিয়া বাড়িয়া পূজার পুরোহিত, গ্রাম - টাকাগাছ, তাং - দশমী পূজার দিন, ১৪০৭
৮২। রাজোপাখ্যান - জয়নাথ মুন্সী (দেবখন্ড) পৃ - ১৩ (১৯৮৫)
৮৩। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - শচীন চন্দ্র দাস, হালুয়া সম্প্রদায়ের প্রাক্তন পুরোহিত, গ্রাম - টাকাগাছ
৮৪। ভারতের আদি মানব ও তার ধর্ম - ডঃ অতুল সুর, পৃ - ২৭ (১৯৮৮)
৮৫। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা পার্বণ - ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়, পৃ- ১২৬ (১৯৯৯)
৮৬। উত্তরবঙ্গে ক্ষত্রিয় রাজবংশী সমাজে বিষুমা পার্বণ, কবিরত্ন - শ্যামাপদ বর্মন, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, ১৩ই এপ্রিল, ১৯৯৮
৮৭। পুষুণা - শ্রী শ্যামল রায় , কোচরাজবংশী ক্ষত্রিয় কৃষ্টি সম্মিলনের মুখ পত্র, পৃ-১৫৩, গৌরীপুর, ধুবরী, আসাম (১৯৯৩)
৮৮। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ক্ষত্রিয় জাতির পূজা পার্বণ - ডঃ গিরিজা শঙ্কর রায়, পৃ - ১৩০ (১৯৯৯)
৮৯। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ফজলুল হক, হলদিবাড়ী ব্লক, ২৭/৮/৯৯
৯০। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - রাম শঙ্কর সরকার, গ্রাম - কাশিয়াবাড়ী, হলদিবাড়ী ব্লক, তাং - ২৮/৮/৯৯ ইং
৯১। সংসদ বাংলা অভিধান সঙ্কলন - শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, পৃ - ৫৩৩, সাহিত্য সংসদ (১৯৮৭)
৯২। বাংলার ব্রত পার্বণ - ডঃ শীলা বসাক, পৃ - ৮ (১৯৯৮)
৯৩। হুদুম বা হুদুমদেও - ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি, কোষ, ডঃ বরুণ চক্রবর্তী, পৃ - ৪৫২ (১৪০২)
৯৪। A statistical Account of Bengal - W.W. Hunter, V - X, P. - 378 Reprint (1974)
৯৫। Golden Bough - J.G. Grazer, P.-93, ed. (1974)
৯৬। সাক্ষাৎকার - নেন্দা বর্মন, হুদুমদেও পূজার মারেয়ানী, মাঘপালা গ্রাম, কোচবিহার, তাং - ২১/৯/২০০০ ইং
৯৭। উত্তরবাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ - ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত, পৃ - ৩৬ (১৯৮৮)
৯৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - খুকি নমদাস ও নীলেশ্বরী নমদাস, চারালজানি গ্রাম - মাছুয়ারটারী, নাটাবাড়ী ১ নং অঞ্চল, তাং - ৭/১১/৯৯ ইং
৯৯। প্রান্ত উত্তর বাংলার লোকসঙ্গীত - ডঃ নির্মলেন্দু ভৌমিক, পৃ - ২৭ (১৯৭৭)
১০০। নমলাকাতি - প্রান্তবাসীর ঝুলি, নীহারবালা বড়ুয়া, দেশ পত্রিকা, ২১ বর্ষ, ১৮ই পৌষ (১৩৬০) পৃ - ৫৭৮
১০১। কোচবিহারের প্রাচীন ব্রত কথা - হিমাদ্রিশঙ্কর ভট্টাচার্য, পৃ - ১৬ (১৯৮৩)
১০২। বাংলার ব্রত পার্বণ - ডঃ শিলা বসাক, পৃ - ১৩৭ (১৪০৫)

১০৩। উত্তর বাংলার টোটো উপজাতি ও অন্যান্য প্রবন্ধ - ডঃ পবিত্র কুমার গুপ্ত, পৃ - ১৪ (১৯৮৮)
১০৪। লোকসংস্কৃতি গম্ভীরা - প্রদ্যোৎ ঘোষ, পৃ - ২০ (১৯৮২)
১০৫। বাংলার লোকসাহিত্য - আশুতোষ ভট্টাচার্য, তৃতীয় খন্ড, পৃ - ৭৯২ (১৯৭৩)
১০৬। বাংলার মাটি ও তার কিছু নাচ - সুশীল সাহা, দেশ, ১৫ই মে, পৃ - ৪২ (১৯৯৯)
১০৭। লোকউৎসবের আঙ্গিনায় - শিশির মজুমদার, দেশ - ২৩ শে জুন, ১৯৯০, পৃ - ৫৪
১১৮। ক্ষেত্রসমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - মনোতোষ রায় প্রামানিক, কাশিয়াবাড়ি, হলদিবাড়ী, তাং - ২৮/৪/৯৯ ইং
১০৯। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - ধনঞ্জয় রাভা, গ্রাম - ভারেয়া, তাং - ১২/১/২০০১
১১০। ক্ষেত্র সমীক্ষা ও সাক্ষাৎকার - পূর্ণচন্দ্র রাভা, বোচামারী, তুফানগঞ্জ, তাং - ৭/৪/৯৮ ইং